হিন্দুত্ব

[হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস]

চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিষ ষ্ট্রীট, মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১০০।১নং মেছুয়াবাজার রোড
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯২।

মূল্য ১॥০ টাকা।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় ৺কাশীনাথ বসু পিতামহ মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

দাদা মহাশয়, আপনার শ্রীচরণ দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আপনার স্বর্গারোহণের পর আমার জন্ম হয়। কিন্তু আপনার অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা আমি শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র আমার ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের মুখেও শুনিয়াছি। অতএব আশা হয় যে এই গ্রন্থখানি আপনার প্রীতিকর হইতে পারে ইতি।

সেবক শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

ভূমিকা।

ইউরোপ যাহাকে ইতিহাস বলে আমাদের তাহা নাই। থাকিলে যে মন্দ হইত তাহা নয়। কোন কোন বিষয়ে ভালই হইত। কিন্তু না থাকিবার দরুণ যে বিষম অনিষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করাও বোধ হয় ঠিক নয়। ইতিহাসের গুরুতম কথা, মানসিক প্রকৃতি। মানসিক প্রকৃতি যাহাতে পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাস বলিয়া উক্ত হইলেও ইতিহাস নয়, ভাটের কাহিনী মাত্র। ইউরোপে যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া পরিচিত তাহার অধিকাংশ ভাটের কাহিনী, ইতিহাস নয়। সংস্কৃতে সেরকম গ্রন্থ নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কারণ নাই।

হিন্দুদিগের সেরকম গ্রন্থ নাই থাকুক, কিন্তু তাহাদের ইতিহাস চাই। অপর সকলেরও যেমন ইতিহাস আবশ্যক হিন্দুদিগেরও তেমনি ইতিহাস আবশ্যক। কারণ ইতিহাসেই মানুষের উদাহরণ ও আদর্শ থাকে। যে উদাহরণ ও আদর্শ দেখিয়া মানুষ উৎসাহিত উত্তেজিত ও পরিচালিত হয় তাহা ইতিহাসেই থাকে, অথবা তাহাই ইতিহাস। আর তাহা দেখিয়াই মানুষকে বুঝিতে হয়, তাহা ছাড়া অতঃপর আর কি আবশ্যক। সে উদাহরণ ও আদর্শের মূল বা গূঢ় কারণ, মানসিক প্রকৃতি। তাহার বাহ্যপ্রমাণ আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি এবং সাহিত্য। হিন্দুর সাহিত্যও আছে, আচারানুষ্ঠানাদিও আছে। অতএব যাহাতে

হিন্দুর মানসিক প্রকৃতি পাওয়া যাইতে পারে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণ মাত্রায় আছে। বোধ হয় অন্তের অপেক্ষা আমাদের, পরিমাণেও বেশী আছে এবং খাঁটিও বেশী আছে। কারণ সাহিত্যে এবং আচারানুষ্ঠানে আমাদের যত সামঞ্জস্য আছে অন্য কাহারো তত নাই *। কিন্তু এপর্য্যন্ত হিন্দুর ইতিহাসের অনুসন্ধান সাহিত্যে ও আচারানুষ্ঠানে হয় নাই বলিলেই হয়, অন্যত্র হইতেছে। বেশীর ভাগ প্রত্নতত্ত্বেই হইতেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীনদিগের প্রাণ পাওয়া যায় না, দুই এক খানা ভাঙ্গা হাড় মাত্র পাওয়া যায়। আর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেই ভাঙ্গা হাড় গুলার এত শব্দ করিয়া থাকেন যে সেই শব্দের জন্য প্রকৃত ইতিহাসের কথা একেবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রত্নতত্ত্ব ছাড়িয়া এখন সাহিত্য ও আচারানুষ্ঠানাদিতে ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইবে। আমি সেই চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা অতিশয় দুরূহ। পূজ্যপাদ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রে এই চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারিয়াছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সামাজিক প্রবন্ধে এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মতত্ত্বে হিন্দুত্বের আলোচনা আছে। আমার চেষ্টার পরিমাণ অতি অল্পই হইল। জ্ঞানাভাব ও অবকাশাভাব দুইই তাহার কারণ। প্রভূত চেষ্টা বাকী রহিল। হিন্দুমাত্রেরই তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমার

---

* ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

আবার প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু প্রবৃত্ত হইতে পারিব কি না, বিধাতাই বলিতে পারেন।

হিন্দুত্বের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলাম তৎসম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই, সকল লক্ষণই যে ঠিক নির্ণয় করিতে পারিয়াছি এমন কথা বলিবার সাহস আমার নাই। হিন্দুত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। কিন্তু নির্ণয়ে ভুল হইয়া থাকিলেও একথা বারম্বার বলিব যে এই প্রণালীতে হিন্দুত্বের লক্ষণ নির্ণয় না করিলে হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস কখনই পাওয়া যাইবে না। আর একটী কথা এই, হিন্দুত্বের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি তদ্দৃষ্টে যদি হিন্দুকে অতি অসাধারণ মৌলিকতা সম্পন্ন বিরাট মনুষ্য বলা যায়, তাহা হইলে ভুল হয় না। এই অসাধারণ মৌলিকতার একটী অর্থ এই যে ধর্ম্মশাস্ত্রে, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজপ্রণালী কিছুরই নিমিত্ত হিন্দু কাহারো নিকট কিছুমাত্র ঋণী নয়। হিন্দুর যাহা যাহা আছে সবই তাহার নিজের, এতই নিজের যে অপরে আপন আপন প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে হিন্দুর কোনটীর কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এতই নিজের যে অপরের কিছুই তাহাতে থাকিতে পারে না ও থাকিবার আবশ্যকও নাই। হিন্দুধর্ম্মে খৃষ্টধর্ম্মের ভাঁজ আছে বা মুসলমান ধর্ম্মের ভাঁজ আছে এইরূপ যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত অমূলক, একেবারেই অবিশ্বাস্য। আর সোহহং, লয়, ব্রহ্মচর্য্য, কড়াক্রান্তি, বিবাহ, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি প্রবন্ধে হিন্দুত্বের যে যে লক্ষণে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে হিন্দুর মনের ন্যায় সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রব্যাপী মন

পৃথিবীতে আর নাই, জগতে যাহা কিছু আছে, ছোট বড় সজীব নির্জীব পুং স্ত্রী ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ প্রকৃতি পুরুষ, হিন্দুর মনে সকলই আছে, জগতে যেমন অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন অপূর্ব্ব ভাবে একে অপর সকলের সহিত এবং সকলে একের সহিত গ্রথিত আছে হিন্দুর মনে তেমনই গ্রথিত আছে। হিন্দুর মন জগতের ছাঁচে ঢালা (cosmically constituted) মন। এমন বিরাট মন কি আর আছে?

আর এমন মন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের কত চেষ্টা কত সাধনাই করিতে হইবে। আমরা সে মনের উত্তরাধিকারী হইয়াও সে মন আয়ত্ত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অক্ষম হইয়া হিন্দুনামের একরকম অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। এক সময়ে আমাদের এত বড় মন ছিল শুধু এই গর্ব্ব করিলে আমরা হিন্দু নামের যোগ্য হইব না, বরং অধিকতর অযোগ্যই হইব। প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমাদের প্রাচীন বৈভবের ন্যায় বৈভব জগতে আর নাই। অতএব আমাদের ন্যায় বিপুল চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা জগতে আর কাহারো নাই। আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সে বিরাট কাজ সম্পন্ন না করিলে আমরা আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করিবার অধিকারী হইব না। কিন্তু সে বিরাট কাজ সম্পন্ন করিতে বিপুল শক্তি, বিষম সাধনা, ব্যাপক কাল আবশ্যক। আমাদের ইতিহাসে আমরা আজ বড় বিষম স্থানে উপনীত। আমাদের মনে এই চিন্তাই যেন আজ প্রবল হয়। মনে এই চিন্তা প্রবল

করিয়া আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করিলে আমাদের ইতিহাসলব্ধ আদর্শের প্রতি অনুরাগই বৃদ্ধি হইবে, গর্ব্বের কুফল ফলিবে না। মনে এই চিন্তা প্রবল করিয়াই আমি আমাদের প্রাচীন বৈভবের গৌরব গরিমা ব্যক্ত করিয়াছি, বৃথা গর্ব্ব করিব বলিয়া করি নাই। হিন্দু মাত্রই যেন না করেন। বৃথা গর্ব্ব করিলে সে বিরাট মন, সে অতুল বিভব কখনই লাভ করিতে পারা যাইবে না। আর সে বিরাট মন লাভ করিতে না পারিলে আমরা আর যাহাই করি—আচার পালনই করি; অনুষ্ঠান অনুসরণই করি, যাহাই করি—কিছুতেই প্রকৃত হিন্দু হইব না। প্রকৃত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই—মহৎ কাজ আর নাই।

হিন্দুত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে এস্থলে আর একটী কথা বলা ভাল। সে সকল লক্ষণের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছি হিন্দু-সহিত্যে সে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আজিকালিকার তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে আমার বর্ণিত লক্ষণ গুলি আমার রচিত বা কল্পিত, হিন্দুত্বের লক্ষণ নয়। একথার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তুলনা ব্যতিরেকে লক্ষণ নির্ণয় হয় না। চিনির সহিত অপর খাদ্যের তুলনা না করিলে মিষ্টত্ব যে চিনির লক্ষণ এ কথা বলা যায় না। প্রাচীন হিন্দুরা অপর অপর জাতির মানসিক প্রকৃতির সহিত আপনাদের মানসিক প্রকৃতির তুলনা করিয়া আপনাদের মানসিক প্রকৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই জন্য হিন্দু সাহিত্যে আমার বর্ণিত হিন্দুত্বের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক মনের যে যে লক্ষণ এখন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে

গ্রীক সাহিত্যে সেই সেই লক্ষণের উল্লেখ নাই। এই জন্য নাই যে গ্রীক অপরের সহিত তুলনা করিয়া আপন মনের লক্ষণ নিরূপণ করেন নাই। কিন্তু করেন নাই বলিয়া তাঁহাতে আরোপিত লক্ষণে যাহা বুঝায় তাহা যে তাঁহাতে ছিল না এমন কথা বলিতে পারা যায় না। অন্য দ্রব্যের সহিত তুলনা না করিলে চিনি মিষ্ট এমন কথা বলা যায় না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া মিষ্ট বলিলে যে বিশেষ আস্বাদ বুঝায় তাহাও যে চিনিতে নাই এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। হিন্দুত্বের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি তৎসম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে।

আমি একলা প্রুফ সংশোধন করিয়াছি এবং আমার অবকাশও বড় কম। অতএব ছাপার ভুল অনিবার্য্য, বিস্তর ভুল আছে।

কলিকাতা
২২এ অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

সূচি।

হিন্দুত্ব।

সোঽহং।

সোঽহং—সেই আমি—

একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু হিন্দু—এই কথাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দুধর্ম্ম। সোঽহং হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ, হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ।

কথাটা কেমন, বুঝিয়া দেখা যাক্।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টি—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে প্রধানত দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টি একই পদার্থ। অর্থাৎ ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান, সৃষ্টিকর্ত্তাই সৃষ্টির উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে?—না, যাহা দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান—যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান। অতএব এই মতানুসারে ব্রহ্ম যে পদার্থ, ব্রহ্মাণ্ড সেই পদার্থেই নির্ম্মিত। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। এইমত সম্বন্ধে ইহাই মোট কথা, প্রধান কথা,—যে সকল অন্যান্তর কথা এই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে তাহা পরে

বলিল। আর একটি মত এই যে, ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে, সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টির উপাদান কিছুই ছিল না। সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা আপন অসীম শক্তিদ্বারা কি-জানি-কেমন-করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যে বস্তু, সৃষ্ট জগৎ সে বস্তু নয়, সে বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। দুইটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি হিন্দুর, দ্বিতীয়টি খৃষ্টান প্রভৃতির। প্রথম মতটি যে ভারতে বই আর কোথাও প্রচারিত হয় নাই তাহা নয়। তবে ভারতে যেমন প্রবল হইয়াছে তেমন আর কোথাও হয় নাই। সেই জন্যই ইহা ভারতের হিন্দুর মত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? এ প্রশ্ন দুই রকমে মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং উভয় প্রকারেই হিন্দুর মত পাকা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কথা এই যে, জগৎ যদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক হয় তবে জগদীশ্বর আর অসীম হইতে পারেন না, সসীম হইয়া পড়েন। যেখানে দুইটি বস্তু থাকে সেখানে কোনটিই অসীম হইতে পারে না, দুইটিই সসীম হইয়া যায়। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা এই কথা বলিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হই-লেও, জগতে বিরাজমান, অতএব সসীম নন। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা আর জগৎ-হওয়া এক কথা নয়। অত-এব জগদীশ্বর যদি জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ না হন তবে জগতে জগদীশ্বর ছাড়া আরো কিছু আছে, এবং তাহা হইলেই জগদীশ্বর সসীম হইয়া পড়েন। যেখানে দুই বা ততো-ধিক বস্তু সেখানে সীমাজ্ঞান অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় কথা এই

যে, সৃষ্টির কোন উপাদান ছিল না, ইহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কোন বস্তুর একবারে কিছু নাই, এরূপ কল্পনা মানব শক্তির অতীত, মনুষ্য মনের অসাধ্য। মনুষ্য ইহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না, ধারণা করিতে পারে না। তবে যাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়া পড়িল, ইহা কেমন করিয়া মনে লাগে? যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বরের শক্তি অসীম, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, মনুষ্য যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব মনুষ্য যাহার ধারণা করিতে পারে না, তাহাই যে অসম্ভব বা অসত্য এমন কোন কথা নাই। একথা ঠিক। কিন্তু জগদীশ্বরের সকলই সাধ্যায়ত্ত বলিয়া তিনি যে সকলই করেন, এমন কোন কথা নাই। মনে করিলে তিনি যে সবই করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত অসীমত্ব এবং অনন্তত্ব। কিন্তু অসীম এবং অনন্ত বলিয়া তিনি যে সবই করিবেন এমন কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব যে প্রণালীর সৃষ্টি মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সে প্রণালীতে জগদীশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, এ কথা বলিলে জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বা অসীম শক্তি অস্বীকার করা হয় না। এখন বিচার্য্য কথা এই যে, যে মতানুসারে সৃষ্টিক্রিয়া মানুষের দুর্বোধ্য সে মত অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না। প্রত্যুত্তরে সচরাচর এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে, সৃষ্ট জগৎ স্রষ্টা জগদীশ্বর হইতে এত অধম ও নিকৃষ্ট যে, জগৎ এবং জগদীশ্বরকে এক পদার্থ জ্ঞান করিলে জগদীশ্বরকে নিতান্তই অবমাননা করা হয়, নিতান্তই অধম করা হয়। কিন্তু জগদীশ্বর

অধম পদার্থের স্ৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিলেও কি জগদীশ্বরকে তেমনি অবমাননা করা হয় না, তেমনি অধম করা হয় না? শুধু অধম পদার্থ হইলেই কি অধম হইতে হয়, অধম কার্য্য করিলে অথবা অধম পদার্থ প্রস্তুত করিলেও কি অধম হইতে হয় না? লোকে শুধু দুশ্চরিত্র হইলেই কি অধম হয়? সচ্চরিত্র হইয়া যদি দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক লেখে তাহা হইলেও কি অধম হয় না? তবে জগৎ অপকৃষ্ট জিনিষ বলিয়া উহাকে জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত্ত না বলিয়া তাঁহার স্ৃষ্ট পদার্থ বলিলেই কি তাঁহার মান বা গৌরব রক্ষা করা হয়? যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি বুঝিতে পারি না, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র কেমন তাঁহারাই জানেন, তাঁহাদের মানমর্য্যাদা বিষয়ক সংস্কার কিরূপ, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ বিষয়ে আর যাহা বক্তব্য আছে পরে বলিব।

কিন্তু দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা মীমাংসা করিবার আর একটি উত্তম উপায় আছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দুইটি মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই—জগৎ জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত্ত এ কথার অর্থও যা, জগৎ জগদীশ্বরের স্ৃষ্টি একথার অর্থও প্রায় তাই। স্ৃষ্টি এবং স্ৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র অথবা সেক্সপীয়রত্ব একটি পদার্থ। সেক্সপীয়র রচিত হ্যাম্‌লেট্‌ চরিত্র আর একটি পদার্থ। সেক্সপীয়র হইতে হ্যাম্‌লেট্‌ পৃথক পদার্থ সন্দেহ নাই। হ্যাম্‌লেট্‌ চরিত্র যে সকল উপকরণে নির্ম্মিত স্বয়ং সেক্সপীয়রের চরিত্রে বোধ হয় সে সব উপকরণ

ছিল না। এ অর্থে সেক্সপীয়র এবং হ্যাম্‌লেট্ দুইটি পৃথক পদার্থ। কিন্তু আর এক অর্থে দুইয়ের মধ্যে বড় বিভিন্নতা নাই—অর্থাৎ সেক্সপীয়রও যা, হ্যাম্‌লেট্ ও তাই। হ্যাম্‌লেট্ সেক্সপীয়র হইতে ভিন্ন হইলেও হ্যাম্‌লেটে এমন একটু কিছু আছে, যাহা সেক্সপীয়রেই পাওয়া যায়, আর কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যায় না। সে একটু-কিছুর নাম সেক্সপীয়রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাতু, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জা, বা সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়র—যাহা সেক্সপীয়রের কোন একটি ভাব বা কার্য্য বিশেষ নয়, যাহা সেক্সপীয়রের সকল ভাব এবং সকল কার্য্যে আছে, যাহার গুণে সেক্সপীয়রের সকল ভাব সেক্সপীয়রেরই ভাব, আর কাহারো বা আর কোন রকমের ভাব নয়—সেক্সপীয়রের সকল কার্য্য সেক্সপীয়রেরই কার্য্য, আর কাহারো বা আর কোন রকমের কার্য্য নয়। সে একটু কিছু অর্থাৎ সে সেক্সপীয়রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাতু সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জা বা সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়র শুধু হ্যাম্‌লেটে নয়, সেক্সপীয়র রচিত ভাল মন্দ সমস্ত চরিত্রে আছে—লীয়রে, মীরন্দায়, ফালষ্টাফে, ওবেরণে, ম্যাক্‌বেথে, ম্যাক্‌ডফে, শাইলকে, সমস্ত চরিত্রে আছে। মিল্টন রচিত কোন চরিত্রে সে সেক্সপীয়রত্ব নাই আবার সেক্সপীয়র রচিত কোন চরিত্রে মিল্টনত্ব নাই। এই রূপ সকল মানব-সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে। এবং এ কথার অর্থ এই যে, যে যাহা সৃষ্টি বা রচনা করে, তাহাতে তাহার নিজের-কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু থাকেই থাকে। যে পরিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজত্ব-কিছু থাকে, অন্তত সেই পরিমাণে মানব-স্রষ্টা এবং মানব-

সৃষ্টির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, দুইই এক পদার্থ, এবং মানব-সৃষ্টি বা মানবসৃষ্ট পদার্থ মানব-স্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোঽহং। সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট্ কাল্পনিক সৃষ্টি না হইয়া যদি তোমার আমার ন্যায় সজীব বা সচেতন সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তুমি আমি যেমন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি—সোঽহং, সেও তেমনি সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিত—সোঽহং। কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন হইলেও কার্য্য কারণে থাকিবেই থাকিবে। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব সৃষ্টিতে, সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই আছেন—সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তাকে অন্তত সৃষ্টির আংশিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। অন্তত সেই অংশ সম্বন্ধে সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোঽহং। বলিলেও কোন দোষ হয় না। বলাই কর্ত্তব্য। না বলিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামই নাস্তিকতা। অতএব খৃষ্টান প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদিগের মতানুসারেও ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড পৃথক নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে সৃষ্টি পৃথক নয়। সে মতানুসারেও অস্তিত্ব একটি বই দুইটি নাই—বস্তু একটি বই দুইটি নাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ফেরিয়র বলিয়াছেন*—The only absolute existence

---

* Ferrier *Institute of the Metaphysic* নামক গ্রন্থ দেখ।

is an eternal Mind in permanent synthesis with matter, অর্থাৎ, প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, কেবল এই রকম একটি অনন্ত চৈতন্য আছে, আর কিছুই নাই। অতএব সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভিন্ন বলিলেও এবং ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা যুক্তিসিদ্ধ হইলেও, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে তাহাই সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোঽহং। অতএব বিকাশবাদ এবং সৃষ্টিবাদ—উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার একত্ব নিশ্চিত।

এখন একটি গুরুতর কথার মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে। যাঁহারা খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈতবাদী, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যখন ভাল মন্দ উভয়বিধ দ্রব্যই দেখিতে পাই, তখন কেমন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম বলি—কেমন করিয়া তিক্ত এবং মিষ্টকে এক বলি, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধকে এক বলি, সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতাকে এক বলি, দয়া এবং নির্দ্দয়তাকে এক বলি? একথার প্রথম উত্তর এই যে, যখন বিকাশবাদ এবং সৃষ্টিবাদ উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার একত্ব প্রমানীকৃত হইতেছে, তখন কেহই এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে সমর্থ নন। দ্বিতীয় এবং প্রধান উত্তর এই যে, এই সকল বিভিন্নতা প্রকৃত বিভিন্নতা নয়—এই সকল বিভিন্নতা মনুষ্যের একটি অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মানুষ যে দ্রব্য তিক্ত বলিয়া ফেলিয়া দেয়, একটা পশু সেই দ্রব্য অতিশয় মিষ্ট বলিয়া উদর পূরিয়া ভক্ষণ করে। মানুষের চোকে যাহা লাল, কোন একটা পক্ষীর চোকে হয়ত তাহা কাল। স্থূল অবস্থায় ভিন্ন

ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও আস্বাদ থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দ্রব্য সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে একই আকার ধারণ করে এবং প্রায় একই আস্বাদ উৎপন্ন করে। স্থূল আকারে একই বস্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি যে সকল স্থূল পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা এত বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, সূক্ষ্মাকারে সে সমস্ত একই পদার্থ। অতএব জগতের যাহা বিভিন্নতা বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রকৃত বিভিন্নতা নয়—স্থূল ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন-স্থূল-অববস্থার-স্থূল উপলব্ধি মাত্র। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসন অতিক্রম করিয়া স্থূল অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কাছে জগতে ভাল মন্দের প্রভেদ নাই, প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। তাহার কাছে তিক্ত মিষ্টের প্রভেদ নাই, সুন্দর কুৎসিতের প্রভেদ নাই, পাপপুণ্যের প্রভেদ নাই। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসনে থাকিয়া স্থূল দৃষ্টিতে দেখে সেই কেবল তিক্ত মিষ্ট, পাপপুণ্য প্রভৃতি বিভিন্নতা দর্শন করে এবং সেই সমস্ত বিভিন্নতার অধীন হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে এবং অবনতি প্রাপ্ত হয়। এই যে আমরা জড়পদার্থ এবং চৈতন্যের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি, ইহাই কি ঠিক? আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড়জগৎই চিন্ময় জগৎরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরাও নিত্য দেখিতেছি যে যে সকল জড় দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহা শুধু আমাদের জড় শোণিত এবং জড় অস্থি বৃদ্ধি করিতেছে না, আমাদের চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি করিতেছে। শুক্রশোণিত

সমুদ্ভূত সন্তান কেবল জড় নয়, চৈতন্য সম্পন্নও বটে। তাই আমাদের একজন গুরুদেবতুল্য গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, "জড় জগৎ চিন্ময়" *। অতএব কেমন করিয়া বলি যে জড় পদার্থ এবং চৈতন্য ভিন্ন পদার্থ? কেমন করিয়া না বলি যে, আমরা স্থূল অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসনে আছি বলিয়াই জড়ের এবং চৈতন্যের একত্ব দেখিতে পাইতেছি না। কেমন করিয়া না বলি যে, জড়ত্ব চৈতন্যের একটি অবস্থা মাত্র? কেমন করিয়া না বলি যে, ব্রহ্ম অথবা স্থূলতাশূন্য চৈতন্যের কাছে জড় এবং চৈতন্য একই পদার্থ?

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর প্রকৃত বিভিন্নতা বা বৈষম্য না থাকিলেও, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্থূল অবস্থা আছে। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত বিভিন্নতা নাই বটে, কিন্তু এক রকমের একটা বিভিন্নতা আছে। সে বিভিন্নতা স্থূলত্বের ফল অথবা স্থূলত্বের অঙ্গ বা লক্ষণ। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্থূলত্ব আছে। কিন্তু তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ? ব্রহ্মাণ্ডের যদি স্থূলত্ব থাকে, তবে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মকে এক বলিলে ব্রহ্মকেও স্থূল বলা হয় এবং ব্রহ্ম স্থূল একথা বলিলে তাঁহাকে পাপপুণ্য রূপ বিভিন্নতা এবং বৈষম্যের বিষয়ীভূত বা অধীন করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলত্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যগুণ বা নিত্য অবস্থা নয়—ক্ষণস্থায়ী গুণ বা অবস্থা মাত্র। এবং সে গুণ বা অবস্থা প্রকৃত অস্তিত্বও নয়—

---

* পারিবারিক প্রবন্ধে উৎসর্গপত্র দেখ।

ক্ষণিক অবস্থার ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র। সে গুণ বা অবস্থা যে প্রকৃত অস্তিত্ব নয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষের রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল প্রবৃত্তি আছে। মানুষ যতক্ষণ সেই সকল স্থূল প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং বিভিন্ন ভাবের আধার বা রঙ্গক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। সেও সেই বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী ভাবের অধীন থাকিয়া আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিভিন্ন ভাবে অনুভূত করে—আপনি যে আগা গোড়া একটি সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, সুস্থির, সমতাময় অস্তিত্ব তাহা অনুভব করে না, অথবা করিতে পারে না। স্বচ্ছ জলে মেঘের পর মেঘের ছায়া পড়িলে জলের যে প্রকার আকৃতি হয়, তাহার আধ্যাত্মিক আকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু মেঘের পর মেঘের ছায়ায় থাকিয়া স্বচ্ছ জলের যে আকৃতি বা অস্তিত্ব হয় সেও যেমন স্বচ্ছ জলের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়, বিভিন্নভাবের অধীন থাকিলে মানুষের যে আকৃতি বা অস্তিত্ব হয় তাহাও তেমনি মানুষের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়। কিন্তু মানুষ যখন লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি স্থূল-ইন্দ্রিয়-মূলক স্থূল প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম করে তখন সে সততই একটি সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, সুস্থির, সুন্দর, সুনির্ম্মল সমান আকার ধারণ করিয়া থাকে। জগতের কিছুতেই সে আকারের পরিবর্ত্তন বা বিকার ঘটাইতে পারে না। তখন মানুষের আকার বা অস্তিত্ব মেঘের ছায়া হইতে বিমুক্ত স্বচ্ছ জলের আকার বা অস্তিত্বের সমান বা অনুরূপ হয়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থূলত্ব আছে তাহা

ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র এবং প্রকৃত অস্তিত্বও নয়। অতএব ব্রহ্মের আংশিক মায়াময় ক্ষণস্থায়ী রূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা প্রক্ষিপ্ত হইলেও ব্রহ্ম তদ্দ্বারা দূষিত হন না, কেন না ব্রহ্ম নিত্যতাময়, অতএব অনিত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার নন, এবং ব্রহ্ম তাহার অধীন নন, সে-ই ব্রহ্মের অধীন। কারণ সে-ই ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্ভূত—ইন্দ্রজাল যেমন ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছাসম্ভূত সেও তেমনি ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্ভূত, এবং ইন্দ্রজাল যেমন ঐন্দ্রজালিকের প্রকৃত অস্তিত্ব স্পর্শ করিতে পারে না, সেও তেমনি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে কেন যে তিনি স্থূলরূপ ধারণ করেন বা স্থূলত্ব প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু যে কারণেই করুন, তিনি যখন আপনাকে লইয়াই আপনি এইরূপ করিতেছেন, তখন আর কোন কথাই হইতে পারে না। পরকে লইয়া ভাল মন্দ কাজ করিলে কথা হইতে পারে। আপনাকে লইয়া ভাল মন্দ কাজ করিলে কোন কথাই হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে স্থূলত্ব থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম এক, এ কথা বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলে—সোঽহং—তবে ব্রহ্মাণ্ড সকল কথার সার কথাই বলে।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, ইংরাজি শাস্ত্রই বেশী অধ্যয়ন করেন, এই খানে তাঁহাদিগের দুই তিনটি কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মই হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ আছে সবই ব্রহ্ম। আর তাহা হইলে তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, গাছটাও ব্রহ্ম, পাথরখানাও ব্রহ্ম,

ইট্খানাও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম। তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, জগতে যতগুলি পদার্থ আছে ততগুলি জগদীশ্বর আছেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাস্যাস্পদ কথা আর হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম কাহাকে বলে তাঁহারা তাহাও জানেন না এবং সোঽহং কি তাহাও জানেন না। তাঁহারা জানেন না যে ব্রহ্ম একটি পদার্থ, বিভাজ্য নয়, এবং ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, চক্ষু কি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব তাঁহারা যখন বলেন যে জগতে যতগুলি পদার্থ আছে ততগুলি ব্রহ্ম আছেন, তখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পদার্থের অবস্থাপন্ন করেন। তাঁহাদের আরো এই একটি ভুল হয় যে, যেখানে প্রকৃত সংখ্যা নাই, সেখানে তাঁহারা সংখ্যা আরোপ বা কল্পনা করিয়া থাকেন। জগতে পদার্থের সংখ্যা আছে, স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ দেখিলেই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বা বহু সংখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার বা অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক সূক্ষ্ম এবং উন্নত বিজ্ঞানও এই কথার সূচনা আরম্ভ করিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম যখন স্থূল চক্ষে দেখিবার জিনিষ নন, জ্ঞানচক্ষে দেখিবার জিনিষ, তখন ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বা জগতের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে জগৎকেও স্থূল চক্ষে না দেখিয়া জ্ঞানচক্ষে দেখা উচিত। জ্ঞানচক্ষে দেখিলে জগতে একাধিক পদার্থও দেখিবে না, একাধিক ব্রহ্মও দেখিবে না।

দ্বিতীয় কথা, জ্ঞানচক্ষু ছাড়িয়া দিয়া স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিলেও জগতে যত পদার্থ তত ব্রহ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সোঽহং—ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম যে পদার্থ আমি (অথবা জগৎ) ও সেই পদার্থ—ইহার এমন অর্থ নয় যে আমিই ব্রহ্ম। তবে কেমন করিয়া বল যে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডকে এক পদার্থ বলিলে তুমি আমি গাছ পাতা ঘটি বাটি সকলকেই ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর বলা হয়? সমস্ত সমুদ্রও যে পদার্থ এক ফোঁটা জলও সেই পদার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া এক ফোঁটা জল কি সমুদ্র? এক ফোঁটা জলে কি সমুদ্রের তিমি তিমিঙ্গিল খেলে, সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, সমুদ্রের মহাপ্রলয় উদ্ভূত হয়? একটি অঙ্গুলিও যে পদার্থ সমস্ত দেহটাও সেই পদার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া একটা অঙ্গুলি কি দেহ? মনের একটা ভাবও যে পদার্থ মনও সেই পদার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া মনের একটা ভাবই কি মন? তবে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মও যে পদার্থ জগৎও সেই পদার্থ বলিয়া, কেমন করিয়া বল যে তুমি আমি গাছ পাতা ঘটি বাটি সকলই এক একটি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বানন্দ ব্রহ্ম? 'সোঽহং'-এর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর না বলিয়াই এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক।

যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ। অতএব যখন দেখিতেছি যে জগতে মানুষ ছাড়া আর কেহ বা আর কিছুই প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না প্রকৃত মহৎকার্য্য করে না, তখন কেমন করিয়া জগৎ এবং জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া জগতের সকল পদার্থকে মহৎ বলি? তাঁহারা বলিয়া থাকেন

কে, যে সকল পদার্থ অচেতন সে সকল পদার্থ কোন কাজই করে না, যে সকল পদার্থ সচেতন সে সকল পদার্থের মধ্যে মানুষ ছাড়া আর কেহই মহৎ কার্য্য করে না, কেবল আত্ম-সেবাতেই নিযুক্ত থাকে। ইহাই কি ঠিক? জগতে কি এমন একটা সময় হয় নাই যখন জগতে মানুষ ছিল না? কিন্তু সেই মনুষ্য-শূন্য জগৎই কি মনুষ্য প্রসব করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ কার্য্য করে না বা করে নাই? তুমি তুলিবে, আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবর্ত্তবাদ মানি না বা বুঝি না। আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি মানুষ—অতএব তুমি মহৎ—ইহা ত মান, ইহা ত বুঝ। কিন্তু বল দেখি তুমি যাহা আহার কর, অর্থাৎ, জগতে যাহা মানুষ নয়, তাহা তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে বলিয়া তুমি জগতে মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছ কি না? যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে না? তুমি যে ইউরোপকে এত ভালবাস সেই ইউরোপের বিজ্ঞান আজ কি বলিতেছে? বলিতেছে না কি যে পৃথিবীর কীটাণুকীট, অণুপরমাণু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সচেতন অচেতন,সকল পদার্থই জগদীশ্বর কর্ত্তৃক বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে? তুমি আত্মপ্রধান, আত্ম-সর্ব্বস্ব, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী * নও, তাই মনে কর যে, তুমি যাহা কর, তাহাই জগতের কাজ, তোমার যে উদ্দেশ্য,বিপুল ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই উদ্দেশ্য, অনন্ত ব্রহ্মেরও সেই উদ্দেশ্য। তাই তুমি

* সাম্প্রদায়িক অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিলাম না।

বুঝ না যে অসীম অনন্ত ব্রহ্মের কাছে তুমি একটি বালির কণাও নহ। তাই তোমার মনে হয় না যে অসীম অনন্ত ব্রহ্মের অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি-জানি-কোন্-অসীম-অনন্ত-উদ্দেশ্যে তুমি আমি রাজা প্রজা পর্ব্বত প্রান্তর গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ধূলা কাদা সমস্ত পদার্থকে সমভাবে সেই এক উদ্দেশ্যের সাধক করিয়া অসীম তেজে অনন্ত পথে ছুটিয়াছে! তুমি কি না আজ বল যে জগতে মানুষ বই মহৎ আর কিছুই নাই, মানুষ বই মহৎ কার্য্য আর কেহ করে না! তুমি ত ভারতের হিন্দু নহ। সোঽহং—ভারতের হিন্দুর কথা। তুমিত ভারতের হিন্দু নহ। আর তুমি কি ভারতের, কি ইউরোপের, কোন দেশেরই প্রকৃত মনুষ্য নহ।

অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে মানুষ যদি আপনাকে ব্রহ্ম মনে করে, তবে তাহার অহঙ্কারের সীমা থাকিবে না। আমরা বলি, তা নয়—মানুষ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিলেই তাহার অহঙ্কার নাশ হইবে। যে হিন্দু বলেন—সোঽহং, সেই আমি, সেই হিন্দু বলেন যে জগতে শুধু আমি সেই নই, যাহা কিছু আছে সকলই সেই। যেখানে সকলই ব্রহ্ম সেখানে একের ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান বা অহঙ্কার করিবার অবসর বা উপায় কই? আবার যেখানে মানুষ আপনাকে আপনি বলে—সোঽহং, সেখানে অহং জ্ঞান ত হইতেই পারে না, সেখানে, অহং-এর স্থান কই? ভারতের সাহিত্যেও ইহার প্রমাণ নাই। ইউরোপে এক সময়ে ধর্ম্মের নামে অনেক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িয়া মরিয়াছেন,

আনন্দে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি আপন আপন ধর্ম্ম বিষয়ক মত পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। সে মহান্ ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু সে ইতিহাসে এমন একটি কথা পাই যাহা ভারতের সাহিত্যে পাই না। সে কথাটি এই—সেই সব মহাপুরুষেরা যে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মচ্যুত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নয়—আত্মস্বাধীনতার (individual judgment-এর) নামে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সে অসাধারণ বীরত্ব এবং মহত্ত্বের মূলে আত্ম বা অহং দেখিতে পাই। হিন্দুর সাহিত্যে প্রহ্লাদের কথা, সেই রকমের কথা—সেই রকম বা তদপেক্ষা বেশী বীরত্ব এবং মহত্ত্বের কথা। কিন্তু সে কথায় অহং বা আত্মের লেশ মাত্র নাই। সে কথায় বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুই অহং বা আত্মের প্রতিমূর্ত্তি—প্রহ্লাদে অহং বা আত্মের সম্পূর্ণ অভাব। প্রহ্লাদ আপনার নামে, আত্ম-স্বাধীনতার নামে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম ধরিয়া থাকেন নাই, বিষ্ণুর নামে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম ধরিয়া ছিলেন। যেখানে বিষ্ণুই সব, সেখানে প্রহ্লাদ আবার কে? বিষ্ণু পুরাণে প্রহ্লাদচরিত পাঠ করিলেই একথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবে। এই জন্যই হিন্দুর সাহিত্যে, ধর্ম্মের ইতিহাসে, মহত্ত্ব এবং বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্মের নাম গন্ধও নাই—খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপের সাহিত্যে, ধর্ম্মের ইতিহাসে, মহত্ত্ব এবং বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্ম বড়ই প্রবল। ভারতের সোঽহং ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রভেদ করিয়াছে,

ভারতকে ইউরোপ অপেক্ষা এতই শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। ভারতের সোঽহং ভারতের হিন্দুর বড়ই গৌরবের জিনিষ। মানুষ সেই পরব্রহ্ম, এক হিন্দু ছাড়া আর কেহই এত উচ্চ ভাবনা ভাবিতে সক্ষম হয় নাই, আর কাহারই এমন কথা ভাবিবার সাহস হয় নাই, এই বিশাল কথা মনে ধারণ করে এমন মানসিক বিশালতাও আর কাহারো হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অভিমান করিও না। সোঽহং কাহাকে বলে যদি বুঝিয়া থাক, তবে অভিমান করিতে পারিবেও না। অভিমান বা অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে কেহ 'সোঽহং'-এর অধিকারী হয় না। সূক্ষ্মদর্শী বিরাটমতি হিন্দুর সূক্ষ্মতম অতি-বিরাট সোঽহং-এর অর্থ—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত আত্মজ্ঞান— অপরিসীম মন, অপরিমিত সাহস—সমস্তের সামঞ্জস্য, সমস্তের মহত্ত্ব, সমস্তের একত্ব, অত্যুচ্চ বিশ্বব্যাপী কবিত্ব।

হিন্দুর সোঽহং বলিতেছে, হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী, ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, অপরিমিত সাহস সম্পন্ন বিরাটমনা মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

লয়।

সোঽহং—মানুষ সেই, মানুষ সেই পরব্রহ্ম। মানুষ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। তবে মানুষ মানুষ কেন? এই জন্য যে, মানুষ জীবরূপে আপনাকে এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে। মানুষ যতক্ষণ এইরূপ অনুভব করে ততক্ষণ সে মানুষ। যখন সে আর এরূপ অনুভব না করে তখন সে মানুষ নয়, তখন সে মুক্ত, তখন সে ব্রহ্ম—তখন সে ব্রহ্মে পরিণত। সে পরিণতি কিরূপ, যাহার সে পরিণতি হইয়াছে কেবল সেই তাহা জানে, সেই তাহা বলিতে পারে। আর যে সেই পরিণতির পথে প্রবেশ করিয়াছে সে অতি অস্পষ্ট ভাবে অতি অল্প মাত্রায় অনুভব করিয়াছে—বুঝাইয়া দিতে পারে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝাইয়া দিলেও, সে পথের পথিক না হইলে, বুঝাও বড় কঠিন। প্রহ্লাদের সেই আশ্চর্য্য পরিণতি হইয়াছিল। তাহা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতার আজ্ঞায় জলধিতলে বক্ষে পর্ব্বত ধারণ করিয়া দৈত্যপুত্র স্তব করিতেছেনঃ—

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকসরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথারসঃ॥
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থঞ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত॥
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদাদিতং ভবান্॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ॥
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো॥
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ।
হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥

রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা-
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীবসূক্ষ্মম্॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানাম্
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরাভব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥

যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বে নোপলভ্যতে॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে পরমেশ্বরম্॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

—বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ, ১৯ অধ্যায়, ৬৪—৮৬।

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন! তোমাকে নমস্কার। তুমি তীক্ষ্ণ চক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের হিতকর ও

জগতের মঙ্গলসম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি ব্রহ্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক (বিষ্ণুরূপে) স্থিতিতে পালন করিতেছ এবং কল্পান্তে রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। তুমি ত্রিমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার। দেবতা যক্ষ অসুর সিদ্ধ নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিশাচ রাক্ষস মনুষ্য পশু। পক্ষী পিপীলিকা সরীসৃপ (স্থাবর) ভূমি জল আকাশ বায়ু শব্দ স্পর্শ রস। রূপ গন্ধ মন বুদ্ধি আত্মা কাল ও সত্বাদি গুণ, হে অচ্যুত! তুমিই এতৎ সমুদায়ের কারণ ও এই সমুদায় পদার্থ তোমারই স্বরূপ। তুমি বিদ্যা, তুমি অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমি অসত্য, তুমি বিষ, তুমি অমৃত, তুমি বর্ত্তমানও অতীত সমুদায় বেদোক্ত কর্ম্মস্বরূপ। হে বিষ্ণো! তুমি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোক্তা ও সমস্ত কর্ম্মের উপকরণ এবং তুমিই সকল কর্ম্মের ফল। প্রভো! তুমি আমাকে অন্য সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তি দ্বারা সামর্থাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ সমুদায় সূচিত হইতেছে। যোগীরা তোমাকে চিন্তা করেন। যাজ্ঞিকেরা তোমার উদ্দেশেই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। একমাত্র তুমিই হব্য ও কব্যের ভোক্তা এবং তুমিই পিতৃলোকস্বরূপ ও তুমিই দেবদেহ ধারণ করিয়া আছ। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানা প্রকার জীব জন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং এই জীব জন্তুগণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা তৎসর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায় তোমারই রূপভেদ। এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অবিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ, কোন এক অচিন্ত্যরূপ আছে। তোমার সেই পুরুষোত্তম

নামক রূপকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতমধ্যে তোমার ত্রিগুণাশ্রিত অন্য এক জড়শক্তি আছে। হে সুরেশ্বর! সেই নিত্যশক্তিকে নমস্কার। যাহা বাক্য মনের অগোচর, যাহা জাতিগুণাদিবিশেষণশূন্য এবং যাহাকে আত্মার প্রাদেশিক জ্ঞান, নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তোমার স্বরূপভূতা সেই পরম চিৎশক্তিকে নমস্কার করি। কোন পদার্থই যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে কিন্তু যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই ভগবান বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাঁহার নাম ও রূপ নাই, কেবল অস্তিত্বমাত্রে যাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই মহাত্মাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। দেবগণ যাঁহার সূক্ষ্মরূপ নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতাররূপকে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি সকলের ধ্যেয় ও জগতের আদি। তিনি অব্যয় পুরুষ। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে মহত্তত্ত্বাদিরূপে অক্ষয় অব্যয় এই বিশ্ব ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে, যিনি সকলের আধার, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই

সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয়। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।”—শ্রীজগন্মোহন তর্কলাঙ্কার।

এ অতি বিষম পরিণতি। এ পরিণতি ভাবিয়া উঠা যায় না। এই যে তুমি আমি, শক্তিতে কীটাণু হইতে বড় বেশী বোধ করিতেছি না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই সব ক্ষণস্থায়ী মোহকর মহানিষ্টে জড়াইয়া রহিয়াছি, মোহরূপী মর্ত্তলোক হইতে মন সরাইতে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, ভগবানের কথা মনে করিতে হইলে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি, এই তুমি আমি মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, রূপরসাদি উড়াইয়া দিয়া, মর্ত্তলোক অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া, কীটাণুর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ধরিয়া, ব্রহ্ম হইয়াছি, ব্রহ্ম হইয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কবিতেছি, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছি, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতেছি—কি বিরাট পরিণতি! এ পরিণতি কি তোমার আমার কল্পনায় আসে? এ পরিণতি পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের হইয়াছিল। ঐ স্তবটি বারম্বার ধ্যান করিয়া দেখ—দুই বৎসর ধরিয়া, দশ বৎসর ধরিয়া, ধ্যান করিয়া দেখ—দেখিবে উহা পাগলের প্রলাপ নয়, দর্পীর দর্প নয়, মূর্খের মদোদ্গীরণ নয়—দেখিবে উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্ত্বিকতা-রূপী সাধক প্রধানের সমস্ত সাধনা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—দেখিবে উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্ত্বিকতারূপী

সাধকপ্রধান সাধিয়া সাধিয়া স্বয়ং ধ্যেয় হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিবে উহাতে সৃষ্ট জীব সাধনা দ্বারা সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিয়া সেই রহস্যরসে আত্মসংস্কার সম্পূর্ণ করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন। দেখিবে উহাতে দম্ভের লেশমাত্র নাই, কারণ যেখানে দম্ভ সেখানে এ সাধনায় প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং এ সিদ্ধি ও পরিণতি একেবারেই অসম্ভব। দেখিবে যেখানে জীবের আত্মহীনতার পূর্ণ উপলব্ধি ও ব্রহ্মত্বের গৌরবজ্ঞান উদ্দীপিত সুতরাং ব্রহ্মত্বলাভের তৃষ্ণা অপরিমেয়, কেবল সেইখানেই এই সাধনা, এই সিদ্ধি, এই পরিণতি। আব দেখিবে এই পরিণতি যেমন বিরাট, এই সাধনাও তেমনি বিরাট। জীবের জীবত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, যে সাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয় সে সাধনাও তেমনি বিরাট। নহিলে সেই বিরাট ব্যবধান কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে? সে বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। হয় ত কাহারো অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ হইয়া সংহারেও সে সাধনার শেষ হয় না। এই যে জীবন এখন যাপন করিতেছি এ জীবনের প্রারম্ভে সে সাধনার শেষ নয়। এ জীবনের কত পূর্ব্বে সে সাধনা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই। তুচ্ছ তোমার জন্ম, তাহাতেই বা তোমার কি আরম্ভ হয়, তুচ্ছ তোমার মৃত্যু, তাহাতেই বা তোমার কি শেষ হয়। জন্ম মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দেও, জীবিতকালের কথা ছাড়িয়া দেও—অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের

কথা ভাব। এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া,এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে। এ রঙ্গ্ তামাসার কাজ নয়, প্রজাপতি পতঙ্গের মতন একবার এ পথের এ পাশে একবার এ পথের ওপাশে স্ফূর্ত্তি করিতে গেলে চলিবে না। আগাগোড়া এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে—জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে। এত করিলে যদি এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারা যায়। মনে যে উদ্দেশ্য তাহা এত বৃহৎ, চলিতে হইবে যে পথে তাহা এত দীর্ঘ, সাধন করিতে হইবে যে পরিণতি তাহা এত বিরাট! আমরা বড় নির্ব্বোধ তাই তুচ্ছ ধন সঞ্চয় করিতে হইলে মনে করি যে সকল কাজেই অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, আর এই বিরাট পরিণতি সাধন করা সম্বন্ধে মনে করি যে জীবনের সকল কাজে এই বিরাট উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনাবশ্যক! এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির কথাও নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরাট সাধনার কথাও নাই। আর প্রহ্লাদের স্তবের ন্যায় স্তবও হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মুখে শুনিবার যো নাই। কারণ হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন কথা নাই যে জীবের চরম পরিণতি ব্রহ্ম, স্রষ্টের শেষ মূর্ত্তি স্রষ্টিকর্ত্তা, জীবের লয় ব্রহ্মে, জীবের আদিতেও সোঽহং অন্তেও সোঽহং।

হিন্দুর লয়তত্ত্বে তাহার মানসিক প্রকৃতির কি পরিচয় পাওয়া যায় তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। হিন্দুর লয়ের মোটামুটি অর্থ—জীবত্বের বিশাল জড়ত্ব ও সেই বিশাল জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত বিষম মোহ ভোগাসক্তি প্রভৃতির বিনাশ-হেতু জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মে পরিণতি। জড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা এক রকম অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক তাহাও এক রকম অসীম, যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক তাহাও এক রকম অসীম। যে সময় আবশ্যক তাহাতে কত বর্ষ, কত জন্ম, কত যুগ থাকিতে পারে তাহা কে বলিবে? আর যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক তাহা যে কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে তাহাই বা কে বলিবে? সে সময়েরও সীমা নাই; সে কষ্ট, সে কঠিনতা, সে কঠোরতারও সীমা নাই। জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছি—পথ আর ফুরায় না—কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই, মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই—কবে চলা শেষ হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, ভাবিতে গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এ পাশে ও পাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ! অ-হ-হ কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব ছাড়িয়া, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চলিতেছি—অবিরাম চলিতেছি, অনন্তকাল চলিতেছি* !

* বুঝিবা ইউরোপের মধ্যে ইতালীয় কবি দান্তে ভিন্ন আর কোন কবির কল্পনায় ইহা ধরে না ও সহে না।

তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও, একটু দয়ামায়া, একটু কৃপাকরুণা আছে যে, একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহূর্ত্ত-পরিমিত কাল কমিয়া যাইবে! যাঁহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতেছি, তাঁহাতেও ত দয়াময়া নাই, কৃপাকরুণা নাই। তিনি যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াদিয়াছেন,—তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না। কেহ যে মধ্যস্থ হইয়া, কেহ যে মুরুব্বি হইয়া আমার পথ একটু কমাইয়া দিবে, আমার কষ্ট একটু কমাইয়া দিবে, সে উপায় নাই সে আশা নাই। যত পথ চলিতে হউক, সবই আমাকে চলিতে হইবে, যত কষ্ট স্বীকার করিতে হউক, সবই আমাকে সহ্য করিতে হইবে—কি পথ কি কষ্ট কিছুরই কিঞ্চিণ্মাত্র রেহাই পাইব না। আমি ক্ষুদ্র জীব, কীটাণুকীট, আমাকে এই বিরাট কষ্ট সহ্য করিয়া এই বিরাট পথ চলিয়া যাইতে হইবে*!

---

* হিন্দুর মতে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তি যেমন সম্পূর্ণরূপে মানুযের নিজের চেষ্টায় হইয়া থাকে, ঈশ্বরের কৃপা বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না, তেমনি সে চেষ্টাও যদি আন্তরিক ও প্রণালীশুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার ফলও অব্যর্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ জড় জগতে কারণের কার্য্য যেমন সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক জগতে এই চেষ্টার ফলও তেমনি সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। বোধ হয় যে অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণেও এখনও আমাদের দেশে অনেক ভক্ত ও সাধকের গীতে দেবতার উপর একটা বিষম আব্দার, একটা বড় মিষ্ট রকম জোর জবরদস্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের অপূর্ব্ব গীত এই শ্রেণীর

এখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে এই কথা বলে, যাহার বিশ্বাস এইরূপ, তাহার মানসিক বল অপরিসীম, তাহার মানসিক শক্তি অপরিসীম, তাহার সাহস অপরিসীম, তাহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তাহার অধ্যাত্মিকতা অপরিসীম। তাহার আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক শক্তি অপরিসীম না হইলে সে এমন বিরাট পথের কথা মনেও আনিতে পারিত না, এমন বিরাট সাধনার কথা ভাবিয়াও উঠিতে পারিত না, দয়ামায়া কৃপাকরুণার এত প্রত্যাশাশূন্য হইয়া এমন কঠোর ব্রতে ব্রতী হইবার কথা কল্পনায়ও ধারণ করিতে পারিত না। সে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহ এমন পথের কথা, এমন সাধনার কথা, এমন দয়ামায়া-শূন্যতার কথা মনে করিতে পারে নাই। এসিয়ায় বল, ইউরোপে বল, আমেরিকায় বল— আর কোথাও কেহ মনে করিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিকতায় ও মানসিক বলে পৃথিবীতে তাহার সমান কেহ নাই—তাহার তুলনায় সকলেই বালক। ইউরোপবাসী বল, আমেরিকাবাসী বল, এ বিষম পথের কথা, এ কঠোর সাধনার কথা মনে করিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা কৃপাকরুণার জন্য লালায়িত, তাহারা নতজানু

গীতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ভাবের ধর্ম্ম সঙ্গীত হিন্দু ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী গাহিতে বা রচিতে পারে না। এ ভাবের গান যে গায় সেই হিন্দু। এ ভাবের গান হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্মের একটী লক্ষণ। আমাদের সেই প্রাচীন লয় বা মোক্ষতত্ত্ব আমরা যে এখনও একেবারে হারাই নাই এই রামপ্রসাদী ছাঁচের গানই তাহার একটি পরিষ্কার প্রমাণ।

হইয়া যোড়হাত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কাঁদিয়াই আকুল, বলহীন ও কষ্ট সহিতে অসমর্থ বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই মুরুব্বি ও মধ্যস্থের পদতলে লুণ্ঠিত। মানসিক বলহীনতায় তাহারা বালক, আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতায় তাহারা ননীর পুতুল। তাহারা রক্তমাংসের ভাবনা ভাবিয়াই আকুল। তাহাদের আত্মায় রক্ত মাংসই বেশী, অস্থি বড় কম। তাহারা এখানকার দুই মুহূর্ত্তের জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির, আর সেই দুই মুহূর্ত্তের জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্যই পাগল। ক্ষুধায় অন্ন একমুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম মিলিলে, শীতে কম্বল একখানি কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক কোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া বুরুশ একখানি না পাইলে, বেশবিন্যাসে আল্‌পিন একটী কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে। আর তাহাদের সভ্যতা যত বাড়িতেছে তাহারা এইগুলার জন্যই তত ব্যস্ত তত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাদের আত্মার অস্থি তত নরম হইয়া যাইতেছে। তাই তাহারা ভারতের তপস্বীকে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেয়, ভারতের নিরম্বু একাদশীর কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে, ভারতের বৈধব্যকে বর্ব্বরের নির্ম্মমতা বলিয়া গালি দেয়। তাহারা কষ্ট সহিতে পারে না এমন নয়, খুবই পারে। কিন্তু সে প্রায়ই পার্থিব সুখসম্পদ সঞ্চয় করিবার জন্য। পার্থিব সুখসম্পদ সঞ্চয় করিবার জন্য কষ্ট সহ্যকরাকে—অনাহার অনিদ্রা হিমতাপাধিক্য প্রভৃতি কষ্ট সহ্যকরাকে—তাহারা কতই যে বাহাদুরী মনে করে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু পরকালের নিমিত্ত, ধর্ম্ম সঞ্চয়ের

নির্মিত্ত কষ্ট সহ্যকরাকে—উপবাস, জাগরণ, হিমতাপাদ্যাধিক্য প্রভৃতি কষ্টসহ্যকরাকে—তাহারা নিষ্ঠুরতা এবং অসভ্যতা মনে করিয়া থাকে! হিন্দুর সহিত তাহাদের তুলনা করিতে নাই। হিন্দুর মন বিরাট মন, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বিরাট আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর মানসিক শক্তি বিরাট শক্তি, হিন্দুর সাহস বিরাট সাহস। তাই হিন্দু সেই বিরাটপথে, সেই বিরাট কষ্ট সহ্য করিয়া, সেই বিরাট সাধনার দ্বারা, কৃপাকরুণার প্রয়াসী না হইয়া সেই বিরাট পুরুষে মিশিতে যায়—এই পৃথিবীটাকে অনন্ত পথের একটা মুহূর্ত্তমাত্রের আড্ডা ভাবিয়া ইহার কথা সেই অনন্ত পথের কথায় ডুবাইয়া দিয়া সেই অনন্ত পথভ্রমণের উপযোগী সমাজ ও জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই বিরাট পুরুষে মিশিতে যায়। তাই হিন্দুর সেই বিরাট সাধনায় যে কঠোরতা দেখিতে পাই, তাহার সমাজ ও জীবনপ্রণালীতেও সেই কঠোরতা দেখিতে পাই। হিন্দু যথার্থই কিছু কঠোর, কিছু কঠিন, কিছু নিষ্ঠুর। কিন্তু তাহার সেই বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কিছু কঠোর হইতেই হয়, কিছু কঠিন হইতেই হয়, কিছু নিষ্ঠুর হইতেই হয়। সে যদি কেবল এই পৃথিবীটার ভাবনা ভাবিত তাহা হইলে তাহাকে কঠোরও হইতে হইত না, কঠিনও হইতে হইত না, নিষ্ঠুরও হইতে হইত না। বালককে যদি চিরকালই বালক করিয়া রাখিতে হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতেও হয় না, শাস্তি দিতেও হয় না। হিন্দু অনন্ত কালের ভাবনা ভাবে বলিয়া কিছু কঠোর কঠিন ও নিষ্ঠুর। মনুষ্যকে সেই সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে বলিয়া সে মানুষের প্রতি কিছু কঠোর কঠিন ও

নিষ্ঠুর। আর বলিলে যদি অপরাধ না হয় তবে বলি, হিন্দুর কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতা সেই সচ্চিদানন্দের কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতার অনুরূপ। মনের মধ্যে হিন্দুর মন বিরাট মন, মনুষ্য মধ্যে হিন্দু বিরাট মনুষ্য। বিরাটত্ব ও বিরাটত্বপ্রিয়তা হিন্দুর লয়ের একটি প্রধান অর্থ। এবং হিন্দুত্বের একটি প্রধান লক্ষণ।

হিন্দুর প্রকৃতিগত যে কঠিনতার কথা বলিলাম হিন্দুর হিন্দুত্ব বা বিশেষত্বের তাহা একটি প্রধান উপাদান। অন্যান্য উপাদানের ন্যায় এই উপাদানের গুণেও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত মহত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ কষ্টসহিষ্ণু না হইতে পারিলে এবং কষ্ট দেখিয়াও কঠিন হইতে না পারিলে ধর্ম্ম হইতে নিকৃষ্ট বিষয়েও উন্নতি লাভ করা যায় না। পার্থিব সম্পদের জন্য অন্যান্য জাতি সকল কষ্ট সহ্য করে এবং কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়া কাতর হয় না বলিয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদ আজ এত বেশী। পার্থিব অধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য কত জাতিকে কত লোকক্ষয় করিতে হইতেছে, কত বীরপুরুষকে, কত সৈন্যসামন্তকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে হইতেছে। এত শোণিতপাত, এত অকালমৃত্যু, এত লোকক্ষয় দেখিয়া তাহারা যদি কাতর হইত তাহা হইলে তাহাদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি করা হইত না। যে কোন বিষয়েই হউক, জয়ী হইতে হইলে কঠিন হইতেই হয়, শক্ত হইতেই হয়। মনের শক্তি, মনের মাঝা ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব। হিন্দুর মনের শক্তি মনের মাঝা এত বেশী ছিল বলিয়া ধর্ম্মজগতে তাহার উন্নতি ও প্রতিপত্তি অতুলনীয় হইয়াছিল। হিন্দুর এই কঠিনতাই হিন্দুকে

হিন্দু করিয়াছিল। এই কঠিনতার গুণেই এক একটা জাতির জাতীয়তা হয় ও জাতীয় উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব হয়। এ কঠিনতা গেলে হিন্দুত্বের একটা প্রধান লক্ষণ তিরোহিত হইবে, একটা উৎকৃষ্ট উপাদান নষ্ট হইয়া যাইবে, হিন্দুর জাতীয়তা সঙ্কটাপন্ন হইবে। বোধ হইতেছে যেন ইউরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই কঠিনতা কমিয়া যাইতেছে, আমাদের মনের অস্থি নরম হইয়া পড়িতেছে। অতএব যাহাতে আমাদের এই জাতীয় কঠিনতা রক্ষা পায় প্রাণপণ করিয়া আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আপত্তি হইতে পারে, লয়তত্ত্ব সত্য নয়। ইহার উত্তরে বলি—লয়তত্ত্বের সত্যাসত্যাদির কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু লয়তত্ত্ব যে উদ্ভাবন করে এবং লয়তত্ত্ব যে অনুসরণ করে সে যে বিরাটত্ব-প্রিয় এবং তাহার মন যে বিরাট মন সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব এ কথা বলিতে পারি যে লয়তত্ত্ব অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক হইলেও উহার উদ্ভাবনে যে বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব প্রকাশ পায়, একথার সত্যতা অপলাপ বা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব যদি হিন্দুত্বের লক্ষণই হয় তবে সে লক্ষণ ব্যতীত হিন্দুত্ব কি অধোগতি প্রাপ্ত হইবে না? বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব যদি উচ্চ উৎকৃষ্ট জিনিষ হয় তবে সে জিনিষের অভাবে উন্নতি বুঝাইবে না অবনতি বুঝাইবে? যে বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে হিন্দুর এই বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল

সে বিষয়ে যদি তোমার বিশ্বাস বা আস্থা না থাকে, অর্থাৎ, যদি তোমার ব্রহ্মে বিশ্বাস না থাকে কিম্বা তোমার ব্রহ্মজ্ঞান সেই প্রাচীন হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তুমি অন্য বিষয়ে সেই উচ্চ উৎকৃষ্ট অসাধারণ গুণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিও, তাহা হইলেও তোমার হিন্দু বিশেষত্ব রক্ষিত হইবে। কিন্তু সে অসাধারণ গুণের প্রতি হতাদর হইও না। হতাদর হইলে প্রকৃতই তোমার অবনতি ও অধোগতি হইবে, তোমার হিন্দু বিশেষত্ব নষ্ট হইবে। হিন্দুর এই বিশেষত্ব বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ বলিয়াই তোমাকে উহা রক্ষা করিতে বলিতেছি।

কিন্তু হিন্দুর কাছে লয়তত্ত্ব অসত্য নয়। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন এবং ধর্ম্মানুরাগী ঋষি ও শাস্ত্রদর্শীরা বহুকালব্যাপী গভীর আলোচনা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা এই অসাধারণ লয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মানুরাগ, সত্য-প্রিয়তা, যোগবল অসাধারণ ও অবিসম্বাদী। ব্রহ্মে তাঁহাদের অগাধ ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভক্তি এবং অলৌকিক দৃষ্টি ছিল। তাই তাঁহারা ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মে লীন হওয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যেখানেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি প্রায় সেইখানেই এক রকম না একরকম লয়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে। যীশুখৃষ্ট মনুষ্যকে বলিয়াছেন—"Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect"—মেথিউ—৫, ৪৮। এই উপদেশে মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করিতে বলা হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করা আর ঈশ্বরে লীন হওয়া একই কথা। অতএব লয়তত্ত্ব একা হিন্দুর নয়,

খৃষ্টীয়দেরও বটে। এবং আজিও সেইজন্য প্রকৃত খৃষ্টানের মতে আপনাকে বা অপরকে সুখী করা অর্থাৎ 'আত্মসুখ' বা 'বিশ্বের সুখ' মানব জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরে লীন হওয়া বা যীশু খৃষ্টের কৃপায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করাই মানব-জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য। পরার্থপরতা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার একটি উপায় বটে, কিন্তু পরার্থপরতা আর সে উদ্দেশ্য এক নয়। ফল কথা, যেখানে ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলক বা ঈশ্বরকে লইয়া সেখানে জীবনের আদর্শ বা প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরসংসৃষ্ট হইবেই হইবে। অতএব যেখানে জীবনের আদর্শ বা প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরসংসৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত স্বীকৃত বা আদৃত না হয় সেখানে বোধ হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই এবং ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলক বা ঈশ্বরকে লইয়া নয়।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেই লয়তত্ত্ব থাকিলেও দুইটি লয়তত্ত্ব অনুসরণ করিবার অর্থ বা ফল এক নয়। কারণ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে হিন্দুর সংস্কার এক রকম খৃষ্টানের সংস্কার অন্য রকম। হিন্দুর ঈশ্বর নির্গুণ, খৃষ্টানের ঈশ্বর সগুণ। হিন্দুর ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের কি সদ্‌গুণ কি অসদ্‌গুণ কোন গুণই নাই, খৃষ্টানের ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের সদ্‌গুণ ত আছেই, দুই একটা অসদ্‌গুণ ও বা আছে—খৃষ্টানের ঈশ্বর শুধু প্রেমময়, স্নেহবান, বা দয়ালু নন, ক্রোধপরায়ণও বটেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি বিষয়ক সংস্কারের এই বিপুল বিভিন্নতা বশতঃ দুইটি লয়তত্ত্বের অর্থেও বিপুল বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কারণ খৃষ্টানের লয় যত কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ হিন্দুর লয় তাহার কোটী গুণ কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ। এবং এত বেশী কষ্টসাধ্য ও

কালসাপেক্ষ বলিয়া হিন্দুর লয়তত্ত্বে হিন্দুর বিরাটত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

কিন্তু হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ স্থুধু বিরাটত্ব নয়, সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও উহার একটি অর্থ। কিন্তু নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে মায়া মোহ লোভ কামনা বাসনা প্রভৃতি মোহময় সংসারের সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে সমাজও থাকে না, কবিতা পড়িতেও হয় না, প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্যও দেখিতে হয় না, পরোপকারও করিতে হয় না, ইত্যাদি—সংসার হইতে দূরে থাকিয়া দিবারাত্রি চক্ষু মুদিয়া ব্রহ্মের ধ্যান করিলেই হয়। আমাদের লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এই রকম কথা কহিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দেখাদেখি এদেশেও কেহ কেহ এই রকম কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল আপত্তি অতি অসার ও অকিঞ্চিৎকর। এ সকল আপত্তি শুনিলে মনে হয় আপত্তিকারিগণ বুঝি ভাবেন যে সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া একটা ঘর হইতে আর একটা ঘরে যাওয়ার মতন অনায়াসসাধ্য এক নিমিষের কাজ, ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য কোন রকম শিক্ষা বা অনুশীলনের প্রয়োজন নাই, সাধনারও প্রয়োজন নাই, কিছুরই প্রয়োজন নাই! তাঁহারা বুঝি মনে করেন যে জীবের জীবপ্রকৃতি—মায়ামোহ ভোগেচ্ছা সঙ্গলিপ্সা সামাজিকতা প্রভৃতি—এতই দুর্ব্বল যে ধ্বংস করিব মনে করিলেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়! প্রকৃত কথা এই যে, মানুষের জীব প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত প্রবল যে অতি কঠিন শিক্ষা ও

শাসন সত্ত্বেও তাহা অনেক স্থলে সংশোধিত হয় না। অপর পক্ষে সেই জীবপ্রকৃতির এমন একটি ধর্ম্ম আছে যে সুপ্রণালীতে পরিচালিত হইলে তাহাই মানুষকে দেবপ্রকৃতি লাভ করিতে সহায়তা করে। অতএব জীবপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া দেবপ্রকৃতি বা তদপেক্ষা উচ্চ ও বিশুদ্ধ যে নির্গুণ প্রকৃতি তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করা বাতুলের কাজ। এবং যদি কেহ মনে করেন যে আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ চেষ্টার প্রশংসা বা ব্যবস্থা আছে তবে তিনি নিজেই বাতুল। আমাদের শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ও সমাজধর্ম্মের যত প্রশংসা ও ব্যবস্থা আছে তত আর কোন শাস্ত্রে নাই। ফলতঃ মন্বাদি প্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্রের পনর আনারও বেশীভাগ গৃহ ও সমাজ সম্বন্ধে। এবং যাঁহারা হিন্দুর লয়তত্ত্বকে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিকূল বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা নিজেই অনেক সময় আমাদের মন্বাদি শাস্ত্রকার-দিগের গৃহ ও সমাজবিষয়ক ব্যবস্থাগুলিকে বড় বেশী আঁটা-আঁটি বেশী পীড়াপীড়ির ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আসল কথা এই যে শিক্ষা ও শাসন দ্বারা মানুষের জীব-প্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংযত করিতে না পারিলে মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও দেব-প্রকৃতি লাভ করিতে বা নির্গুণ প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহা জানিতেন, অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা ইহা বেশী বুঝিতেন, তাই তাঁহারা গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও এত কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, বিবাহাদি যে সকল গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের ঐন্দ্রিয়িক স্পৃহাদি চরিতার্থ

হয় মানুষকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। এবং পার্থিব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি যে বালক বা যুবক যোগীর নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিলে যোগী তাহাকে কিছুতেই দীক্ষিত করেন না এবং বৈরাগ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাশ্রমে গমন করিতে উপদেশ দেন। যোগী ও শাস্ত্রকারদিগের এরূপ করিবার অর্থ এই যে মানুষের জীবপ্রকৃতি ভোগ দ্বারা চরিতার্থ না করিয়া বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ করিতে পারাও যায় না। অতএব যেখানে ধর্ম্মের শিরোভাগে হিন্দুর লয়তত্ত্ব সেইখানেই গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন যত আবশ্যক ও যত অনুষ্ঠিত অন্য কোথাও তত নয়। কিন্তু জীবপ্রকৃতির ভোগ অনিয়ন্ত্রিত হইলে জীবপ্রকৃতি কখনই দেবপ্রকৃতি লাভের অনুকূল হয় না, বিষম প্রতিকূলই হইয়া থাকে। অপর পক্ষে জীব-প্রকৃতি সুনিয়মে চরিতার্থ হইলে দেবপ্রকৃতি লাভের বিশেষ অনুকূলই হয়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করা সম্বন্ধে এত আঁটাআঁটি নিয়ম। এবং এই জন্যই বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আবার মায়ামোহাচ্ছন্ন মনুষ্যকে মায়ামোহমুক্ত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক সাধনা আবশ্যক—মানুষ মনে করিলেই সে দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষের মায়া-

মোহের মূলে স্বার্থপরতার অনুকূল প্রবৃত্তি। সে সকল প্রবৃত্তির বিষম শক্তি, বিষম বল। সে সকল প্রবৃত্তি দমন করিব মনে করিলেই দমন করা যায় না। অতএব ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইব মনে করিলেই অগ্রসর হওয়াও যায় না। সে সকল প্রবৃত্তি দমন করিবার নানা উপায় আছে। তন্মধ্যে এক উপায় উহাদের সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালন। সে কথা উপরে বলিয়াছি। আর এক উপায় পরার্থপরতার অনুকূল প্রবৃত্তিগুলির অধিকতর পরিচালন। ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য যে সাধনা বা প্রক্রিয়া আবশ্যক ও অপরিহার্য্য পরার্থপরতার অনুশীলন তাহার অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ ও সমীচীন উপায়। ব্রহ্মত্ব লাভের একটি অর্থ মায়া-মোহাদিজনিত সঙ্কীর্ণতা বিনাশ করিয়া ব্রহ্মের বিশাল ব্যাপকতা লাভ করা। এই পরিবর্ত্তন বা পরিণতিকে এক কথায় আত্মপ্রসারণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা বলেন ইহার অর্থ আত্মনাশ তাঁহারা বোধ হয় ভুল বুঝেন—তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা বা বিকৃতি বশতঃ আমাদের লক্ষ্যতত্ত্ব প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ। এই আত্মসম্প্রসারণ সংসাধনার্থ পরার্থপরতার অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ পরার্থপরতার অনুশীলন ব্যতিরেকে স্বার্থপরতাজনিত সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না বা পরার্থপরতার ব্যাপকতায় পরিণত হইতে পারে না। পরার্থপরতার অনুশীলনে স্বার্থপরতার যে হ্রাস পকতা হয় অথবা যে পরিমাণ আত্মসম্প্রসারণ লাভ করা যায় তাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকতা পাওয়া যায় না সত্য। ব্রহ্মের ব্যাপকতা লাভ করিবার জন্য পরার্থপরতার অনুশীলনজনিত ব্যাপকতা বা আত্মসম্প্র-

সারণের উপরেও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনজনিত ব্যাপকতা বা আত্মসম্প্রসারণ আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মের ব্যাপকতা লাভ করিবার পক্ষে পরার্থপরতার অনুশীলনজনিত ব্যাপকতা বড় অকিঞ্চিৎকর নয় এবং একেবারেই অপরিহার্য্য। কারণ পরার্থপরতার অনুশীলনজনিত ব্যাপকতা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত—ব্রহ্মের ব্যাপকতা লাভ করিবার জন্য যে বিরাট সাধনা আবশ্যক তাহার ক্রম বা পর্য্যায় স্বরূপ। কিন্তু পরার্থপরতার অনুশীলন দ্বারা আত্মসম্প্রসারণ করিতে হইলে অর্থাৎ স্বার্থপরতাকে পরার্থপরতায় পরিণত করিতে হইলে অথবা পরার্থপরতাকেই স্বার্থপরতা করিয়া তুলিতে হইলে সমাজ অপরিহার্য্য। সমাজ ছাড়িলে পরার্থপরতার অনুকূল প্রবৃত্তির পরিচালন এক রকম অসম্ভব হয় বলিলেই হয়। এবং সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের এত প্রশংসা এবং গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের জন্য এত পীড়াপীড়ি। গৃহস্থ অপর সকল আশ্রম পালন করেন বলিয়া গৃহস্থাশ্রম অপর সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মনু একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। এবং গৃহস্থাশ্রমে মানুষের স্বার্থপরতা পরার্থপরতায় পরিণত হইতে পারে বা পরার্থপরতা প্রকৃষ্ট স্বার্থপরতা হইয়া উঠিতে পারে এই উদ্দেশে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা আত্মসেবা সঙ্কুচিত করিয়া পরসেবাই গৃহস্থের প্রধান ও নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অনন্যমনা হইয়া অনুক্ষণ সেই কঠিন ব্যবস্থার অনুসরণ না করিলে কিছুতেই পরার্থপরতা শিখিতে পারা যায় না, পরার্থপর হইব বলিলেই হওয়া যায় না, যিনি মনে করেন হওয়া যায় পরার্থপরতা কি বিষম সাধনা তিনি

তাহা জানেন না। গৃহে মোহমূলক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর অত্যন্ত বেশী। অতএব ধর্ম্মের শাসনে গৃহে মোহমূলক প্রবৃত্তি সকল দমিত না হইলে পরার্থানুকূল প্রবৃত্তি সকল কখনই ফুটিতে পারে না এবং মানুষ কখনই মোহমুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ, যে মোহমুক্তাবস্থা নির্গুণ অবস্থার প্রবেশদ্বার স্বরূপ সেই মোহমুক্তাবস্থা লাভ করিতে পারে না। যে আপনাতে ও আপনার গুলিতে মুগ্ধ সে কেমন করিয়া পরের ভাবনা ভাবিবে? পরার্থপরতায় পরের প্রতি স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বুঝায় বটে, কিন্তু সে স্নেহ বা দয়া বা প্রীতি মোহ নয়, যে মোহ মানুষকে আপনাতে বা নিতান্ত আপনার বস্তুতে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সে মোহ নয়, তাহাতে মোহের অন্ধকারও নাই, সঙ্কীর্ণতাও নাই, দুরাশাও নাই, দুর্নীতিপরায়ণতাও নাই। সেই স্নেহ দয়া বা প্রীতিই সম্পূর্ণ প্রশস্ততা ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া বিশ্বব্যাপী মৈত্রীর আকার ধারণ করে— যে বিশ্বব্যাপী মৈত্রী প্রহ্লাদে প্রস্ফুটিত, জীবন্মুক্ত নারদ যাহার অদ্বিতীয় অতুলনীয় এবং অলৌকিক উদাহরণ ও প্রতিকৃতি এবং চৈতন্যদেব যাহার শেষ অবতার। অতএব লয়ের পথে প্রবেশ করিতে হইলে গৃহও যেমন আবশ্যক সমাজও তেমনি আবশ্যক, গৃহও যেমন অপরিহার্য্য সমাজও তেমনি অপরিহার্য্য। গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থাও আমাদের শাস্ত্রে আছে। আমাদের শাস্ত্রে যেমন আছে অন্য কোন শাস্ত্রে তেমন নাই। কিন্তু সংযত আচারে ও সমাজের সেবায় ইন্দ্রিয়াদিজনিত মোহ বহুল পরিমাণে বিনষ্ট না হইলে গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা নাই। আবার সমাজ

হইতে দূরে বাস করিবার বিধি থাকিলেও সমাজ ভুলিয়া থাকিবার ব্যবস্থা নাই। অনেকে মনে করেন যে যোগী হইলে কেবল ভগবানের কথাই ভাবিতে হয়, লোকসমাজের কথা ভাবিতেও হয় না, লোকহিতার্থ কোন কাজকর্ম্মও করিতে হয় না। কিন্তু ইহার অপেক্ষা ভ্রম বোধ হয় আর কিছুই নাই। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই অরণ্যবাসী যোগী ঋষি তপস্বীরা সর্ব্বদাই লোকহিতকর কার্য্য করিতেছেন, সর্ব্বদাই সমাজের হিতচিন্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। যখনই লোক বিপদগ্রস্ত বা শত্রুভয়ে সন্ত্রাসিত তখনই দেখিতে পাই ঋষি তপস্বীরা তাহাদিগকে বিপদমুক্ত বা ভয়ভ্রষ্ট করিতেছেন। দৈত্যভয় নাশ করিবার জন্য অগস্ত্যমুনি সমুদ্রবারি গণ্ডূষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর বিনাশ করিবার জন্য দধীচি মুনি আপনার দেহের অস্থি দান করিয়াছিলেন, জনপদে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে অরণ্যে ঋষি তপস্বীরা অনিষ্টনিবারণার্থ যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে বন হইতে ব্রহ্মচারিরা আসিয়া রাজাকে সদুপদেশ দিয়া যাইতেন। লোকসমাজের সুখ দুঃখের কথা অরণ্যচারী ঋষি তপস্বীরা যত ভাবিতেন আর কেহ তত ভাবিতেন কি না বলিতে পারি না। যখনই তখনই দেখিতে পাই এই ঋষি এই রাজার সভায় আসিয়া রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঐ ঋষি ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজাপালন প্রণালী বুঝাইয়া দিতেছেন। পূজনীয় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অনেক যোগী তপস্বীর সহিত আলাপ করিয়াছেন, অনেক যোগী তপস্বীর কাজকর্ম্ম ও জীবন প্রণালী

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। যোগী তপস্বী সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"যোগীদের সংবাদপত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্ন দ্বারা তাঁহাদের সংবাদ প্রকাশিত হয় না, তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জন কাননে বা গিরিকন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা অলস-প্রকৃতি, ধ্যান-পরায়ণ, সংসার-বিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তাহা হইলে তাঁহার ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটি সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগ-স্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়ম বশে ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলা ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া যোগী দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগী চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্যলেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ্, ঋষিরা গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্র, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থা-

পক ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও সেই দেশে যে আজ যোগ, তপস্যা ও আলস্য এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাযোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্ব্বতগুহার নির্জ্জন সাধন পরিত্যাগ করিয়া, অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি শত সহস্র ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া দূর দূরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং বিধিমতে ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম পবিত্রতা সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি সমুদিত করিয়া, জলকষ্টে পীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্রলোকের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া আমরা চীৎকার করিতেছি যোগ আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা

আনিয়া দেয়! লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা। যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটা কথার প্রতিধ্বনি এমার্সন, কারলাইল প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগীগণের নিকট পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যীশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবন-সুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে* ?”

এইরূপই ত হইবার কথা। মোহমুক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মভক্ত যোগী ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডকে যেমন ভাল বাসিবেন আর কেহই তেমন বাসিবেন না, বাসিতে পারিবেন না। এবং বোধ হয় যে তিনি ভিন্ন আর কেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভাল বাসেনও না বাসিতে পারেনও না। অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে গৃহ ও সমাজ অপরিহার্য্য, গৃহ ও সমাজের ভিতর দিয়া না গেলে লয়ের পথে প্রবেশ করা এক রকম অসম্ভব। এবং ইহাও বুঝা গেল যে ঋষি তপস্বীর ন্যায় লয়ের পথে বেশী অগ্রসর হইলে মানবমন বেশী মোহমুক্ত হইয়া সমাজের বেশী কল্যাণ-কামী হইয়া থাকে এবং মানব সমাজের বেশী কল্যাণসাধন করিয়াও থাকে। এই একটি কথা।

* যোগ-সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত—২৭—৩০ পৃষ্ঠা।

আর একটি কথা। লয় কত সাধনাসাপেক্ষ তাহা বলিয়াছি। কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। অতএব লয় যে শাস্ত্রের চরম কথা এবং লয় যে সমাজের শেষ লক্ষ্য সে শাস্ত্রে এবং সে সমাজে মনুষ্যের ও সমাজের দীর্ঘ জীবন যে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ যেখানে দীর্ঘ সাধনা আবশ্যক সেখানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার প্রয়াস স্বভাবতই প্রবল হইবার কথা। আমাদের মধ্যে হইয়াছিলও তাহাই। মনুষ্যের জীবন ও মনুষ্যসমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে বোধ হয় আর কোথাও সেরূপ নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সহিতও ঐ উদ্দেশ্য জড়িত। আমাদের আহ্নিক ক্রিয়াতেও ঐ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত। দীর্ঘ সাধনার জন্য দীর্ঘজীবন এত আবশ্যক বলিয়াই পুরাণে বহুসহস্রব্যাপী তপস্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রজার অকালমৃত্যু রাজার মহাপাপের ফল বলিয়া উক্ত। ফলতঃ অসীম সাধন-সাপেক্ষ লয় যেখানে জীবনের চরম উদ্দেশ্য জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্যকতা সেখানে যত অধিক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পারে না। এবং সমাজের ভিতর দিয়া না গেলে যখন লয়ের পথে প্রবেশ করিবার উপায় নাই তখন সমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্যকতাও সেখানে যত অধিক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পারে না।

অতএব যেখানে হিন্দুর লয়তত্ত্ব সেইখানেই গৃহ ও সমাজ

অপরিহার্য্য এবং দীর্ঘ জীবন অত্যাবশ্যক, অন্য কোথাও নয়। আর তাহাই যদি হইল তবে যেখানে হিন্দুর লয়তত্ত্ব সেখানে সামাজিকতা প্রভৃতি গুণ যেমন আবশ্যক জীবন ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আয়ত্ত ও অধিকার করাও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু এই দুই প্রকার আবশ্যকতার মধ্যে অনেক জিনিষই পড়িতেছে—কর্ম্মশীলতা, উদ্যমশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, সঙ্গসুখপ্রিয়তা, ধর্ম্মজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য—অনেক জিনিষই পড়িতেছে। পড়িতেছে সকলই। কিন্তু এমন মাত্রায় পড়িতেছে যে কোনটিই ধর্ম্মচর্য্যার ও লয়ের পথে প্রবেশের অন্তরায় না হয়। ইহাতেই সকলগুলির সামঞ্জস্য—ইহা ছাড়া মানুষের কার্য্যকারিণী চিত্তরঞ্জিনী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অন্য কোন সামঞ্জস্য নাই, বোধ হয় হওয়াও বড় কঠিন। বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িয়া বড়আহ্লাদ হইল, তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সকল জিনিষ পড়ে বলিয়া কোন জিনিষই যে কখনও বাদ পড়ে না বা পড়িতে পারে না এমন কোন কথা নাই। নানা কারণে নানা জিনিষ বাদ পড়িয়া থাকে, প্রাচীন ভারতে বাদ পড়িয়াও ছিল। কিন্তু কোন জিনিষকে বাদ পড়িতেই হইবে এমন কোন কথা নাই, লয়তত্ত্বের এমন অর্থও নয়, অনুরোধও নয়। আর যে জিনিষ বাদ দিলে মনুষ্যের বা সমাজের জীবন বিপন্ন হয়, লয়তত্ত্বানুসারে সে জিনিষ বাদ দেওয়ার ন্যায় মহাপাতকও আর নাই। প্রাচীন ভারতে অন্নসমস্যা উপস্থিত হয় নাই, সেই জন্য বাহ্য উদ্যমও কম হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাতে দোষও হয় নাই, পাপও হয় নাই। এখন ভারতে অন্নসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এখন

বাহ্য উদ্যমও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন জীবনরক্ষার্থ বাহ্য উদ্যমের ত্রুটী হইলে যথার্থই আমাদের মহাপাতক হইবে। পূর্ব্বকালে জীবনরক্ষার্থ আমাদের বাহ্যোদম যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু এখন ভিন্ন প্রণালীর ও অধিক পরিমাণ বাহ্যোদ্যম আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভিন্ন প্রণালী ও বর্দ্ধিত পরিমাণ আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। নহিলে আমাদের মরণ ও মহাপাতক সুনিশ্চিত। কিন্তু এই নূতন প্রণালী ও বর্দ্ধিত পরিমাণ আয়ত্ত করিতে গিয়া যেন মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া না হয়, জীবনের সেই চরম উদ্দেশ্য যেন ভুলিয়া যাওয়া না হয়, মুক্তির পথ হইতে মোহের পথে আসিয়া যেন পড়া না হয়। আমাদের আজিকার অবস্থায় আমাদিগকে যে পথে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে হইবে সেটা মোহেরই পথ—সে পথে বেশী গেলে বিষম বিপদ। অতএব সে পথে যতটুকু গেলে আজিকার অবস্থায় জীবন রক্ষা হয়, যাহাতে তাহার বেশী যাওয়া না হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সে পথ বড় মনোহর, বড় মোহকর, সে পথে বেশী গিয়া পড়িবারই কথা। সে পথে যাহারা বেশী গিয়াছে তাহারা জড়ত্বে বড়ই জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পৃথিবীর বাসনানলে ঠিক কীট পতঙ্গের মতন পুড়িতেছে! তাই বলিতেছি, সে পথে যাহাতে বেশী যাওয়া না হয় সকলে সমবেত হইয়া সেই চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা সফল হইবে কি না বিধাতাই জানেন। হিন্দুর ইতিহাসে এমন সঙ্কটাপন্ন কাল আর উপস্থিত হয় নাই। আর চেষ্টা যদি সফল হইবার হয় তাহা হইলে হিন্দুর ইতিহাসে বিধাতার বিহিত বড় সুসময়ই উপস্থিত হইয়াছে। ভরসা করি বিধাতার মনে ভালই আছে।

আর একটি কথা। লয় যেমন বহু সাধনা সাপেক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত লয় হয় না সে ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি বহু অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা দেখিলে, যাহা বুঝিলে, যাহা অনুভব করিলে, ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনের উপায়। অতএব পদার্থবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিষ। আবার লয়ের পথে চলিতে গেলে কঠোর প্রণালীতে ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া, মায়ামোহ হইতে দূরে গমন করিতে হয় বলিয়া যে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, কোমলতা, কমনীয়তা রমনীয়তা মাধুর্য্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা নয়। ত্যাগ করা দূরে থাকুক, সে সকল নহিলে চলে না। বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না, যে ভাবে উপলব্ধি করিবেন আর কেহই সে ভাবে করিবেন না। ঋষিরচিত রামায়ণে, ভাগবতে, পুরাণে বিশ্বের শোভাসৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ, কি পবিত্র ধ্যান! আর ঋষি তপস্বীর তপোবনেই না বেশী ফুল ফুটে, বেশী মৃগমৃগী খেলাইয়া বেড়ায়, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যায়। প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মোহ নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য মানুষকে ব্রহ্ম ভুলায় না, প্রকৃত সৌন্দর্য্য মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়, কেননা ব্রহ্মই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ব্রহ্মচারী ভিন্ন আর কেহ বিশ্বের সৌন্দর্য্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখিও, একটু বেশী তলাইয়া দেখিও, দেখিবে যে যে ব্রহ্মচারী নয় তাহার সৌন্দর্য্যের ভিতর

একটু পাপ, একটু মলা, একটু কলঙ্ক আছে এবং যেখানে ব্রহ্ম-চর্য্য নাই সেখানে জগতের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য—সুন্দর রং, সুন্দর স্বর, সুন্দর সৌরভ—পাপের প্রবল পরিপোষক। হিন্দুর লয়তত্ত্বে এবং বিশ্বের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যতত্ত্বে বড়ই আত্মীয়তা।

[পরিশিষ্ট ।]

এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধনা নামক মাসিক পত্রিকায় গুটিকতক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। একটী আপত্তি এই যে প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদী লয় বলিতে আত্মসম্প্রসারণ বুঝেন না, লয়ই বুঝেন। অতএব লয়ে আত্মসম্প্রসারণ বুঝায় এই ধারণায় আমি যে গৃহ ও সমাজের আবশ্যকতা নিরূপণ করিয়াছি তাহা ভুল হইয়াছে। আর একটী আপত্তি এই যে সগুণ ও নির্গুণ অবস্থার মধ্যে কোন রকম যোগ বা সাদৃশ্য নাই, অতএব সগুণ অবস্থা হইতে নির্গুণ অবস্থায় যাইবার কোন উপায়ও নাই। এবং সেই জন্য সমাজে থাকিয়া পরার্থপরতার অনুশীলন নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে কিছুমাত্র ফলোপধায়ক হইতে পারে না। অতএব সগুণ হইতে নির্গুণ অবস্থার দিকে যাইবার একটা ক্রম প্রদর্শন করিয়া আমি সগুণ ও নির্গুণের একটা বিশ্রী খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছি। আরো একটী আপত্তি এই যে প্রকৃত লয়তত্ত্বে বিশ্ব অসৎ এবং বিশ্বনাথের লীলা নয়। অতএব লয়তত্ত্ব মানিতে হইলে পৃথিবীটা মরুভূমি হইয়া যায়। এই সকল আপত্তি উপলক্ষে আমার কথাগুলি আরো একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়ায় লাভ ভিন্ন অলাভ নাই।

১৮ পৃষ্ঠায় বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদের একটি স্তব উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই স্তবে প্রহ্লাদকে ব্রহ্মে লীন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়া কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সেই স্তবটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইতে পারে। প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

মযান্যত্র তথা শেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো॥

"প্রভো! তুমি আমাকে, অন্য সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তি দ্বারা সামর্থাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ সমুদায় সূচিত হইতেছে।"

ইহাতে অপরিমেয় ব্যাপ্তি ব্রহ্মের একটি লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্তবের শেষাংশ।—

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃপুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥

যাঁহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে।

ব্রহ্ম কি?—যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।

ইহা সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি।

আমি প্রহ্লাদ কি হইয়াছি?—মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং।

ইহাও সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি।

ইহাতেও যদি বুঝিতে কিছু বাকি থাকে তবে শুন—প্রহ্লাদের সেই শেষ কথাটি—

ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্।

আমার নাম ব্রহ্ম; আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। **আমিই পরম পুরুষ।**

অতএব পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে-লীন প্রহ্লাদ একই পদার্থ। এই জন্যই বলিয়াছি যে ব্রহ্মে লয় হওয়া এবং ব্রহ্মের প্রকৃতি লাভ করা একই কথা।

কিন্তু ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে-লীন প্রহ্লাদ যখন একই পদার্থ তখন ব্রহ্মে যে অপরিমেয় ব্যাপ্তি আছে ব্রহ্মে-লীন-প্রহ্লাদেও সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি পাছে। প্রহ্লাদের স্তবেও দেখিলাম, তাহাই বটে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের স্তব পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানুষ ব্রহ্মে লীন হইলে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ জীবের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া ব্রহ্মের ব্যাপ্তি বা বিস্তার লাভ করে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ব্যাপ্ত বা বিস্তৃত হওয়া আর প্রসারিত হওয়া, এই দুয়ের মধ্যে অর্থগত কোন প্রভেদ আছে কি? আমার বোধ হয় কোন প্রভেদই নাই। কিন্তু প্রভেদ যদি না থাকে তবে লয়ের অর্থ আত্মব্যাপ্তি না বলিয়া আত্ম-

সম্প্রসারণ বলিলে বিশেষ দোষ বা ভুল হয় কি? সেই জন্য আমি বলিয়াছি যে লয়ের অর্থ আত্মবিনাশ নয় আত্মসম্প্রসারণ।

আমি ইহাও বলিয়াছি যে মানুষকে যদি ব্রহ্মরূপে সম্প্রসারিত হইতে হয় তাহা হইলে তাহার গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার কারণ এই—সঙ্কীর্ণতা ও সম্প্রসারণ দুইটি পরস্পর বিরোধী জিনিষ। অতএব সম্প্রসারিত হইতে হইলে সঙ্কীর্ণতা কমাইতেই হইবে। সুতরাং সম্প্রসারণের পরিমাণ যত বাড়ান আবশ্যক হইবে সঙ্কীর্ণতার পরিমাণ তত কমান আবশ্যক হইবে। মানুষের প্রথমাবস্থা স্বার্থপরতার অবস্থা, মোহাচ্ছন্নাবস্থা। সে অবস্থায় মানুষ অপনাকে লইয়াই থাকে, আপনাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেটা মানুষের যারপর-নাই অন্ধ ও সঙ্কীর্ণ অবস্থা। তাহা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, সম্প্রসারিত বা মুক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, এবং সম্প্রসারিত বা মুক্ত অবস্থা হইতে তাহার দূরত্বের পরিমাণ হয় না বলিলেই হয়। গৃহী হইলে, অর্থাৎ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলে, মানুষ আর আপনাতে তত মুগ্ধ, তত আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—গৃহে তাহার স্বার্থপরতা, মোহাচ্ছন্নতা ও সঙ্কীণতা অগত্যা কিছু কমিয়া যায়। অতএব গৃহে তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ মোহমুক্ত সুতরাং কিঞ্চিৎ ব্যাপ্ত, কিঞ্চিৎ বিস্তৃত, কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত। আবার গৃহে থাকিলেই সমাজের সহিত সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়, অর্থাৎ যাহারা আপনার নয় তাহাদের সংস্রবে আসিতে হয়। অতএব সমাজে পরার্থ-পরতা অনুশীলনের অবসর ও আবশ্যকতা বড় বেশী এবং পরার্থপরতার যত অনুশীলন হয় স্বার্থপরতামূলক মোহ ও

সঙ্কীর্ণতা তত কমিয়া যায় এবং আত্মব্যাপ্তি বিস্তৃতি বা সম্প্রসারণ তত বাড়িতে থাকে। এ সকল কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, গৃহে এবং সমাজে পরার্থপরতার যতই অনুশীলন হউক না কেন, পরার্থপরতা যখন অনুরাগসাপেক্ষ তখন অনুরাগশূন্য ব্রহ্মপ্রকৃতিতে লীন হইবার জন্য গৃহ ও সমাজের ভিতর দিয়া যাওবার আবশ্যকতা কি তাহা ত বুঝিতেই পারা যায় না। অনুরাগ কেমন করিয়া নিরনুরাগে পরিণত হইবে? "হাঁ" কেমন করিয়া "না" হইয়া যাইবে? ইহার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা দুই ই অনুরাগ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতা মোহমূলক ও মোহবর্দ্ধক অনুরাগ, পরার্থপরতা মোহনাশক অনুরাগ। যে মোহ মানুষকে জড়ত্বে জড়াইয়া রাখে, আপনাতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অপরকে দেখিতে দেয় না, ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দেয় না, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতে দেয় না ইত্যাদি, সে মোহ স্বার্থপরতার সর্ব্বস্ব, পরার্থপরতার বিষম শত্রু। অতএব স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা দুই-ই অনুরাগ হইলেও, স্বার্থপরতা যে প্রকার অনুরাগ পরার্থপরতা তাহা হইতে বড় ভিন্ন প্রকারের বা প্রকৃতির অনুরাগ। অর্থাৎ স্বার্থপরতা মোহময়, মোহকর, মোহবর্দ্ধক অনুরাগ; পরার্থপরতা মোহনাশক অনুরাগ। এবং পরার্থপরতা মোহনাশক অনুরাগ বলিয়াই ব্রহ্মের নির্গুণ নিরনুরাগ প্রকৃতিলাভের অনুকূল। কারণ মনুষ্যে এবং ব্রহ্মে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে মনুষ্য মোহ উপহিত বা মোহমুগ্ধ চৈতন্য

এবং ব্রহ্ম মোহমুক্ত চৈতন্য। এবং সেই জন্য যাহা মানুষকে মোহমুক্ত বা হ্রস্বমোহ করে তাহাই তাঁহার ব্রহ্মত্বলাভের অনুকূল এবং ব্রহ্মত্বলাভের জন্য আবশ্যক বা অপরিহার্য্য। মানবত্ব হইতে ব্রহ্মত্বে যাওয়া শুধু অনুরাগ হইতে নিরনুরাগে যাওয়া নয়, মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে মোহমুক্তাবস্থায় যাওয়াও বটে। পরার্থপরতার অনুশীলনে এই শেষোক্ত কার্য্যটা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। অতএব ছোট অনুরাগ বড় অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু নিরনুরাগে পরিণত হইতে পারে না, এই যে একটা কথা একথাটার বেশী সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যখন দেখা যাইতেছে যে স্বার্থপরতা বা ছোট অনুরাগ স্বদেশানুরাগ লোকানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে শাস্ত্রে বলে যে রজ ও তমোগুণ নষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণ বেশী প্রবল হইলে ব্রহ্মত্ব লাভ সহজ হয়। যোগ দ্বারা কি প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব লাভ হয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায় তাহা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন—

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধুয় নির্ব্বাণমুপৈত্য নিরিন্ধনং।

১১শ স্কন্ধ, ৯ অধ্যায়, ১৩।

অর্থাৎ উপশমাত্মক (অতিশয় শান্তিকর) সত্ত্বগুণ অতিমাত্র প্রবৃদ্ধ হইলে রজ ও তমের নাশ হওয়াতে মনের বিক্ষেপের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না সুতরাং মন স্বয়ং গুণ ও গুণকার্য্য

রহিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়।

ইহার অর্থ বা যুক্তি বুঝিতে হইলে একটি কথা প্রণিধান করিতে হইবে। সে কথাটি এই যে ব্রহ্মকে যে নির্গুণ বলা হয় তাহার অর্থ এই যে অবিমুক্ত মনুষ্যে যে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি গুণ আছে ব্রহ্ম তাহার অতীত। নহিলে তাঁহাতে যে কিছুই নাই তাহা নয়, কিছু না থাকিলে তিনিই বা থাকিবেন কেমন করিয়া? শাস্ত্রে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময় কহে। এ গুলিও ত একটা কিছু বটে। অতএব তিনি যে একেবারেই বা সকল হিসাবেই নির্গুণ অথবা কিছুই-নন তা নয়, তাহা হইলে তাঁহাকে "নির্গুণায় গুণাত্মনে" বলিয়া ডাকিবে কেন? তবে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায় তাহার কারণ এই যে তিনি অবিমুক্ত মনুষ্যের সত্ত্ব রজ ও তম গুণের অতীত। কিন্তু তিনি সত্ত্ব রজ ও তমের অতীত হইলেও মনুষ্যের মোহমলামলিনতামুক্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ-পরিশূন্য নিতান্ত শান্তিময় সাত্ত্বিক অবস্থা তাঁহার সেই চিরচিন্ময়তা চিরানন্দময়তার কিছু অনুরূপ কিছু নিকবর্ত্তী বটে। এবং সেই জন্যই পরমজ্ঞানী ভাগবৎকার বলিতেছেন—

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যা নিন্ধনং।

পরার্থপরতা প্রভৃতি বড় বড় অনুরাগ তম বা রজোগুণাত্মক নয়, সত্ত্বগুণাত্মক। অতএব যোগমার্গে যাইবার পূর্ব্বে গৃহ ও সমাজে থাকিয়া পরার্থপরতার অনুশীলন দ্বারা রজ ও তম নাশ বা খর্ব্ব করিয়া সত্ত্ব সংবর্দ্ধিত করা ব্রহ্মত্বের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে একটি অপরিহার্য্য কার্য্য। সগুণ ও নির্গুণের

প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইলে আমি ঐ দুইয়ের যে খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা ভাল না লাগিবারই কথা।

আপত্তি করা হইয়াছে—"সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিষটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোন যুক্তি-সূত্রে যুক্ত হইতে পারে?"

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান অসীম সাধনা-সাপেক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ মনে করিলেই উপলব্ধি করা যায় না। সে স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা বহু অনু-শীলনে লাভ করিতে হয়—সাকার পূজা এবং ভগবানের লীলা সন্দর্শন সেই অনুশীলনের অন্তর্গত, তদ্দ্বারা সেই স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইবার কোন ব্যাঘাত হয় না। যাহা তাঁহারই তাহা তাঁহাকে প্রতিরোধ করে না। যাহা তাঁহারই তাহা দেখিবার মতন দেখিতে পারিলে, বুঝিবার মতন বুঝিতে পারিলে, তাঁহা-রই কাছে লইয়া যায়। তুমি বলিবে যে, লয়তত্ত্ববাদীদের কাছে জগৎ যথার্থই অসৎ, মায়া, যথার্থই বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল বা লীলা নহে। কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন, সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বল দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে, এই মায়াটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন, এই অসৎটাকে, এই মায়াটাকে ছাড়া-ইয়া উঠিবার জন্য এত চেষ্টা এত সংযম এত সাধনা এত আরা-

ধনার আবশ্যকতা বুঝিয়া গিয়াছেন ও বুঝাইয়া গিয়াছেন? আর তাঁহারা যে সৌন্দর্য্য কদর্য্যের প্রভেদ করেন নাই, সে কেবল জ্ঞানীর পক্ষে করেন নাই—যে জ্ঞান লাভ করে নাই তাহার পক্ষে খুবই করিয়াছেন। কিন্তু যিনি বহু সাধনার পর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি সৌন্দর্য্য কদর্য্যের প্রভেদ ভুলিয়া যে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য্য দেখেন তাহার কণাপরিমিত আভাষও আর কেহ কোথাও পায় না। আর ব্রহ্মের যাহা 'বিকাশ' তাহ যদি ব্রহ্মের লীলা না হয়, তবে লীলা কাহাকে বলে বলিতে পারি না।

অতএব গৃহ সমাজ প্রভৃতি সকলই যখন রহিল তখন লয়তত্ত্ব মানিলাম বলিয়া পৃথিবীটা মরুভূমিই হইল কেন? পৃথীবিটা বিলাস ও স্বেচ্ছাচার ক্ষেত্র না হইলেই কি মরুভূমি হইয়া যায়? আর যদিই তাই হয় তাহা হইলেও ত ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য অনন্তকালের অনুরোধে মরুভূমিটাকেই নন্দনকানন করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম্মের কাছে ত সখ্ সাধের আবদার চলে না।

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষ্কামধর্ম্মের বড়ই গৌরব। নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যতীত মুক্তি নাই। ভগবান স্বয়ং নিষ্কাম। অতএব ভগবানে লীন হইতে হইলে মানুষকেও নিষ্কাম হইতে হইবে। যেখানে লয়বাদ সেখানে নিষ্কামধর্ম্মবাদ থাকিবেই থাকিবে।

কিন্তু নিষ্কাম হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করা কি সম্ভব? হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলেন, সম্ভব। নহিলে তাঁহারা নিষ্কামধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবেনই বা কেন? কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে নিষ্কামধর্ম্ম অসম্ভব মনে করেন। এবং সেই জন্য নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শুনিলে, হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন।

নিষ্কামধর্ম্ম কি যথার্থই অসম্ভব? অসম্ভব নয়, সম্ভব, কিন্তু বড় কঠিন। নিষ্কামধর্ম্মের নামান্তর নিষ্কাম কর্ম্ম। অর্থাৎ যে কর্ম্ম ধর্ম্মসঙ্গত বা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত, সেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া সম্পন্ন করাকে নিষ্কামধর্ম্ম বলে। নিষ্কাম হইয়া, অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া, অর্থাৎ সুখ সম্পদ স্বর্গ প্রভৃতি ফলের কামনাশূন্য হইয়া। সুখ সম্পদ স্বর্গ প্রভৃতি কাহার? না, যে কর্ম্ম করে তাহার।

এখন বুঝিতে হইতেছে, নিষ্কাম কর্ম্ম কি অসম্ভব? অর্থাৎ সুখ সৌভাগ্য সন্তান সন্ততি স্বর্গ যশ প্রভৃতি কোন ফলের কামনা না করিয়া মানুষ কি কোন কর্ম্ম করে বা করিতে পারে? পারে, কিন্তু সহজে পারে না। অনেক স্থলে আমা-

দের ভ্রম হয় যে, আমরা কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা মাছ ধরিয়া বেড়াও, মাছ খাইবার কামনায় বেড়াও না। তুমি নানা বাধা বিঘ্ন সত্বেও মাছ ধরিতে ছাড় না, মাছ ধরিবার জন্য ঝড় বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য কর না। আবার এত কষ্ট করিয়া যে মাছ ধর তাহা পাঁচজনকে বিলাইয়া দেও। অতএব তুমি মনে কর যে তুমি বিশেষ কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মাছ ধর না, মনের কেমন একটা ঝোঁকের উপর মাছ ধর। অতএব তোমার মাছ ধরা নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে তুমি পাঁচ বার মাছ ধরিয়া সুখানুভব করিয়াছ বলিয়া আবার মাছ ধরিতে উৎসুক হও। অর্থাৎ মাছ ধরিবার যে সুখ আবার সেই সুখের অনুধাবন বা অন্বেষণ কর। অতএব যে ঝোঁকের উপর মাছ ধরে, সে মাছ খাইবার ইচ্ছায় মাছ না ধরিলেও কামনাধীন হইয়া মাছ ধরে। তেমনি এমন লোক আছে—সংখ্যায় খুব কম হইলেও এমন লোক আছে—যাহারা দিবারাত্রি ধনোপার্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধন সঞ্চয় তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহাদের উপার্জ্জিত ধন কি হয়, কে লয়, তাহারা একবার ফিরিয়াও দেখে না। তাহাদের উপার্জ্জিত ধনে তাহারা গাড়ি ঘোড়াও চড়ে না, বাগান বাড়ীও কেনে না, শাল জামিয়ারও গায়ে দেয় না। অথচ তাহারা দিবারাত্রি ধনোপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। তুমি হয় ত মনে কর তাহাদের ধনোপার্জ্জন নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টায় একটা তীব্র সুখ, একটা নেশা, একটা মত্ততা আছে, তাহা-

রই জন্য তাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। তাহারাও মোহাচ্ছন্ন। সেই মোহে তাহারা অনেক কর্ত্তব্য অবহেলা করে। তেমনি যে সকল বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া, গৌরব সুখ্যাতির কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া, দিবারাত্রি পুস্তক পাঠে নিমজ্জিত থাকে, তাহাদের পুস্তকপাঠ নিষ্কাম বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহাও একটা তীব্রসুখের লালসা, একটা নেশা, একটা মত্ততা। সেই সুখের জন্য, সেই নেশার ঝোঁকে, সেই মত্ততায় পড়িয়া তাহারা অনেক কর্ত্তব্য অবহেলা করে। অনেকে এই শ্রেণীর কার্য্যে কেবল মনের এক একটা ঝোঁক দেখিতে পায় এবং কামনা খুঁজিয়া না পাইয়া এই শ্রেণীর কার্য্যের বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকে। যে পুস্তকপ্রিয় ব্যক্তি আহার নিদ্রা ভুলিয়া সমস্ত রাত্রিটা পড়িয়া কাটাইয়া দেয় অনেকের মতে সে বড় উচ্চ দরের লোক, তাহার ন্যায় কামনাশূন্য ব্যক্তি বুঝি জগতে আর নাই। কিন্তু এরূপ বুঝা বড় ভুল। এরূপ পাঠক বড় আত্মতৃপ্তি প্রয়াসী। এই জন্য এই শ্রেণীর কার্য্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। কেহ যেন ভুলিয়া এই রকম নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হন।

ধর্ম্মকর্ম্মেও কতকটা এইরূপ। স্বাভাবিক দয়াধিক্য বশতঃ নিরন্নের নিদারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিতান্তঃকরণে যদি তুমি তাহাকে অন্নদান কর, তবে তোমার দান নিশ্চয়ই নিষ্কাম। কারণ দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলি যখন প্রবল হয় তখন জ্ঞান বা বুদ্ধি এক রকম বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব তখন কামনা করিবার অবসর ও ক্ষমতা থাকেনা। এমন দয়ার উত্তেজনায় অনেকে দান করে। যাহারা রাজা বাহাদুর বা রায় বাহাদুর

হইবার জন্য দশ হাজার বিশ হাজার লক্ষ দেড় লক্ষ দান করে, তাহাদের দান এ রকম দান নয়। যাহারা স্বর্গলাভের বা পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় দান করে তাহাদের দানও এ রকম দান নয়। কিন্তু এমন দয়ার উত্তেজনায় দান মানুষের মধ্যে বিরল নহে। এ রকম দান অনেকে করে। অন্ততঃ যত কম লোকে করে বলিয়া সচরাচর মনে করা যায় তত কম লোকে নয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি লোকে করে। বিধাতার কৃপায় অনেকের মনে দয়া প্রভৃতি সদ্ভাব আছে। আর দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব প্রগাঢ় ও বেগবতী হইলে সেই ভাবের জোরে মানুষ পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম করে, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করে না। কারণ হৃদয়ের ভাব যখন বেশী প্রবল হয় তখন কামনা ত দূরের কথা, আত্মকর্ত্তৃত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত কোন কোন স্থলে থাকে না। অতএব নিষ্কামধর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্ম সত্য সত্যই অসম্ভব নয়, সত্য সত্যই আকাশ কুসুম নয়। এবং এ প্রকার নিষ্কাম ধর্ম্ম লোক মধ্যে প্রসারিতও করা যায়। কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় তাহার স্নেহ দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তি-গুলিকেও শিক্ষা দ্বারা ফোটান যায় এবং প্রগাঢ় ও বেগবতী করা যায়। শিক্ষার গুণেই নিষ্ঠুর নরমাংসভোজী মনুষ্য-সমাজ বুদ্ধ, চৈতন্য, হাউয়ার্ড, সেণ্ট জেবিয়র প্রমুখ মানব-সমাজে পরিণত হইয়াছে। অতএব শিক্ষা দ্বারা হৃদয়কেও ফুটান যায়। সুতরাং শিক্ষা দ্বারা মানুষকে নিষ্কাম কর্ম্মের উপযোগীও করা যায়। সে শিক্ষা বিষয়ে পরাঙ্মুখ বা যত্ন-হীন থাকিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মকে অসম্ভব বলিয়া উপহাস করা এবং লোককে প্রকারান্তরে তাহা হইতে বিরত

করা জ্ঞানী ধার্ম্মিক এবং সহৃদয় ব্যক্তির কার্য্য নয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকে এখন তাহাই করিতেছেন। আরো দুঃখের বিষয় যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের উপর রাগ করিয়া করিতেছেন।

কিন্তু দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব হইতে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় তাহা নিষ্কাম হইলেও সেই ভাব গুলিকে নিষ্কাম ধর্ম্মের ভিত্তি করা নিরাপদও নয় যুক্তিসঙ্গতও নয়। প্রথম শ্রেণীর কার্য্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে যে রকম ঝোঁকে পড়িয়া মানুষ সেই সকল কার্য্য করে সে রকম ঝোঁকে পড়িলে অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ঘটিয়া পড়ে। তেমনি হৃদয়ের উত্তেজনায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হয় বটে কিন্তু কখন কখন অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ঘটিয়া পড়ে। অনেক দয়ালু দানশীল ব্যক্তি দরিদ্রকে দান করিয়া করিয়া শেষে আপনারই ঘোর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হন এবং তখন ঋণ করিয়াও দান করিতে থাকেন। এরূপ করিয়া তাঁহারা আপনাদের প্রতি, পরিবারবর্গের প্রতি, এবং ঋণপরিশোধের উপায় না থাকিলে ঋণদাতাদিগের প্রতিও ঘোর অধর্ম্ম করিয়া থাকেন। হৃদয়ের অন্যান্য ভাবের ক্রিয়া ও কখন কখন এই প্রণালীতে হইয়া থাকে। অতএব হৃদয়রূপ অমূল্য বস্তুর অশেষ যত্নের ব্যবস্থা করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্য ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার প্রধান উপদেশ এই যে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর অর্থাৎ কর্ম্ম কর কিন্তু তাহার ফল ভগবানকে অর্পণ কর। এ কথার অর্থ বড় গভীর ও সুন্দর। উপরে বলা হইয়াছে যে হৃদয়ের সদ্ভাব গুলির উত্তেজনায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম

নিষ্কাম হয়। অর্থাৎ সে কর্ম্মের সহিত আত্মমঙ্গলকামনা এমন কি অনেক সময় আত্মকর্তৃত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইতে পারে না। বাইবেলে যে বলে, দক্ষিণ হস্তে যাহা কর, বাম হস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে, সে এই রকম কর্ম্ম সম্বন্ধে। হৃদয়ের ভাবের উত্তেজনায় সৎকর্ম্ম করিলে, সৎকর্ম্ম করিলাম বলিয়া একটা অভিমান জন্মে না। তাই সে কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। কেন না সে কর্ম্ম কেবল মাত্র সদ্ভাব হইতে উৎপন্ন, কামনামূলক নয়। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের সদ্ভাবের সংখ্যাও অনেক এবং পৃথিবীতে সদ্ভাবের পাত্রও অনেক। যেখানে সদ্ভাবের সংখ্যা অনেক সেখানে সমস্ত সদ্ভাবগুলির পরিচালনা নাও হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই একটি মাত্রের পরিচালনা করিয়া মানুষ ক্ষান্ত থাকিতেও পারে। ফলতঃ মনুষ্য মধ্যে সচরাচর সেই রূপই হইয়া থাকে। কেহ খুব স্নেহবান কিন্তু পরদুঃখকাতর নয়; কেহ দয়ালু কিন্তু ক্ষমাশীল নয়। আবার সদ্ভাবের পাত্র অনেক হইলে মানুষ সে সকল গুলির প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন নাও হইতে পারে এবং অনেকে কার্য্যতঃ হয়ও না। এই দ্বিবিধ অসম্পূর্ণতা দূরীকরণার্থ এক দিকে হৃদয়ের সদ্ভাবগুলির সমঞ্জসীকরণ যেমন আবশ্যক, অপর দিকে সদ্ভাবের পাত্রের সমষ্টীকরণ তেমনি আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরভক্তি এবং প্রেমে সেই সমস্ত সদ্ভাবের সমঞ্জসীকরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরে সেই সমস্ত সদ্ভাবের পাত্রের সমষ্টীকরণ বা সমাবেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই অত বিভিন্ন ভাবও মিলায় না এবং অত অধিক এবং বিভিন্ন পাত্রও সমান ও আয়ত্ত হইয়া থাকে না। এই

অপূর্ব্ব সমষ্টীকরণ করিয়া শাস্ত্রকারেরা কহিলেন, কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মের ফল ভগবানকে অর্পণ কর। অর্থাৎ ফল কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর। ফল কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিব, এ কেমন কথা? এ কথার অর্থ এই যে ভগবানে সকল ভূতই বর্ত্তমান। ভগবানকে পাইলে সকল ভূতই পাইবে। ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি হইলে সর্ব্বভূতেও প্রেম ও ভক্তি হইবে। অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তি বিশ্বব্যাপী হইবে। প্রেম ও ভক্তি বিশ্বব্যাপী না হইলে, ধর্ম্মও বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বজনীন হয় না। অতএব সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মচর্য্যা করিতে হইলে ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। ভাল, ভগবানের জন্য যেন কর্ম্ম করিলাম, ফল কামনা করিব না কেন? তাহার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে দুই একটি বলিব। ভগবানের প্রতি যাহার পূর্ণ ও প্রগাঢ় প্রেম, তাহার ফল কামনা অসম্ভব। যেখানে প্রেম পূর্ণ প্রকৃত ও প্রগাঢ় সেখানে প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র একত্রে মিশ্রিত, দুইয়ের পৃথক সত্ত্বা নাই। অতএব সেখানে প্রেমিক প্রেমের পাত্রের কাছে প্রেমের পাত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। যেখানে প্রেম প্রকৃত এবং প্রগাঢ় সেখানে প্রেমিকের কার্য্যমাত্রেরই উদ্দেশ্য—প্রেমের পাত্রের পরিতোষ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়, আর কিছু হইতে পারেও না। অনন্ত পুরুষকে ছাড়িয়া পরিমিত মানবপ্রেমের কথা মনে কর, বুঝিবার সুবিধা হইবে। তুমি তোমার পত্নীকে ভালবাস। তোমার পত্নীর সহিত তোমার ভালবাসা প্রকৃত ও প্রগাঢ়। তুমি তোমার পত্নীর উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম কর, তাহা কি কেবল সেই ভাল-

বাঁশির জোরে, সেই ভালবাসার ঘোরে কর না? কেবল তোমার পত্নীর পরিতোষের জন্য কর না? সেই সকল কর্ম্ম করিলে তোমার পত্নী তোমাকে আরো ভালবাসিবেন, এই রূপ কোন ফল কামনা করিয়া কর কি? আত্মহারা না হইলে মানুষ প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক হইয়াছে, সে স্বয়ং মরিয়াছে। যে মরিয়াছে তাহার আবার ফল কামনা কি? তাহার নিজের কিছুই তাহাতে নাই, সে যাহাকে ভালবাসে, সেই তাহার সমস্তটা অধিকার করিয়াছে, সে তাহাতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহার আর আছে কি যে তজ্জন্য সে কামনা করিবে? তাহার থাকিবার মধ্যে আছে—সেই প্রেমের পাত্রী, সেই পত্নী। সেই পত্নীর প্রসন্নতাই তাহার পর্য্যাপ্তি। সে সেই পত্নীপ্রেমে ভোর হইয়া, সম্পূর্ণ রূপে আত্মহারা হইয়া সেই পত্নীর প্রীতিকর কর্ম্ম করে। তাহার আবার ফল কামনা কি? ফল কামনা করিয়া সে যদি পত্নীর প্রীতিকর কর্ম্ম করে তবে নিশ্চয় জানিও তাহাতে পত্নীপ্রেম নাই। ভগবানের প্রতি প্রেম হইলে, মানুষ সেই রূপই করিয়া থাকে। মানুষ আত্মহারা হইয়া ভগবানে মজিয়া যায়। ভগবানে মজিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মই করে। ভগবানকে ভালবাসে বলিয়া কেবলই ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম করে। আপনার ফল কামনা করিবে কেমন করিয়া? আপনি কি আছে যে আপনার ফল কামনা করিবে? তাহার সবটাই ভগবান, সে কেবল ভগবানেরই প্রীতি সাধন করিতে পারে, আর কিছুই পারে না। তাই বলি, ভগবানকে ভালবাসিলে কর্ম্ম নিষ্কাম বই সকাম হইতে পারে না। তাই মনে করি,

যাঁহারা বলেন যে আপনার মঙ্গলকামনায় ভগবানের প্রিয় কার্য্য করা যায়, তাঁহারা বড় ভুল করেন। প্রেম এমন জিনিষ নয় যে প্রেমিককে একেবারে মারিয়া তাহার রক্ত মাংস মন প্রাণ আত্মা যথাসর্ব্বস্ব সেই প্রেমের পাত্রে না মিশাইয়া ছাড়িবে। হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মের কথার ন্যায় এমন গভীর অথচ এমন পরিষ্কার কথা কি আর আছে?

কিন্তু ভগবানের প্রতি যেরূপ প্রেমের কথা বলিলাম তাহার নাম প্রেমের তন্ময়ত্ব। প্রেমের তন্ময়ত্ব সহজে হয় না। কিন্তু তন্ময়ত্ব না হইলেও ধর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে। ভগবানে ভক্তি হইলে এবং ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন এবং সমস্ত ভূত ভগবানে আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, আপনার প্রতি বল অপরের প্রতি বল সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বলিয়া সম্পন্ন করা অতিশয় সহজ হইয়া পড়ে। পিতামাতার আদিষ্ট বা অভিপ্রেত কর্ম্ম যেমন কেবল পিতামাতার আদিষ্ট বা অভিপ্রেত বলিয়া করা যায় ও করিতে প্রবৃত্তি হয়, কোন ফল কামনার অপেক্ষা করে না, ভগবানে ভক্তি হইলে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মও তেমনি ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বলিয়া করা যায় ও করিতে প্রবৃত্তি হয়, কোন ফল কামনার অপেক্ষা করে না। ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তি হইলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বলিয়াই করিতে ইচ্ছা হয়, সে ইচ্ছার সহিত কোন কামনা মিশাইতে ইচ্ছা হয় না। ভগবদ্ভক্তির ধর্ম্মই এই যে উহা মানুষকে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ভগবানের নিমিত্তই করাইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিলে নিষ্কাম ধর্ম্ম বড় সহজ হইয়া পড়ে, এমন কি নিষ্কাম ধর্ম্মই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠে

এবং সকাম ধর্ম্ম আপনাআপনিই অন্তর্হিত হয়। আর ভগবানের নামে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে ধর্ম্মচর্য্যায় অন্যায় অবিচারও ঘটিতে পারে না। ভগবান সকল ভূতেই আছেন, সকল্ ভূত ভগবানে আছে এবং ভগবানের কাছে সকল ভূতই সমান এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ধর্ম্মচর্য্যায় কি আপনার প্রতি কি অপরের প্রতি কাহারো প্রতি অন্যায় বা অবিচার করা যাইতে পারে না, অন্যায় বা অবিচার একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব ভগবানই নিষ্কাম ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ভিত্তি এবং ভগবানের নামে ধর্ম্মচর্য্যা করিলেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

আমাদের শাস্ত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের এত উপদেশ থাকিলেও কাম্য কর্ম্ম বা সকাম ধর্ম্মের ব্যবস্থাও আছে। নানা কামনা করিয়া নানা দেবদেবীর পূজা ও নানা ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রে আছে। ইহার অর্থ এই যে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইলেও, মনুষ্যসমাজে সকাম ধর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে। গৃহ ও সমাজ মানুষের কত আবশ্যক লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছি। কিন্তু গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রভৃতি অনেক জিনিষ আবশ্যক। সে সকল জিনিষের প্রতি বীতস্পৃহ বা অযত্নবান্ হইলে যথার্থই অধর্ম্ম হয়। এ কথাও লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছি। অতএব কাম্যকর্ম্ম বা সকামধর্ম্মও ধর্ম্ম। আবার নিষ্কাম ধর্ম্ম সকল লোকের সকল অবস্থায় সাধ্যায়ত্ত নয়। নিষ্কাম ধর্ম্ম যে জ্ঞান ও অনুশীলন সাপেক্ষ সে জ্ঞানও সকলের সকল অবস্থায় থাকে না সে অনুশীলনও

সকলের আয়ত্ত নয়। অতএব সংসারে সকামধর্ম্মেরও প্রভূত আবশ্যকতা আছে। এবং সেই জন্যও আমাদের শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে সকাম ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অতএব সকাম ধর্ম্মের নিন্দা করা উচিত নয়। কিন্তু সকাম ধর্ম্ম আবশ্যক ও অনিন্দনীয় হইলেও সকাম ধর্ম্ম হইতে নিষ্কাম ধর্ম্মে উন্নত হইবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে এখন সে চেষ্টার নিতান্ত অভাব। সেই অভাবমোচন আমাদের বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-সংস্কারের একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

নিষ্কাম ধর্ম্মের তুলনায় কাম্যকর্ম্ম বা সকামধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও সকামধর্ম্মও ধর্ম্ম, আবশ্যকীয় ধর্ম্ম, অনিন্দনীয় ধর্ম্ম। কিন্তু সকাম ধর্ম্মের যতই অনুষ্ঠান বা অনুশীলন করা হউক তদ্দ্বারা কাম্যবস্তুই লাভ হইবে, ভগবান লাভ হইবে না। যে বস্তুর জন্য আরাধনা আরাধনা দ্বারা তাহাই পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বেশী কিম্বা তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব কেবল সকাম ধর্ম্মে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ মানুষের সম্বন্ধ কেবল সংসারের সহিত নয়, ভগবানের সহিতও বটে। কিন্তু ভগবানকে লাভ করিতে হইলে মানুষকে নিষ্কাম হইতে হয়, কারণ ভগবান নিষ্কাম। অতএব নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যতীত হিন্দুর চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়। নিষ্কাম ধর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের লয়বাদের অপরিহার্য্য ও ন্যায়ানুগত সিদ্ধান্ত। অন্য ধর্ম্মেও নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা আছে। কিন্তু অন্য ধর্ম্মে নিষ্কাম ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা নাই এবং পরিসর ও বড় কম—নিষ্কাম হইতে পার ভলাই, না হইলে বিশেষ দোষ নাই।

অতএব নিষ্কামধর্ম্মবাদিতা হিন্দুত্বের একটী লক্ষণ এবং নিষ্কামধর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের একটী লক্ষণ। লক্ষণ বড় উৎকৃষ্ট—বড় অসাধারণ—অলৌকিক বলিলেও বলা যায়। যে হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের এই লক্ষণ সে হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মও বড় উৎকৃষ্ট, বড় অসাধারণ, বড় অলৌকিক। এবং হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম যে হিন্দুর সে হিন্দুও মনুষ্য মধ্যে বড় উৎকৃষ্ট, বড় অসাধারণ, বড় অলৌকিক।

ধ্রুব।

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা]

লয়ের নিমিত্ত কি বিষম সাধনা আবশ্যক তাহা বুঝা গিয়াছে। বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়া সে সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে সে সাধনা অসম্ভব। সেই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে ধ্রুব শব্দ দেখিতে পাই—ধ্রুব-কথা শুনিতে পাই। আর কোথাও সে কথা শুনিতে পাই না। সে কথা হিন্দুর পুরাণেরই কথা, আর কাহারো পুরাণের কথা নয়। সে কথা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ।

হিন্দু আজ উৎসন্নপ্রায়। আজিকার দিনে ধ্রুব-কথা কহা ভাল—ধ্রুব-কথা কহা আবশ্যক।

উত্তানপাদ রাজার সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন। রাজা সুরুচিকে যত ভাল বাসিতেন, সুনীতিকে তত বাসিতেন না। সুরুচির গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, তাহার নাম উত্তম, এবং সুনীতির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় ধ্রুব তথায় আসিল এবং ভাইকে পিতার কোলে বসিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আপনিও পিতার কোলে উঠিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরুচি ঠাকুরাণী তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতএব সুরু-চির ভয়ে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন—'যে কোলে তুমি উঠিতে

'চাহিতেছ, সে কোলে উঠিবার যোগ্য তুমি নহ। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, সেই সে কোলে উঠিবার যোগ্য। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ঐ কোলে উঠিতে পারিতে। ঐ রাজসিংহাসন সম্রাটের স্থান। আমার পুত্র উত্তমই ঐ স্থানের অধিকারী এবং উপযুক্ত। সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ সাহসে তুমি ঐ উচ্চস্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ?' বিমাতার তিরস্কার বালক ধ্রুবের বুকে লাগিল। বালক ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার কাছে গেল এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিল। দুঃখিনী সুনীতির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া তিনি সকল দুরাশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব তিনি বালক ধ্রুবকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বলিলেন যে লোকে পুণ্যফলে রাজসিংহাসন, রাজছত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করে। তোমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ছিল না বলিয়া এ জন্মে তোমার ভাগ্যে রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য হইল না। অতএব তোমার যে অবস্থা তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

পুণ্যোপচয় সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মমপুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্॥
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥

মানুষের এ জন্মের অবস্থা তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল। অতএব আপনার কর্ম্মফলে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইহা অদৃষ্টবাদীর কথা। সুনীতি হিন্দু-

রমণী। হিন্দুরমণী অদৃষ্টবাদিনী। তাই সুনীতি এই কথা বলিলেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট মানে তাহার কি অবস্থান্তরের আশা নাই? আছে বৈকি। সুনীতি বলিলেনঃ—

যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণি-হিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥

অথবা যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এরূপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও। এবং সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান্ হইয়া থাকে।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

কর্ম্মদোষে বা পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে সে দুরবস্থা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই তাহা নয়। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়। একবার পাপ করিলে তজ্জন্য যে অধোগতি হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অদৃষ্টবাদের এমন অর্থ নয় যে যাহার ভাগ্যে যাহা একবার ঘটে তাহার ভাগ্যে তাহা চিরকালই থাকিয়া যায়, সে তাহা কখনই ছাড়াইতে পারে না। তাই অদৃষ্টবাদিনী সুরুচি পুত্র ধ্রুবকে বলিলেন—পুণ্যসঞ্চয় কর, একদিন না একদিন অবশ্যই মনোমত পদ ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক প্রকার

কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার কর্ম্মের দ্বারা অতিক্রম করা যায়। তবেই বুঝিতে হইতেছে যে কোন একটি কর্ম্মফল হইতে একেবারেই যে নিষ্কৃতি নাই তাহা নয়। ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিলে মানুষ আবার সেই ভিন্ন কর্ম্মের ফলভোগী হয় এবং এই প্রকারে পূর্ব্ব কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহার অর্থ এই যে কোন একটী কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় সেই কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করণার্থ ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিবার যে চেষ্টা বা উদ্যম আবশ্যক তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নয়। অর্থাৎ কর্ম্মফল অথবা যাহাকে চলিত কথায় অদৃষ্ট বলে তাহা অত্যাজ্য অনন্তকালস্থায়ী বজ্রনিগড় নয়। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যে অদৃষ্টবাদকে ভীষণ Eastern fatalism বলিয়া থাকেন সে অদৃষ্টবাদ হিন্দুশাস্ত্রে নাই।

সুনীতির কথা ধ্রুবের মনে ধরিল না। সুনীতির কথামত চলিতে গেলে ধ্রুবকে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া তবে ইহজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। ধ্রুব তাহা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা করিলে তাঁহার ত আবার কর্ম্মেরই ফলভোগ করা হইল, কর্ম্মের গুণেই উৎকৃষ্ট পদ লাভ করা হইল, তাঁহার নিজের কি করা হইল, তাঁহার নিজের গুণে কি পাওয়া হইল? ধ্রুব পুরুষকারের পূর্ণ অবতার। তিনি মাতাকে স্পষ্টই বলিলেনঃ—

> অম্ব! যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
> নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥
> সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
> স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্॥

সুরুচের্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মেঽম্ব! ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে।
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্ত্বয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ॥
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহংস্থানং যন্ ন প্রাপ পিতা মম॥
(বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ, ১১অ—২৪-২৮।)

জননি! তুমি আমাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না, কারণ বিমাতার দুর্ব্বাক্যে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। রাজা, আমার বিমাতা সুরুচিকে ভাল বাসেন, আমি তাঁহার উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু জননি! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ। আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে, এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই, স্বীয় পুণ্য দ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

কি অভিমান! কি তেজ! কি আকাঙ্ক্ষা! কি সাহস! কি বিক্রম! রাজ্য চাই না, রাজ্য ত তুচ্ছ জিনিষ। সম্রাট হইতে চাই না, সম্রাট হওয়া ত তুচ্ছ কথা। চাই অনন্ত বিশ্বের পূজ্য হইতে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে,

যে স্থান পিতা পিতামহ কেহ কখনও পান নাই, চাই সেই স্থান পাইতে! আর সে স্থান কাহারো কাছে ভিক্ষা চাই না, স্নেহের বা অনুগ্রহের দান স্বরূপ চাই না, আপনার তেজে, আপনার ক্ষমতায়, আপনার প্রভাবে আপনি করিয়া লইতে চাই। ইহাকেই বলে পূর্ণ পুরুষত্ব, ইহাকেই বলে পুরুষকারের পূর্ণমাত্রা? এই অপূর্ব্ব পুরুষকার লইয়া ধ্রুব আর একটি মাত্র কথা না কহিয়া বনে গমন করিলেন। বনে কয়েকটি ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করা যায়। তাঁহারা তাঁহাকে যোগপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। যোগপ্রণালী শিখিয়া তিনি আর একটি বনে গমন করিয়া এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন ক্ষুদ্র বালকের পদ-ভরে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া উঠিল, নদ নদী সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল, পৃথিবী যায় যায় হইল। দেবতারা ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মায়া প্রভাবে যোগমগ্ন বালক দেখিলেন যে তাঁহার দুঃখিনী মাতা অতি কাতরভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া অতিশয় করুণস্বরে তাঁহাকে সেই উৎকট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ধ্রুব দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন দেবতারা তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পিশাচরূপ ধারণ করিয়া তাঁহারা

দলে দলে ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শৃগাল আসিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। শব্দ করিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত বিভীষিকাই নিষ্ফল হইল। যোগমগ্ন বালক যোগেই মগ্ন রহিলেন। তখন ভগবান হরি সেই বালকের তন্ময়তা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই ধ্রুবলোক দেখিয়া—সেই ধ্রুবলোক ধরিয়া—ভবসাগরে পাড়ি দিতেন, কিন্তু আমরা দিই না! তাই আজ আমরা এত হেয়।

ধ্রুবের অসাধারণ পুরুষকার আমাদের নাই—তাই আমরা মনুষ্য মধ্যে এত হীন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি বলিবে, যে অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল মানে সে পুরুষকারের কথা কয় কেমন করিয়া? উত্তর—কর্ম্মফলের অর্থ এই যে মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কারণ স্বভাবচরিত্র মন্দ না হইলে লোকে মন্দ কর্ম্ম করে না। এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ স্বভাবচরিত্র আরো মন্দ হইয়া যায়। স্বভাবচরিত্র মন্দ হইলে মানুষ ভাল অবস্থায় থাকিবার যোগ্য হয় না, মন্দ অবস্থায় থাকিবারই যোগ্য হয়। মন্দের সহিত মন্দেরই মিল হয়, ভালর মিল হয় না। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপন স্বভাব চরিত্র মন্দ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মন্দ কর্ম্মের দিকেই স্বভাবতঃ ঝোঁক হয় এবং সেই জন্য তাহাকে জোর করিয়া সুখ সচ্ছন্দের অনুকূল অবস্থায় রাখিলেও সে শীঘ্র সে অবস্থাকে সুখ সচ্ছন্দের প্রতিকূল করিয়া তুলে। এই জন্যই

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। এবং এই জন্যই মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের মুখে শুনিতে পাই যে মাংস বিক্রয়রূপ নৃশংস কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে সে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে পারে নাই*। বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারকে পরাজয় বা বিনষ্ট করা বড়ই কঠিন। অতএব বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারের সহিত যে অবস্থার মিল থাকে, সেই অবস্থা ভোগ করাই সৃষ্টির নিয়মসঙ্গত। অতএব কর্ম্মফলবাদ ও নিয়মবাদ একই কথা। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আবার পুরুষকারের কথা কেন? পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করিবার কথা কেন? কথা এই জন্য যে, নিয়ম অব্যর্থ হইলেও নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায় এবং নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও একটি নিয়ম। অগ্নি বস্ত্র দগ্ধ করে, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যে বস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি আর সে বস্ত্র দগ্ধ করিতে পারে না, কেননা অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি থাকে না, অতএব অগ্নির কার্য্যও থাকে না। ইহাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায়। এবং সেই জন্য নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ কর্ম্মদোষে মন্দ অবস্থা ভোগ করা যেমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম, তেমনি মন্দ অবস্থায় থাকিয়া চেষ্টা ও যত্ন করিয়া স্বভাবচরিত্র সংশোধন করত মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই

*মহাভারত, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ২০৭ অধ্যায়।

চেষ্টা ও যত্নের নাম পুরুষকার। অতএব পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা যাইতে পারে এবং পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা যে মন্দ স্বভাব বিনষ্ট করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে পারা যায় এবং ভাল স্বভাব লাভের ফলস্বরূপ মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে যে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা যুক্তি দ্বারা সহজেই সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অনেক লোককে আপন আপন চেষ্টা দ্বারা মন্দ স্বভাব ত্যাগ করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে এবং মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়—ইহাই এ কথার যথেষ্ট এবং উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মানুষের ভাল মন্দ দুই রকম হইবারই প্রবৃত্তি আছে। সেই দুই প্রবৃত্তিই মানব প্রকৃতির অন্তর্গত। মানুষ ভাল হইলেও যেমন তাহার মন্দ প্রবৃত্তি উৎসাহিত করিয়া মন্দ হইবার ক্ষমতা আছে তেমনি মন্দ হইলেও ভাল হওয়ার উপকারিতা কোন রকমে বুঝিতে পারিয়া ভাল প্রবৃত্তি উৎসাহিত করিয়া ভাল হইবার ক্ষমতাও আছে। মানুষের এই ক্ষমতাকেই আমরা পুরুষকার এবং ইংরাজেরা free will (স্বাধীন ইচ্ছা) বা will power (ইচ্ছা শক্তি) বলেন। উপদেশ উত্তেজনা লাভালাভজ্ঞান প্রভৃতি নানা কারণে মানুষ এই ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকে। এবং সেই সকল কারণ ব্যতীত এই ক্ষমতার পরিচালন হয় না। কিন্তু কারণ ব্যতীত এ ক্ষমতার পরিচালন হয় না বলিয়া এ ক্ষমতা যে মানুষের স্বভাবচরিত্র ও অবস্থা নিয়মিত

করিবার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে কার্য্যকরী নয়, তাহা নয়। কারণ-সাপেক্ষ হইলেও মানুষের পুরুষকার মানুষের একটি ব্রহ্ম অস্ত্র। এবং ব্রহ্ম অস্ত্র বলিয়া পুরুষকার এত মহামূল্য সামগ্রী। কারণ ব্যতীত সে ব্রহ্ম অস্ত্র চলে না বলিয়া কি তাহার কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? মাংসপেশীর সাহায্যে হস্তস্থিত অসি চালনা করিতে হয় বলিয়া অসির কি কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? তাই তার্কিকদিগকে বলি যে মানুষের will বা পুরুষকার free বা স্বাধীন হউক আর নাই হউক, উহা মানুষের মহাকার্য্যকরী মহামূল্য অস্ত্র। তাহা হইলেই হইল, মানুষের আর কিছু চাই না। অতএব মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা সে কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারে একথায় কিছুমাত্র অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা নাই। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে কেমন করিয়া বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের অদৃষ্ট-বাদানুসারে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অবস্থার অধীন এবং মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিণত করিতে একেবারেই অক্ষম? হিন্দুশাস্ত্রকারের মুক্তিবাদ বুঝিয়া দেখিলেও স্বীকার করিতে হয় যে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে oriental fate বা প্রতীচ্য অদৃষ্ট বা অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধিলিপি বলিয়া থাকেন হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রকারের মুক্তি-বাদের অর্থ এই যে, সকল মনুষ্যকেই নিকৃষ্ট বা অধম মায়াময় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বা সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর-প্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে। মানুষ যদি অধম অবস্থার একান্ত অধীন হইত অর্থাৎ মানুষের

যদি অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ করিবার শক্তি বা পুরুষকার না থাকিত, তাহা হইলে ত হিন্দু শাস্ত্রকার তাহার জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না এবং হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তিবাদ থাকিত না। হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে—এক জন্মে না হয় দশ জন্মে, এক যুগে না হয় দশ যুগে, দশ যুগে না হয় দশ কল্পে—পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিকৃষ্ট অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতেই হইবে। নহিলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা মিছা হইয়া যায় এবং পরমাত্মার পূর্ণাত্মত্বও থাকে না। জীবাত্মার আপন ক্ষমতায় অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ না করিলেই নয়। আপন চেষ্টায় উন্নতি—ইহা ব্যতীত হিন্দুশাস্ত্রকারের সৃষ্টিতত্ত্বও মিছা হয়, পরমাত্মতত্ত্বও মিছা হয়, সৃষ্টিতত্ত্বও দাঁড়ায় না, মুক্তিতত্ত্বও দাঁড়ায় না। অতএব ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে oriental fate অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় অদৃষ্ট বা বিধিলিপি বলিয়া থাকেন, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব এবং পুরুষকার বা অধমাবস্থা অতিক্রম করিবার শক্তি না হইলেই নয়। তাই হিন্দুর কথিত ধ্রুব কথায় এত অসাধারণ ও অপরিমিত পুরুষকার দেখিতে পাই। তাই হিন্দু পুরাণে দেখিতে পাই ধ্রুব সমস্ত কর্ম্মফল তুচ্ছ করিয়া দেবদুর্লভ পদ লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিজ্ঞা বলে স্থির অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বাধা সমস্ত বিঘ্ন বিষম বিভীষিকা সব অতিক্রম করিয়া সেই দেবদুর্লভ পদ

লাভ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল। তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে ছাড়িতেন, তাহা সম্পন্ন করণার্থ যাহা কিছু করিবার আবশ্যক হইত, বীরবিক্রমে নির্ভীক চিত্তে এবং অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহা করিতেন। আয়োধ ধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণির কথা মনে আছে কি? গুরু আরুণিকে জল নির্গমন নিবারণার্থ শস্যক্ষেত্রে আইল নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ পালন করিব বলিয়া গিয়া আরুণি দেখিলেন যে আইল নির্ম্মাণ করা অসাধ্য। তিনি জলনির্গমন নিবারণার্থ নানা উপায় পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সকল উপায়ই বিফল হইল। তখন আপন প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া স্বয়ং ক্ষেত্রপার্শ্বে শয়ন করিয়া জল নির্গমন বন্ধ করিলেন *। শাপগ্রস্ত পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগীরথ কি বিষম সাহস প্রতিজ্ঞা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কর্ম্মই না করিয়াছিলেন। পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ রামচন্দ্র কত দিন ধরিয়া কতকষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন এবং সীতাকে পুনর্লাভার্থ কি অসাধ্য সাধনই করিয়াছিলেন! মহাঋষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করণার্থ কত কষ্ট সহ্য করিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন! তুমি বলিবে, এসব গল্প-কথা, এসব কথা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম যে এসব গল্প-কথা, যাহাকে ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলে, এসব কথা তাহা নয়। কিন্তু যাঁহারা এরকম

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়।

গল্পকথা রচনা করেন, তাঁহারা কি ধাতুর লোক ছিলেন বল দেখি? তাঁহারা কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ও পুরুষকার সম্পন্ন লোক ছিলেন না? নহিলে, যে মুক্তিকে তাঁহারা মানুষের পরম পদার্থ বলিয়া বুঝিতেন, সেই মুক্তি লাভ করণার্থ তাঁহারা এত করিতেন কেন? স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি মধুর মায়াময় সংসার, যাহা হইতে দুই দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইলে তুমি আমি কাঁদিয়া আকুল হই, সেই সংসার চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, যে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখে তুমি আমি এত মুগ্ধ, চিরকালের জন্য সেই ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বিভীষিকাময় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অনশনে বা অনশন-তুল্য স্বল্পাশনে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝন্‌ঝাবাত মাথায় পাতিয়া লইয়া, মুক্তির জন্য তাঁহারা কত বৎসর ধরিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেন। ইহা কি সামান্য প্রতিজ্ঞা ও সামান্য পুরুষকারের পরিচয়? এ রকম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের কথাকে ত গল্প-কথা বলিতে পার না। এখনও যে এমন যোগী ও তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। আর যোগী তপস্বীর কথাই বা কাজ কি? আজিকার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন নাই এমন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কি সেই পুরাতন ধাতু দেখিতে পাওয়া যায় না? আজিও কি অসংখ্য হিন্দু নরনারীকে ধর্ম্মচর্য্যার্থ অর্দ্ধাশন উপবাস ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিলাসবর্জ্জন কঠিন ব্রতাচরণ ব্যয়-ও-শ্রম-সাধ্য তীর্থ দর্শন ও ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না? ইহাও কি প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের প্রমাণ নয়? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা জ্ঞানপথে ও ধর্ম্মপথে এত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

গ্রীক বল রোমান বল ইংরাজ বল ফরাসী বল জর্ম্মাণ বল যে যত উন্নতি করিয়াছে সকলই প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের বলে করিয়াছে। কিন্তু অসীম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার সম্পন্ন হিন্দুর বংশে জন্মিয়া আজ আমাদের প্রতিজ্ঞাও নাই পুরুষকারও নাই। আমরা যদি বা কখন উন্নতি সাধনার্থ একটা কাজ করিব মনে করি আমাদের সে সঙ্কল্প বেশি দিন থাকে না, দুই একটা সামান্য বাধাবিঘ্ন দেখিলেই আমরা তাহা ছাড়িয়া দি। আর বাধা বিঘ্ন না দেখিলেও দিন কতক পরেই তাহা যেন "বেমালুম" ভুলিয়া যাই। তাই আজ ধ্রুব-কথা উত্থাপন করিলাম—ধ্রুবের সেই বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, সেই অমানুষী পুরুষকার ও সেই সুরাসুরদুর্লভ সাহস ও বিক্রমের কথা উত্থাপন করিলাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধ্রুব কি আমাদেরও ধ্রুব হইবে না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের শ্রেয় ও অভিলষিত কর্ম্মে যেমন ধ্রুব-সঙ্কল্প হইতেন, আমরাও কি আমাদের শ্রেয় ও অভিলষিত কর্ম্মে সেইরূপ ধ্রুব-সঙ্কল্প হইব না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ত্তব্য সাধনে যে ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন আমরাও কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে আমাদের উন্নতি সাধনে সেই ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত হইব না? হিন্দুর ধ্রুব শব্দ বলে, হিন্দু ধরণীর ন্যায় দৃঢ়, ধরণীর ন্যায় ধীর, ধরণীর ন্যায় ধারণাক্ষম, ধরণীর ন্যায় উন্নতিশীল, ধরণীর ন্যায় অনন্তপথের পথিক। আমরা কি ধ্রুব-কথা ভুলিতে পারি? আজিকার দিনে ধ্রুব-কথাই আমাদের বেদ, ধ্রুব-কথাই আমোদের পুরাণ, ধ্রুব-কথাই আমাদের স্মৃতি হওয়া উচিত।

অদৃষ্ট বিষয়ে যখন এত কথা কহিলাম, তখন আরো একটা

কথা না কহিলে চলে না। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এ দেশের যে অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের কথা বলিয়া থাকেন তাহার কি কোন হেতু নাই? হেতু আছে। এ দেশের লোক পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্যমশীল নয়। এ দেশের লোককে পার্থিব অবস্থার উন্নতি করিতে বলিলে তাহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে—তুমিও যেমন, উন্নতির জন্য আবার চেষ্টা করিব কি? অদৃষ্টে উন্নতি থাকে, চেষ্টা না করিলেও উন্নতি হইবে, অদৃষ্টে না থাকে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উন্নতি হইবে না। এ কথার মোটামুটি অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের একটা বাঁধাধরা অদৃষ্ট আছে, তাহা ফলিবেই ফলিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কাছে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনা অবশ্য প্রকাশ আছে। অতএব ভগবান বলিতে পারেন ভবিষ্যতে কোন্ মনুষ্যের অদৃষ্টে কি ঘটিবে। কিন্তু মানুষ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না কি ঘটিবে। তবে মানুষ এ কথা বলিতে পারে যে আমি বলিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে যাহা হউক একটা ঘটিবেই ঘটিবে, তখন আমি চেষ্টা করিলেও তাহা ঘটিবে, চেষ্টা না করিলেও তাহা ঘটিবে। মানুষের ভুল এইখানে। আমরা যাহা কিছু পাইতে ইচ্ছা করি সকলই আমাদের চেষ্টা করিয়া পাইতে হয়—আমরা কখনও যাহা কিছু পাইয়াছি সকলই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। অতীত কালে দেখিয়াছি যে যাহা কিছু পাইয়াছি সবই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। তবে যাহা ভবিষ্যতে পাইতে হইবে কেবল তাহারই সম্বন্ধে কেন বলি, যদি তাহা আমার অদৃষ্টে থাকে তবে

আমি তাহা চেষ্টা করিলেও পাইব, চেষ্টা না করিলেও পাইব? ফল কথা এই যে, এ দেশের লোকে প্রকৃত পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট মানেন না। তাঁহাদিগকে পার্থিব উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে বলিলে তাঁহারা বলেন বটে যে পার্থিব উন্নতি আমাদের অদৃষ্টে থাকিলে আমরা চেষ্টা করিলেও হইবে চেষ্টা না করিলেও হইবে এবং এই বলিয়া প্রায়ই নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই ত পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়া থাকেন। পারলৌকিক উন্নতি অদৃষ্টে থাকে, চেষ্টা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে, এরূপ ভাবিয়া ত নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁহারাই ত স্বল্প-শ্রম-সাধ্য সামান্য অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ক্ষুধার শান্তি করেন। ভোজন অদৃষ্টে থাকে, অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিলেও ভোজন করিতে পাইব, রন্ধন না করিলেও পাইব, এইরূপ ভাবিয়া রন্ধন না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অব্যর্থ অদৃষ্ট মানেন না। তবে যে পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে অব্যর্থ অদৃষ্টের কথা তুলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহার বোধ হয় দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ এ দেশের জল বায়ু এমনি যে উহা মানুষকে কিছু অলস শ্রমকাতর বা বিশ্রামপ্রিয় করে। সেই জন্য বিষয়কর্ম্মের ন্যায় যে সকল কাজে উন্নতি করিতে গেলে বেশি শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় সে সকল কাজে উন্নতি করিতে এ দেশের লোকের স্বভাবতই কিছু অনিচ্ছা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বহু পূর্ব্বকাল হইতে এ দেশের লোক অধিক পরিমাণে ধর্ম্মপ্রিয় হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহারা সেই পরিমাণে পার্থিব সম্পদ ও উন্নতি হেয় ও

অনর্জ্জনীয় মনে করিয়াছে। লোকে যাহা হেয় ও অনর্জ্জনীয় মনে করে, তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য তাহাদের বড় একটা ইচ্ছাও হয় না, পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তিও হয় না। জলবায়ুর গুণে এ দেশের লোকের যে আলস্য হইয়া থাকে, এই মানসিক প্রকৃতি তাহা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। সেই জন্য এ দেশের লোক পার্থিব উন্নতি সাধনের কথায় অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে। যাহা উত্তম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝে সেই ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি সাধন করিবার বেলা তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কঠিন উদ্যম করে। এবং রন্ধনাদি যে সকল কাজ না করিলে নয় এবং অল্প শ্রমে সম্পন্ন করা যায়, সে সকল কাজ সম্বন্ধে তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, যথাযথ পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেবল যে পার্থিব সম্পদ তাহারা হেয় মনে করে এবং যাহা সঞ্চয় করিতে প্রভূত পরিশ্রম প্রয়োজন, সেই পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়ের কথায় অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। তাহাদের অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট-বাদ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যুক্তি সমুদ্ভূত বা বিশ্বাস মূলক অদৃষ্ট-বাদ নয়। তাহাদের অদৃষ্ট-বাদ তাহাদের অলস প্রকৃতি ও ধর্ম্মপ্রিয়তা সমুদ্ভূত একটা ওজর মাত্র। পণ্ডিত ও দার্শনিক দিগের সে রকম অদৃষ্ট-বাদকে প্রকৃতপক্ষে একটা অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট-বাদ বলিয়া বিবেচনা করা অন্যায়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা সেই অন্যায় কার্য্যটি করিয়াছেন এবং এখনও পর্য্যন্ত করিতেছেন।
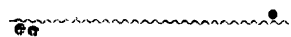
দেখা গেল যে আমাদের শাস্ত্রে অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্টবাদ অসম্ভব এবং আমাদের মধ্যে লোকসাধারণ যে অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট-বাদের কথা কয়, তাহা তাহাদের একটা ওজর মাত্র, যুক্তি বা বিশ্বাস মূলক কথা নয়। এখন আমরা যদি বুঝি যে আমাদের জীবন রক্ষার্থ, সমাজ রক্ষার্থ, জাতি রক্ষার্থ ও ধর্ম্ম-চর্য্যার্থ আমাদের পার্থিব বিদ্যা ও সম্পদ আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে পুরুষকারের বলে পুরুষকার বৃদ্ধি করিয়া এবং শারীরিক আলস্য-প্রবণতা পরাজয় করিয়া, সেই পূর্ণ পুরুষ-কারাবতার ধ্রুবের ন্যায় সর্ব্বকল্যাণদাতা ভগবানের নাম করিয়া সকল বাধা সকল বিঘ্ন সমস্ত বিভীষিকা অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া অপরিসীম পার্থিব শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করিয়া আমাদের সকলকে সেই সর্ব্বশক্তিরূপী এবং সর্ব্বসম্পদরূপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে এবং পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে।

ধ্রুব কথা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার কথা। কিন্তু উপরে বলিয়াছি—'গ্রীক বল রোমান বল ইংরাজ বল ফরাসি বল জর্ম্মাণ বল যে যত উন্নতি করিয়াছে সকলই প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের বলে করিয়াছে।' তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে ধ্রুব-কথা হিন্দুরই কথা, আর কাহারো কথা নয়? দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ত হিন্দু ভিন্ন আরো অনেকের ছিল এবং আছে। একথা সত্য। কিন্তু ধ্রুব-কথায় বাহ্য সম্পদের জন্য একমাত্র ভগবানে যে নির্ভর দেখি তাহা আর কোথাও দেখিতে পাই না। ধর্ম্মচর্য্যা সকল দেশেই আছে, ধার্ম্মিকও সকল দেশেই আছে। কিন্তু ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা সমস্ত বাহ্য সম্পদ লাভ করিতে পারা যায় একথা

ত এই হিন্দুর দেশ ভিন্ন আর কোথাও শুনা যায় না। ঐশ্বর্য্য একমাত্র ধর্ম্মেরই অনুগামী একমাত্র ধর্ম্মচর্য্যারই ফল, এমন স্পষ্ট পরিষ্কার ও দৃঢ়তাযুক্ত কথা হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুরাণাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুর মতে এমন ঐশ্বর্য্য নাই যাহা ধর্ম্মবলে বা তপোবলে লাভ করিতে পারা যায় না। তপোবলে বিশ্বামিত্র একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলেই হয়, তপোইলেই ধ্রুব গোটা ধ্রুবলোকটা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবল বা আধ্যাত্মিক শক্তির এত ফলোপধায়কতার কথা হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও নাই। এবং বোধ হয় যে ধর্ম্মবল বা আধ্যাত্মিক শক্তির এরূপ ফলোপধায়কতায় হিন্দু ভিন্ন আর কাহারো বিশ্বাসও নাই। Oriental religions নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন জনসন সাহেবও এই বিশ্বাসটিকে হিন্দুর একটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মবল দ্বারা বাহ্যসম্পদ লাভ করিবার একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধ্রুব-কথাটিকে একমাত্র হিন্দুরই কথা বলিয়া গ্রহণ করায় কোন দোষ হইতে পারে না।

কেমন করিয়া ধ্রুব-কথানুসারে আমরা কার্য্য করিতে পারি এখন তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের এখন বাহ্য-সম্পদের বিশেষ অভাব হইয়াছে। দেশের লোকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে খাদ্যাদির পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না। অতএব এখন কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা ধনবৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ধ্রুব বা বিশ্বমিত্রের ন্যায় যোগবলেই কি আমরা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিব?

যোগ বলে এ রকম উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্মবলে যে পারা যায় তাহা সুনিশ্চিত। অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইলে সেই সকল কার্য্যে উন্নতি যেমন সুনিশ্চিত অন্য কোন প্রণালীতে তেমন নয়। বিষয়-কর্ম্মে যে ধর্ম্মনীতি অনুসরণ করে বিষয়কর্ম্মে তাহাকে প্রকৃতার্থে জয়ী হইতে দেখা যায়। বাহ্যসম্পদের সহিত ভগবানকে সংযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভগবানকে হারাইতে হইবে এবং বাহ্যসম্পদই ভগবান হইয়া উঠিবে। এবং তাহা হইলে মনুষ্যের যে চরম উদ্দেশ্য—ভগবানে লয়—তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। অতএব বাহ্যবিভবের সহিত ব্রহ্মের যোগ একান্ত আবশ্যক। ধ্রুব-কথার প্রকৃত অর্থও তাই।

ধ্রুব-কথার এক অর্থ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা। এ অর্থে ধ্রুব-কথা কেবল হিন্দুর কথা নয়।

ধ্রুব-কথার আর এক অর্থ—বাহ্যবিভবের সহিত ব্রহ্মের যোগ। এই অর্থে ধ্রুব-কথা কেবল হিন্দুরই কথা।

তাই বলিয়াছি, ধ্রুব-কথা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

তুষানল।

[বিষম কষ্টসহিষ্ণুতা]

লয়ের নিমিত্ত যে বিষম সাধনা আবশ্যক তাহা কি কষ্টকর তাহা বুঝা হইয়াছে। অতএব লয়বাদী হিন্দুর বিষম কষ্ট-সহিষ্ণুতা থাকিবারই কথা। দেখা যাউক আছে বা কখন ছিল কি না।

এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে কষ্ট-সহিষ্ণু এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করেন এবং এসিয়াকে বিলাসপ্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা করেন। বিদ্বান, বিচক্ষণ, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ইউরোপ যে হিন্দুর এরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করেন ইহা একটু বিস্ময়কর। The ease-loving Oriental—এই নিন্দাবাদ সমস্ত ইউরোপ-বাসীর মুখে শুনা যায়। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক এমন কথা বলি না। ইউরোপ যাহাকে কর্ম্ম-শীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা বলেন এসিয়ায় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রান্ত ভাবে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান, শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ বা অগ্নিময় মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়া রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়া বরুণের

রাজ্য বিস্তীর্ণ করণ—এ রকম চঞ্চলতা-যুক্ত শ্রমশীলতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা এসিয়ায় বড় একটা দেখা যায় না। তাই ইউ-রোপবাসী এসিয়াবাসীকে ease loving Oriental বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু এসিয়াবাসী কি যথার্থই ease loving, আরাম-প্রিয় বা বিলাসপ্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসী সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে আরাম-লোলুপ বা বিলাসপ্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিষ্ণু কি না, আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা বলিব। তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুদিগকেও বিলাস-প্রিয় বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইউরোপবাসীর বিবেচনায় যোগোপবিষ্ট,বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগীও স্বস্তি-প্রিয় ভারতবাসী। আর এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানতঃ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিব। এরূপ করিবার প্রথম কারণ এই যে প্রাচীন হিন্দুর কার্য্যকলাপ ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন কি সে কার্য্য-কলাপের অধিকাংশের চিহ্নমাত্র নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমা-ণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকি-লেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না সাহিত্যে শুধু কার্য্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা এবং আসক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ, ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অঙ্কিত থাকে। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় ধাতু বাঁধা থাকে, কেননা জাতীয় ধাতু না বাঁধিলে জাতীয় সাহিত্য জন্মে না।

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক, বৃদ্ধ, বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, ছোট, বড়, সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা কিছু কিছু অবগত আছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থূল স্থূল কথা সকলেই জানে। অতএব কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র দুঃখের কাহিনীতে, কষ্টের কথায়, ত্যাগস্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ। রামের বনবাস, পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস, অর্জ্জুনের নির্ব্বাসন, নলদময়ন্তীর কথা, শ্রীবৎসচিন্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমূতবাহনের কথা, দাতাকর্ণের কথা—এইরূপ অসংখ অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধ হয় এত শোক এত দুঃখ এত যন্ত্রণার কথা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে নাই। আবার যিনি সেই সকল কথা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া বনবাসী বনবাসিনী সেই বনবাসযন্ত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা সেই পতিবিচ্ছেদ দুঃখ, সেই পতিবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—তিনিই জানেন, যে মহাপুরুষগণ সেই সকল শোকের দুঃখের যন্ত্রণার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই কথায় কত উন্মত্ত, কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ—যেন শোক দুঃখ যন্ত্রণাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ—মানুষের পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী। গ্রীক্ সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক দুঃখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, ইস্কিলস এবং সেক্ষপীয়রের মতন দুঃখ যন্ত্রণার কথা ইউরোপে অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে দুঃখ যন্ত্রণা হয় ক্ষণমাত্র স্থায়ী—যেমন গ্রীক্ নাটকে, নয়

ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্য্য মিশ্রিত—যেমন সেক্ষপীয়রের নাটকে। নাটক অভিনয় করিতে যে চারি পাচ ঘণ্টা সময় আবশ্যক, গ্রীক নাটকবর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্পকালব্যাপী। অতএব গ্রীক্ নাটকের নায়ক নায়িকার যন্ত্রণা—ঈদিপস্, আন্তাইগণি বা ফিলকৃতিতিসের যন্ত্রণা—তীক্ষ্ণতম হইলেও দণ্ড-মাত্রস্থায়ী। ইংরাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। কিন্তু ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—হ্যামলেটের বা লীয়রের যন্ত্রণা—অধীর অস্থির অসহিষ্ণু লোকের যন্ত্রণা। সেক্ষপীয়র, সফক্লিস্, ইস্কিলস্ সকলেই দুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দুঃখ যন্ত্রণার জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া দণ্ড, দণ্ড দণ্ড করিয়া দিন, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া জীবন—এমন একটা দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন—কেহ চিত্রিত করেন নাই। ইউরোপীয় নাটকে দেখিতে পাই যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাড়িয়া ফেলিতেছে, কেহ আপনার সন্তাতসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য—যেন বিদ্যুতাগ্নিতে সহসা দশ দিক জ্বলিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তখনি আবার ঘোর অন্ধকার। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র। দেখিতেছি অতি অল্প, বুঝিতেছি অতি অল্প, অবাক হইয়া আছি।* যে যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া

* ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভ বড় বেশী হয় না।

লুণ দেওয়ার মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, বাড়িয়া বাড়িয়া এক একটা জীবনকাল বা জীবনকালের এক একটা সুদীর্ঘ অংশ ব্যাপিয়া উঠে, অথচ যন্ত্রণাভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না—কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে দেখা যায়।—বালিকা রাজবধূ ইচ্ছা করিয়া বনে গমন করিতেছেন। রাজভোগ, রাজসম্পদ, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, বন্যজন্তু সমাকীর্ণ বনপথে উপবাসে অল্পাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চলিতেছেন—দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার প্রতিপ্রাণার পতিবিচ্ছেদ—যে পতির জন্য এত কষ্টভোগ সেই পতিকে ছাড়িয়া শত্রুপুরীতে বাস। শত্রু প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে, তাড়না করিতেছে, অপমান করিতেছে, জ্বালার উপর জ্বালা দিতেছে। এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর যদি শত্রুর হাত ছাড়াইলেন ত আবার পতির হাতে পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। রাজ্যে গিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের জন্য অন্তর্ধান! যেন কষ্ট দিতে কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা। আবার দেখ—রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দুঃখ দিতে হইবে। দুঃখ দিতে হইলে দুঃখে জর্জ্জরিত না করিলে দুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরি-

শ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক মাসের দুঃখে মানুষ জর্জ্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন! তাই বলি, যন্ত্রণাভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে চলিবে না। শোকের, দুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহ জানেনা।

রাজা ঔশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্তু করিয়াছেন—ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন—'গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।' শ্যেন কহিল 'যদি এই কপোত-পরিমাণ মাংস নিজ দেহ হইতে কাটিয়া দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কামনা পরিত্যাগ

করিব'। 'তাহাই করিব' বলিয়া রাজা ঔশীনর তুলা যন্ত্রের একদিকে কপোতকে বসাইয়া অন্যদিকে আপন হস্তে আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের উপর রাখিলেন। তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংস খণ্ড কাটিলেন—তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন সেই কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ লইয়া রাজা ঔশীনর স্বয়ং তুলা-যন্ত্রে আরোহণ করিলেন। দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র আপন রূপ ধারণ করিলেন, কপোত-রূপী অগ্নি আপন রূপ ধারণ করিলেন, এবং রাজার অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজাও ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গ-মর্ত্ত উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমান দেহে স্বর্গে আরোহণ করি-লেন। কালে এই কথা ইউরোপে গমন করিল—এই রকমের অনেক কথাই ইউরোপে গমন করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে এ কথার এ আকারও রহিল না, এ প্রকারও রহিল না। ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে পারিল না—তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা কি সহা যায়? ঔশীনরের আপন দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া ইউরোপ শিহরিয়া উঠিল! আর ভাবিল—এমন কি পরোপকার যে তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহিতে হইবে, আর আপনার মাংস কাটিয়া দিয়া প্রাণটাকে নষ্ট করিতে হইবে? ইউরোপ ঔশীনরের কথা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কূটতর্ক তুলিয়া মাংস

কাটিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, আর পাছে সেই ভীরুতা এবং আত্মপ্রিয়তার জন্য লোকে নিন্দা করে, সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা একটা নির্ব্বিরোধী ইহুদীর মাথায় চাপাইয়া দিল! আর সেই গল্প লিখিয়া * স্বয়ং সেক্ষপীয়র সেই কলঙ্কের ডালি আপনার পবিত্র মাথায় চাপাইলেন! আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে কুসীদজীবী শাইলক যে নৃশংস নির্ম্মম প্রণালীতে টাকা ধার দিয়াছিল তদনুসারে কার্য্য হওয়া উচিত নয়, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল। এ ও কি কথা? যেখানে মানুষকে নীতি এবং ধর্ম্মের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি আদর্শশ্রেষ্ঠ বিশ্বাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শ কি? বিশ্বনাথের নিয়মে জীব কি দলিত, ক্ষতবিক্ষত, বিচূর্ণিত, বিঘূর্ণিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভস্মীভূত হইতেছে না? আর হইতেছে বলিয়া কি বিশ্বনাথের নিয়ম ব্যর্থ করিতে হইবে? ইউরোপ ব্যর্থ করেন, হিন্দু করেন না। হিন্দুর দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের এক কাহিনী আছে। সে কাহিনী অপূর্ব্ব কৌশলে কথিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুত কার্য্য হিন্দু সর্ব্বদাই ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত কার্য্য করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকে আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল। সে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দর্শকের হৃদয়ও শোকে আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া উঠে। এ রকম চিত্র কেন? কেন তাহা এই কথায় বুঝ। এ চিত্র দেখিলে বিশ্বা-

* Merchant of Venice.

মিত্রের উপর রাগ হয়, মনে হয় বিশ্বামিত্রের মতন পাষণ্ড আর নাই। কবিও তাহাই বলিতে চাহেন। শৈব্যা আত্ম-বিক্রয় দ্বারা দক্ষিণাদানের প্রস্তাব করিলেন। পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাজা শোকে বিহ্বল প্রায়। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া বলিয়া গেলেন—আজ যদি দক্ষিণা না দিস্ তাহা হইলে সূর্য্যাস্ত হইলেই তোকে অভিশপ্ত করিব। তখন

——————রাজা চাসীদ্ ভয়াতুরঃ।
কান্দিগ্ভূতোঽধমোনিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

রাজা নৃশংস ধনী কর্ত্তৃক পীড়িত, ভয়াতুর, দিশাহারা, অধম এবং নিস্ব হইয়া পড়িলেন।

কবি বিশ্বামিত্রকে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিলেন। আবার যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীপুত্রবিক্রয়লব্ধ ধন লইয়া বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত রাজাকে শাসাইয়া চলিয়া গেলেন তখন কবি বলিলেন ;—

ত্বমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুর নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

কৌশিক রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে এই নিষ্ঠুর, নির্ঘৃণ বাক্য বলিয়া সেই ধন গ্রহণ পূর্ব্বক কোপভরে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

কবি বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকে নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ বলিয়া নিন্দা করিলেন—বিশ্বামিত্রের উপর কবির কত রাগ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ রাগ ন্যায়-সঙ্গত, কেন না বিশ্বামিত্রের পণ

যথার্থই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর এবং নির্ম্মম ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই কবি তাঁহার চিরন্তন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কাঁদাইলেন। হরিশ্চন্দ্রকে না কাঁদাইলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্তু এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের কার্য্যে ত বাধা দিলেন না—পাষণ্ডের পণ ও পণ্ড করিলেন না। করিবেন কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অনুগামী। জীব যন্ত্রনা পায় বলিয়া বিশ্বের নিয়ম কি ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ঠুর হউন না বিশ্বামিত্র পুরুষ, বিশ্বামিত্র মানুষ—পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র যতই কেন কাঁদুন না—তিনিও মানুষ, সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন কেহ বিশ্বের শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীয়রও কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতেন না।

ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। ইউরোপ বাহ্যসম্পদের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে, হিন্দু ধর্ম্মের নিমিত্ত, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট আত্মার জন্য। ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। দুই প্রকার কষ্ট দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি দুই রকমের। একটি বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুর বাহ্য উন্নতি বড় বেশী হয় নাই, ইউরোপের

আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইউরোপের সামান্য লোককে এখানকার পল্লিগ্রামের বড় বড় জমিদার অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোকও ধর্ম্ম-জ্ঞানে এবং ধর্ম্মচর্য্যায় ইউরোপের অনেক বড় বড় লোকের সমকক্ষ। কেহ কেহ বলিবেন যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হই-লেও তাহার ফল মৃত্যু—প্রমাণ, ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার বাণিজ্য হরণ। এ কথা সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ইউ-রোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে দেহের মৃত্যু যদি হিন্দুর উন্নতির ফল হইয়া থাকে, আত্মার মৃত্যু ইউরোপের উন্নতির ফল হইতে পারে। কোন্ মৃত্যুটা ভাল পাঠক বিচার করিবেন। কি এ দেশীয় শাস্ত্র কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, ধর্ম্ম-প্রধান হইলে যে মরিতেই হইবে এমন কোন কথাই নাই। হিন্দু ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দুস্থান লইয়া যুদ্ধ হয় তখন হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। হইতে পারে যে তাহার স্বদেশানুরাগ বা patriotism ছিল না, কিন্তু রাজস্থানে যে রাজভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে সে রাজভক্তি ত প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মপ্রধান না হইয়াও এবং স্বদেশানুরাগী হইয়াও গ্রীক্ যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল, হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হইয়াছিল—অর্থাৎ দেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া-

ছিল বলিয়া। আর এক কথা। ধর্ম্মপ্রধান হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম্ম অতি মন্দ জিনিষ। কিন্তু সে অর্থ কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোধ হয় না। তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে ধর্ম্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে? তুমি ইউরোপকে দেখাইয়া বলিবে যে আত্মসুখান্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় কর্ম্মশীল (active), শ্রমশীল, অসমসাহসিক (বা adventurous) ইত্যাদি হওয়া যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কথা তোমাকে কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং আপনার প্রয়োজন লইয়া থাকিত তখন মানুষ পশুর ন্যায় অলস এবং অসহিষ্ণু ছিল। এবং মানুষের যখন পাঁচ জন হইল—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী হইল—তখনই সে চেষ্টাশীল, কর্ম্মশীল হইতে লাগিল। অতএব ধর্ম্মই কর্ম্মের প্রকৃত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সময় হয় যখন সে ধর্ম্মের জন্য নয়, সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায় তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ-লালসা জন্মে এবং তখনই তাহার সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউরোপ পৃথিবী তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বোধ হয় বলিবে যে আপনার সুখ সাধন করিতে মানুষের স্বভাবতঃ যত প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয় অন্যের সুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, আপনার সুখ অপেক্ষা অন্যের সুখ বেশী প্রার্থনীয় বলিয়া যে বুঝিতে শিখিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে আপনার সুখাপেক্ষা

হিন্দু সাহিত্যের ধাত্ বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয় যে প্রাচীন কালে হিন্দু ধনের নিমিত্ত নয়, ধর্ম্মের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকার ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ম্ম করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত। যজ্ঞের অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবী খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সেই ষাটি সহস্র সগর সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কত দুর্গম স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা হইয়া আসিয়াছে তাহাতে তিনি স্বার্থকে পরার্থের অধীন করিয়া আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা ও উদ্যমশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মাত্মক হইবে। কিন্তু হিন্দুর যে প্রাচীন প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি আজিও কি তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে। কেন না আজিও গৃহস্থ হিন্দু যত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন গৃহস্থ ইউরোপীয় তত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটেন না। অতএব প্রার্থনা করি যে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল আজিকার হিন্দুরও যেন তাহা থাকে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যে হিন্দুর সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেছেন

তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিলাম যে কষ্টসহিষ্ণুতাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর মহত্ত্ব, হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য। সে কষ্টসহিষ্ণুতা হারাইলে আমরা সব হারাইব—আমাদের বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন, আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে।

কষ্ট ভিন্ন উন্নতি নাই। দেখিলাম হিন্দুর কষ্টভোগ করিবার যত ক্ষমতা আছে আর কাহারো তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই কষ্টসহিষ্ণুতার কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি কষ্টভোগ করিতে পারি তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহৎ হইব। হিন্দুকে আজ এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে। এই আশায় এই আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত হইয়া আমাদিগকে এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যত্ন করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে। কোন্ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে পরিশ্রম সফল হইবে প্রথম হইতেই তাহা ঠিক্ করিয়া লইতে হইবে। প্রথম হইতে পথ ঠিক করা সকল কার্য্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি। এবং এরূপ গুরুতর কার্য্যে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। সকল কার্য্যই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্ট দুই প্রকার। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক প্রকার; ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক প্রকার। আমরা দেখিয়াছি যে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। অতএব এমন অনুমান করা যাইতে পারে যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা

তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত এবং এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করি-লেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ তাহাতে তিনি বেশী সফলতা লাভ করিবেন। আমি এমন কথা বলি না যে চিরকাল ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দু আজ ঘরের বাহির হইয়া জ্ঞান ও ধন সঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থানে যাইবেন না বা সকল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। ধন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ আজি হইতে তাঁহাকে সেই প্রণালীর কষ্টভোগ শিক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া পুরাতন প্রকৃতিসঙ্গত প্রণালীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হয়। দুইটি প্রণালীর মধ্যে সেই পুরাতন প্রণালীটিই উৎকৃষ্ট। যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস তরকারি প্রভৃতি আনিয়া দেয় সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া চুল্লীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গাঢ় ধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আহরিত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেয় তাহার শ্রমের মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ। সামান্য লোকের দ্বারা হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্য্য হয় না। হিন্দু! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্য্যে কৃতকার্য্য হয়, অতি প্রাচীন কল হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নূতন প্রণালীতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর, প্রাণপণে চেষ্টা কর। নহিলে আজিকার দিনে চলিবে না। কিন্তু তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন সে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে চিত্রিত নাই। মনে রাখিয়া এই চেষ্টা

করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধনশালায় প্রধান রাঁধুনীর পদ তোমারই হয়—যেন অপর সমস্ত জাতি দিগ্‌দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া দেয়। তোমার ইতিহাস বলিতেছে, ইহাই তোমার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় সকল দিক হারাইবে! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে তুমি যেমন পৃথিবীর আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্য যুগেও তেমনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয় একটা প্রমাণ গ্রহণ কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়া যে আজিকার নরবীর ইংরাজকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেছ সে কেবল তোমার পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং আসাধারণ কষ্টভোগ শক্তির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। লোকে আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে, সে শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাড়াইতে পারিলে লোকে একদিন অবশ্যই তোমাকে পৃথিবীর আর্য্য বলিয়া আবার পূজা করিবে।

কড়াক্রান্তি।

[সুদূরগামিতা]

মুদ্রার বিভাগে অন্য দেশে যত ভাগ বা অংশ দেখিতে পাওয়া যায় এদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাগ বা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, পয়সা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক্ আছে, তিল আছে। ইংরাজি হিসাবে পাউণ্ড, শিলিং, পেনি, ফার্দিঙ্গের বেশী ধরে না, আমাদের হিসাবে টাকা, আনা, পয়সা, কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, তিল সব ধরে। ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না।

লয়ের কথায় লিখিয়াছি—

"জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছি—পথ আর ফুরায় না—কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই, মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই—কবে চলা শেষ হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, ভাবিতে গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এ পাশে ও পাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ!, অ-হু-হ কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব

ছাড়িয়া, সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিতেছি—অবিরাম চলিতেছি, অনন্ত কাল চলিতেছি! তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও, একুটু দয়ামায়া, একুটু কৃপাকরুণা আছে যে একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল কমিয়া যাইবে! যাঁহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতেছি, তাঁহাতেও ত দয়ামায়া নাই, কৃপাকরুণা নাই। তিনি যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না *।'

ভগবান্ কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। আর ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডও কড়াক্রান্তিটি ছাড়ে না। আপন কক্ষপথে ভ্রমন করিতে যে গ্রহের যত সময় আবশ্যক তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে গ্রহের সেই কক্ষপথে ভ্রমণ শেষ করিবার যো নাই। যে নক্ষত্ররশ্মিটির যে গ্রহে পঁহুছিতে যত সময় আবশ্যক তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে রশ্মিটির সে গ্রহে পঁহুছিবার উপায় নাই। যে বজ্রনিনাদ দুই পলে তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবে সাধ্য কি তাহা দুই পলের কোটি অংশ কম সময়ে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে? এই রূপ দেখিবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কড়াক্রান্তিটির ব্যতিক্রম হয় না, যে কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়াবল তাহার কড়াক্রান্তিটি বাদ পড়ে না, বাদ পড়িবার যো নাই। আর হিন্দু বলেন যে ধর্ম্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান

---

* ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা।

কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পয্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে রজস্বলা কন্যার বিবাহের বিশেষ নিষেধ আছে, রজস্বলা কন্যার বিবাহের ফল বড় ভয়ানক বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহা কি কেবলই মূর্খতা, কেবলই কুসংস্কার? বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের গুরুদক্ষিণা দিবার কথা বোধ হয় সকলেই জানেন*। বিশ্বামিত্র দক্ষিণা লইবেন না, গালব দক্ষিণা না দিয়াও ছাড়িবেন না। বিশ্বামিত্র রাগিয়া বলিলেন, তবে আমাকে শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। গালব দরিদ্র, আট শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব পাইবেন কোথায়? তিনি রাজা যযাতির নিকট গমন করিলেন। যযাতি বলিলেন, আমার ধনাগার শূন্য, আমি ওরকম অশ্ব ক্রয় করিয়া দিতে পারিব না, অতএব তুমি এক কাজ কর। মাধবী নাম্নী আমার একটী অতি রূপবতী কন্যা আছে, তুমি তাহাকে লইয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যশালী রাজাদিগকে দেও, তাঁহারা মাধবী হইতে পুত্র লাভ করিয়া তোমাকে তোমার অভিলষিত অশ্ব দান করিবেন। গালব মাধবীকে লইয়া গিয়া ইক্ষাকু বংশীয় রাজা হর্য্যশ্বকে দিলেন। মাধবীর গর্ভে হর্য্যশ্বের একটী পুত্র সন্তান হইল। তিনি গালবকে দুইশত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব দিয়া মাধবীকে ফিরাইয়া দিলেন। মাধবী পূর্ব্বলব্ধ একটী বর প্রভাবে আবার

---

* মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ১১৩ অধ্যায়।

কুমারী হইয়া গেলেন। তখন গালব তাঁহাকে আর এক রাজাকে দিলেন। সে রাজাও একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়া গালবকে দুই শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব সহ মাধবীকে ফিরাইয়া দিলেন। তখন মাধবী সেই বর প্রভাবে আবার কুমারী হইয়া আর এক রাজার নিকট অর্পিত হইলেন। এই প্রকারে গালবের সমস্ত গুরুদক্ষিণার সংস্থান হইল। মাধবীর কুমারিত্ব লাভের অর্থ এই যে কুমারীরই বিবাহ হইতে পারে, যে কুমারী নয় তাহার বিবাহ নাই। কিন্তু শুধু কুমারী বা অবিবাহিতা হইলেই হয় না।

অতএব সেই সর্ব্বলোকপূজিতা সাবিত্রীর কথা শুন। পিতার আদেশে সাবিত্রী সত্যবানকে পতি মনোনীত করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে। পিতা কন্যাকে অন্য বর মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন। কন্যা কহিলেন—"দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যারে একবারই প্রদান করে; দদানি এই বাক্য এক বারই বলে। হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহারে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহারে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমত মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ*।" সাবিত্রীর মতে, মনের পরিণয়ও

* কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯৩ অধ্যায়।

পরিণয়, মনের ভিতর যে পতি সে প্রকৃত পক্ষেই পতি। কিন্তু যথাযথ স্থানে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায় যে রজস্বলা হইলেই স্ত্রীদিগের আসঙ্গলিপ্সা হইয়া থাকে, অন্ততঃ হইবার সম্ভাবনাই বেশী। আর সে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে স্ত্রীদিগের চরিত্র কলুষিত না হইলেও মন কলুষিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন যে অবিবাহিতা স্ত্রীদিগকে সাবধানে অপবিত্র ভাব ও বস্তু হইতে দূরে রাখিলে তাহাদের চরিত্র বল মন বল কিছুই অপবিত্র হইতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীদিগকে এমন করিয়া রাখাই একটা বিষম কঠিন কার্য্য এবং লোকসাধারণের অবস্থা বিবেচনায় তাহাদিগকে এমন করিয়া রাখিতে পারাও এক রকম অসম্ভব। আবার স্ত্রীদিগের শারীরিক উত্তেজনার কারণ তাহাদের মনের বাহিরেও যেমন থাকে ভিতরেও তেমনি থাকে। রজোদর্শনে শারীরিক যে পরিবর্ত্তন বা পরিণতি ঘটে অর্থাৎ রজোদর্শন যে শারীরিক পরিবর্ত্তন বা পরিণতির অভিব্যক্তি আসঙ্গলিপ্সা তাহারই ফল বা অভিব্যক্তি। অতএব শুধু বাহ্য কারণ সম্বন্ধে সতর্ক হইলে চলে না, আভ্যন্তরিক কারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। রজস্বলা হইবার পর স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকিলে শারীর ধর্ম্মে তাহার মানসিক বিকার জন্মিতে পারে, নানা পুরুষের চিন্তা তাহার মন অধিকার করিতে পারে। কিন্তু স্বয়ং সাবিত্রী বলিয়াছেন যে মনের ভিতর যে পতি সে প্রকৃত পক্ষেই পতি। অতএব যে অবিবাহিতা রজস্বলার মনে কোন পুরুষ স্থান পাইয়াছে তাহার যদি সেই পুরুষের সহিত পরিণয় না হইয়া অন্য পুরুষের সহিত

পরিণয় হয় তবে সে ব্যভিচারিণী। তাহার মনে একাধিক পুরুষ স্থান পাইলে সে যে ব্যভিচারিণী তাহা বলিবার ত প্রয়োজনই নাই। সতীকুলের সাম্রাজ্ঞী বলিয়াছেন 'মনই প্রমাণ'। অতএব মনে যাহাতে ব্যভিচার না হয় তাহাই করা আবশ্যক। মনে যে ব্যভিচার করিতে বা ব্যভিচার চিন্তা করিতে পায় তাহার মনের ধাত্‌টাই যেন ব্যভিচারী রকম বা ব্যভিচার প্রবণ হইয়া যায়। মনে যে ব্যভিচারিণী তাহার বিবাহও ব্যভিচার। মনের ব্যভিচার নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় ব্যভিচার চিন্তার শক্তি ও আসক্তি জন্মিতে পারিবার পূর্ব্বেই বিবাহ। কারণ বিবাহিতা হইলে স্ত্রীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্পৃহা পতিতে আবদ্ধ বা সংলগ্ন হইয়া যায়—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তও থাকে না বিচরণও করে না। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের বিবাহের জন্য এত শক্ত শাসন এত কঠিন ব্যবস্থা। সতীধর্ম্মের কড়াক্রান্তিটুকু পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অনার্ত্তবার বিবাহের ব্যবস্থা। হিন্দুর ভগবানও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না, হিন্দুও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। হিন্দুর ভগবান ও বলেন, কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে টাকাটি মোহরটিও পাওয়া যায় না; হিন্দুও বলেন, কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে টাকাটি মোহরটিও পাওয়া যায় না। আর আমরা সকলেই জানি সতীধর্ম্মরূপিনী হিন্দুরমণীও বলেন, সতীধর্ম্মের কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে সতীধর্ম্মের টাকাটি মোহরটিও থাকে না।

মনের ব্যভিচারের কথা খৃষ্ট ধর্ম্মেও আছে। "Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart"—যে

ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মনে মনে সেই স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে (মেথিউ—৫, ২৮)। কিন্তু কার্য্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা মনের ব্যভিচারের কথাটা বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। মনের পাপের কথা তাঁহারা কহিয়া থাকেন বটে, তাঁহাদের গ্রন্থেও আছে বটে, কিন্তু সে কথা অবলম্বন করিয়া বা সে কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান গঠিত বা ব্যবস্থিত করেন না। সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় কড়াক্রান্তি ধরেন না, হিন্দুর ন্যায় বহুদূর গমণ করেন না। খাতাপত্রেও তাঁহারা ফার্দ্দিঙ্গে পর্য্যন্ত নামেন না, হিন্দুরা তিলটি পর্য্যন্ত ছাড়েন না। সুদূরগামিতা যথার্থই হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

এই কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার আরো দুই একটি উদাহরণ গ্রহণ কর।

মাধবীর কথার অর্থ, বিধবার বিবাহ নাই। কারণ বিধবা কুমারী নয়। আর সাবিত্রীর কথার যে অর্থ মাধবীর কথারও কার্য্যতঃ সেই অর্থ। অর্থাৎ মনে মনে বহুপুরুষ চিন্তা করিলে সতীধর্ম্মের জ্ঞান ও সংস্কার যেমন হতবল বা শ্লথ হইয়া যায় কার্য্যতঃ বহুপুরুষের পরিচয় করিলেও সতীধর্ম্মের জ্ঞান ও সংস্কার তেমনি হতবল বা শ্লথ হইয়া পড়ে। অতএব পতিহীনার মন যাহাতে পত্যন্তর গ্রহণের দিকেও না যায় তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রকারেরা সে উপায় বলিয়াও দিয়াছেন।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

(মনু—৫, ১৫৭)

পতি মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে কিন্তু ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না।

বোধ হয় অন্য কোন ব্যবস্থাপক হইলে 'ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের চিন্তা করিবে না' এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন, ইহার বেশী বলিতেন না। কিন্তু মনু হিন্দু ব্যবস্থাপক। তিনি বলিলেন 'ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না'। অনেকে বলিবেন, মনু বড় বাড়াবাড়িই করিয়াছেন, পরপুরুষের চিন্তাই যেন দোষ পরপুরুষের নাম করাও কি দোষ? আমার বোধ হয়, নাম করাও দোষ। কারণ নামের পিছনে প্রায়ই নামধারী লুক্কায়িত থাকেন। যে খানে নামধারী থাকেন না, সেখানে নামও থাকে না। নাম করা যথার্থই রোগের লক্ষণ। কুন্দনন্দিনীর সেই সারি গাথা নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-র কথা মনে আছে ত? নাম-রূপ কড়াক্রান্তিটি বড় তুচ্ছ জিনিষ নয়।

আবার নাম করার আর একটি অর্থ আছে। নাম করিতে করিতে কিছু স্পর্দ্ধা জন্মিয়া থাকে, কিছু গা-ঘেষা হইতে ইচ্ছা হয়, একটু মাথামাথি করিবার ঝোঁক হয়। কিন্তু যেখানে স্পর্দ্ধা, যেখানে গা-ঘেষা, যেখানে মাথামাথি সেখানে ভক্তি সম্ভ্রম থাকিতে পারে না। অতএব যাঁহার প্রতি ভক্তি সম্ভ্রম রাখা কর্ত্তব্য তাঁহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিলেই ভাল হয়,

অর্থাৎ বিনা সম্ভ্রম সহকারে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত না করাই উচিত। ভক্তি সম্ভ্রমের প্রণালীই এই। এই প্রণালীতেই ভক্তি সম্ভ্রম রক্ষিত ও বৰ্দ্ধিত হয়। আর এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে আচার্য্য, পিতা, মাতা, মন্ত্রদাতা প্রভৃতি গুরুজনের নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ সম্বন্ধে সম্ভ্রমশীল হইবার ব্যবস্থা আছে এবং পাদবন্দনা কালে তাঁহাদের পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও কড়াক্রান্তি বটে। কিন্তু এমন কড়াক্রান্তি ছাড়িয়া না দেওয়াই ভাল। এই কড়াক্রান্তি ছাড়িয়া দেওয়ায় আচার্য্য পিতা মাতা গুরু পুরোহিত সকলেই ত ভাসিয়া যাইতেছেন।

গুরুজন সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে আর এক প্রকার কড়াক্রান্তির ব্যবস্থা আছে। পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, মাতা স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, পিতাই গার্হপত্য অগ্নি, মাতাই দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য্যই আহবনীয় অগ্নি, এই তিন অগ্নিই গুরুতর হয়েন*—গুরুজনের এতদনুরূপ যে সকল গৌরব গরিমা আছে অত্যুক্তি বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে গুরুজনের গৌরব গরিমার প্রতি আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে এতই অনাস্থা হইয়া পড়িবে যে গৌরব গরিমার পরিবর্ত্তে তাহাদের নিগ্রহই নিয়ম হইয়া পড়িবে। অতএব এরূপ কড়াক্রান্তির প্রতিও হতাদর হওয়া ভাল নয়। যেখানে এরূপ কড়াক্রান্তির প্রতি অনাদর সেখানে গুরুজনের প্রতি প্রকৃত ভক্তি সম্ভ্রমের বড়ই অভাব, আত্মাদর বড়ই প্রবল—প্রমাণ, নব্য বঙ্গ।

---

* পিতা বৈ গার্হপত্যোগ্নির্ম্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥

মনু—২, ২৩১।

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত চরিত্রের বিশুদ্ধতা হয় না। সেই জন্য কামরিপু দমন করা সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই উপদেশ আছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* ॥

মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্জন গৃহে বাস করিবে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ একান্ত বলবান হইয়া জ্ঞানবান পুরুষকেও আকর্ষণ করে।

অনেকে এই শ্লোক পড়িয়া মনুর উপর খড়্গহস্ত হইবেন—বলিবেন, তাঁহার নীতিও যেমন নীচ, রুচিও তেমনি জঘন্য। কিন্তু কথিত আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও এক সময় মনুর এই শ্লোকের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর প্রকৃতার্থে এই পাপময় ইন্দ্রিয়পীড়িত সংসারে মনুর বর্ণিত কোন পাপ্‌টা না ঘটিতেছে? কয়েক বৎসর হইল বঙ্গের একটি জেলায় এক ব্যক্তি আপন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে লইয়া বাটী যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে বলপূর্ব্বক শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ধর্ম্মাপহরণ করিয়াছিল। তবে আর বাকী রহিল কোন্ পাপ্‌টা। আর কোন পাপই যদি বাকী না থাকে তবে তুচ্ছ রুচির অনুরোধে এ পাপটা বা ও পাপটার কথা চাপিয়া না রাখিয়া মানুষকে তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার কথায় সাবধান

* ২, ২১৫।

করিয়া দেওয়াই ত ভাল। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কড়াক্রান্তিটিও ছাড়িতেন না, কড়াক্রান্তিটিও চাপিয়া রাখিতেন না। চাপিয়া রাখা রোগটা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না। তাই তাঁহারা কড়াক্রান্তিতে পর্য্যন্ত উপনীত হইতেন। তাই তাঁহাদের এত দূরগামিতা।

অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর এই কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার আরো অনেক প্রমাণ পাইবে। এই জিনিষটা অস্পৃশ্য, এই ব্যক্তিটা অস্পৃশ্য, ইহাকে স্পর্শ করিয়া জলপান করিতে নাই, উহার স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা অনুচিত, ঐ লোকটার ছায়া মাড়াইলে নাইতে * হয়, পত্নীকে পুত্রের মাতা বলা হইবে না পুত্রের প্রসূতি বলিতে হইবে—এইরূপ বহুতর শাসন ও সংস্কারের কতকগুলিতে বিশিষ্ট যুক্তি আছে, আবার কয়েকটিতে কড়াক্রান্তির পরিমাণ কিছু বেশী আছে। অতএব কতকগুলি নির্দ্দোষ, কতকগুলি দোষাবহও বটে। কোন্ গুলি নির্দ্দোষ কোন্ গুলি দোষাবহ তাহার বিচার এস্থানে করিতে পারি না। কিন্তু একথা বলিতে পারি যে তন্মধ্যে যে গুলি অপকারজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে গুলিও হিন্দুর প্রকৃতিগত কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতারই ফল, আধ্যাত্মিক বাবুগিরি বা অন্য কোন ব্যাধির লক্ষণ বা অভিব্যক্তি নয়।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার অর্থ—ঊর্দ্ধদিকেই বল, নিম্ন দিকেই বল, কোন দিকেই কিছুমাত্র ছাড়িয়া না দেওয়া। এই কথাটা উল্টা-

* স্নান দ্বারা শুচি লাভ করিতে।

ইয়া বলিলেই এইরূপ দাঁড়ায়—উর্দ্ধ দিকেই বল, নিম্ন দিকেই বল সকল দিকেই সমস্তটা গ্রহণ করা। এক কথায়—কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার অর্থ, সমস্ত সমুদায় বা সমগ্র গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওয়া। লয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়ারও সেই অর্থ। অতএব লয়বাদেও যে মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দেশীকৃত বা অভিব্যক্ত কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতায়ও সেই মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দেশীকৃত বা অভিব্যক্ত। এবং লয়বাদও যেমন হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের লক্ষণ কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতাও তেমনি হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মও হিন্দুত্বের লক্ষণ।

পুত্র।

[নিত্যত্বপ্রিয়তা]

লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছি—

"লয় কত সাধনাসাপেক্ষ তাহা বলিয়াছি। কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। অতএব লয় যে শাস্ত্রের চরম কথা এবং লয় যে সমাজের শেষ লক্ষ্য সে শাস্ত্রে এবং সে সমাজে মনুষ্যের ও সমাজের দীর্ঘজীবন যে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ যেখানে দীর্ঘ সাধনা আবশ্যক সেখানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার প্রয়াস স্বভাবতই প্রবল হইবার কথা। আমাদের মধ্যে হইয়াছিলও তাহাই। মনুষ্যের জীবন ও মনুষ্যসমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে বোধ হয় আর কোথাও সেরূপ নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সহিতও ঐ উদ্দেশ্য জড়িত। আমাদের আহ্নিক ক্রিয়াতেও ঐ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত। দীর্ঘ সাধনার জন্য দীর্ঘজীবন এত আবশ্যক বলিয়াই পুরাণে বহুসহস্রব্যাপী তপস্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রজার অকাল মৃত্যু রাজার মহাপাপের ফল বলিয়া উক্ত। ফলতঃ

অসীম সাধন-সাপেক্ষ লয় যেথানে জীবনের চরম উদ্দেশ্য জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্যকতা সেথানে যত অধিক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পারে না। এবং সমাজের ভিতর দিয়া না গেলে যখন লয়ের পথে প্রবেশ করিবার উপায় নাই তখন সমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্যকতাও সেথানে যত অধিক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পারে না* !”

এই কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কারণ এই কথাতে হিন্দুত্বের একটি অতি গুরুতর লক্ষণ নিহিত আছে। মনুষ্যের ও সমাজের দীর্ঘজীবন কামনা অনেকে করিয়া থাকে বটে। কিন্তু হিন্দু ভিন্ন আর কেহই ধর্ম্মের জন্য সে কামনা করে না—অপর সকলে পার্থিব ভোগের জন্য করে। এই প্রভেদে হিন্দুর বিশেষত্ব। আবার ধর্ম্মের জন্য হিন্দুর যে দীর্ঘজীবন কামনা তাহার একটু গূঢ় অর্থ আছে। হিন্দুর চরম উদ্দেশ্য অনিত্যত্ব পরিহার করিয়া নিত্যত্ব লাভ করা। হিন্দু বড় ব্রহ্মপ্রিয়। সেই জন্যই তাহার লয়বাদ। ব্রহ্ম নিত্য, অতএব ব্রহ্মপ্রিয় হইবার অর্থ নিত্যত্বপ্রিয় হওয়া। হিন্দুর এই নিত্যত্ব-প্রিয়তা শুধু যে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিতে দেখা যায় তাহা নয়, তাহার সংসারবুদ্ধিতেও দেখা যায়। সংসারবুদ্ধিতে দেখা যাইবার কারণ এই যে সংসার তাহার মতে ব্রহ্মসাধনার সোপান মাত্র। অতএব ব্রহ্মসাধনায় যখন নিত্যত্বপ্রিয়তা সূচিত বা নিহিত সংসারসাধনায়ও তখন নিত্যত্বপ্রিয়তা সূচিত বা নিহিত থাকা আবশ্যক। আছে কি না দেখা যাউক।

---

* ৪৫ পৃষ্ঠা।

বোধ হয় পৃথিবীতে হিন্দুর ন্যায় পুত্রপ্রয়াসী আর কেহ নাই। পুত্রসন্তান না থাকিলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও হিন্দু অসুখী। হিন্দু যদি সকল সুখের অধিকারী হইয়া এক মাত্র পুত্রসন্তানে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার সুখই অধিকতর অসুখের কারণ হয়। প্রকৃতিপুঞ্জপূজিত কমলার বরাভরণ-ভূষিত অসীমপ্রভাবশালী রাজাধিরাজ রাজ্যেশ্বর পুত্র বিনা সদাই অসুখী, সদাই ম্রিয়মাণ, সদাই শোকসন্তপ্ত—পুরাণাদিতে এমন অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রলাভার্থ কত রাজা কত যাগযজ্ঞ করিতেন, কত দেবার্চ্চনা করিতেন, কত তীর্থদর্শন করিতেন, কত ঋষি তপস্বীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। রাজারাও করিতেন, রাজাদের প্রজারাও করিত। এখনও রাজা প্রজা সকলেই করে। করে না কেবল ইংরাজি-শিক্ষিতেরা। বোধ হয় যে আমাদের ন্যায় পুত্র-পাগ্‌লা জাতি পৃথিবীতে আর নাই, কখনও ছিল না, কখনও হইবে না। এ পুত্রপ্রয়াসের অর্থ কি?

এক অর্থ পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ। শাস্ত্রানুসারে সকলেই তিনটি ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ। পিতৃ-ঋণের অর্থ পিতৃলোকের নিকট ঋণ। এই পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবার অর্থ পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ করা বা পিতৃলোককে জলপিণ্ডাদি দানের উপায় করা। এই পিতৃ-শ্রাদ্ধের দুইটি অর্থ আছে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্রাদ্ধে পারলৌকিক মঙ্গল হয়। অতএব শ্রাদ্ধের এক অর্থ, পিতৃলোকের পার-লৌকিক মঙ্গলসাধন। শ্রাদ্ধের আর একটি অর্থ শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি পাঠ না করিলে বুঝা যায় না। সকলকেই তাহা পাঠ

করিতে অনুরোধ করি। পাঠ করিলে এক অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিতে পাইবে। পিতা বল, মাতা বল, পিতামহ বল, পিতামহী বল, সমস্ত পিতৃলোকের প্রতি, এমন কি সমস্ত পরলোকগত নরনারীর প্রতি এক অপূর্ব্ব স্নেহের, অপূর্ব্ব প্রীতির, অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার, অপূর্ব্ব ভক্তির, অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইবে।

অতএব শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় অর্থ—প্রীতিপূর্ব্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাসহকারে,সকৃতজ্ঞচিত্তে পিতৃলোককে স্মরণ ও অর্চ্চনা করা।

এখন কে বলিবে যে পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করা ও প্রীতিপূর্ব্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তঃকরণে, সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে স্মরণ ও অর্চ্চনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? কিন্তু শুধু আমি সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে ত সে কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না। আমি মরিলেও যাহাতে আমার পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলকার্য্যের ও পূজার্চ্চনার ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় না করিলে আমার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? কর্ত্তব্য কর্ম্ম পুত্রপৌত্রাদি সম্বন্ধেও যেমন, পিতা পিতামহাদি সম্বন্ধেও ত তেমনি। যতদিন বাঁচিয়া আছি শুধু ততদিন পুত্রপৌত্রাদিকে প্রতিপালন করিলেই ত তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না। আমার মৃত্যু হইলে পরও যাহাতে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় বিধান না করিয়া মরিলে তাহাদের সম্বন্ধে আমার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার পরিসমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? সন্তানাদির প্রতিপালন বিষয়ে আমার যে দায়িত্ব আছে তাহা যেমন আমার জীবিত কালের সীমা

অতিক্রম করিয়া থাকে, পিতা পিতামহ প্রভৃতি পিতৃলোকের অর্চ্চনা সম্বন্ধে আমার উপর যে কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম পালনের ভার আছে তাহাও তেমনি আমার জীবিত কালের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে। কৃতজ্ঞতার এত গভীরতা ও এত প্রসার আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় না, হিন্দু শাস্ত্রে আছে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে সন্তানাদিকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবার ও তাহাদের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিবার যেমন বিধি আছে, পিতৃলোকের পারলৌকিক কার্য্য ও পূজার্চ্চনাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবারও তেমনি বিধি আছে। পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য হিন্দুর পুত্রকামনা এত প্রবল। হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের এই এক অর্থ *।

হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের আর এক অর্থ বংশের গৌরব-কামনা। পুংলক্ষণ সম্পন্ন জীব বলিয়াই যে হিন্দুর নিকট পুত্রের এত আদর ও মর্য্যাদা তাহা নয়। এখন অনেক স্থলে তাহাই হইয়াছে বটে। কিন্তু সে কেবল পুত্রত্বের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির অভাবে হইয়াছে। পুত্রের প্রকৃত অর্থ—গুণবান্ পুত্র, কৃতী পুত্র, বংশোজ্জ্বলকারী পুত্র।

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেককুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা॥

---

* হিন্দুরা পুত্রকন্যার মধ্যে যে ইতরবিশেষ করিয়া থাকে, তাহারও প্রকৃত অর্থ এই। সাহেবেরা ও সাহেবশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বলেন, স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণাই তাহার অর্থ এবং সেই জন্যই পুত্রসন্তান হইলে হিন্দুর যত আনন্দ হয় কন্যাসন্তান হইলে তত হয় না। ইটি ছাঁকা সাহেবী ভুল।

গোলাঘরে সারি সারি শূন্য আড়িপ্রায়,
গুণশূন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয় ?
থাকে যদি এক পুত্র সেও বরং ভাল,
নিজগুণে পিতৃনাম করে সে উজ্জ্বল।

(শ্রীতারাকুমার কবিরত্নের হিতোপদেশ, ৪র্থ পৃষ্ঠা।)

চাণক্যশ্লোকে আছে—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

যেরূপ সুগন্ধি পুষ্প-পরিপূর্ণ একটিমাত্র সুবৃক্ষের গুণে সমস্ত বন গন্ধপূর্ণ হয়, সেইরূপ একটি সৎপুত্রের গুণে সমস্ত বংশ গৌরবপূর্ণ হয়।

হিতোপদেশে আছে—

স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।

সার্থক জনম তাঁর, যাহার জনম
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপম।

(তারাকুমার, ৩য় পৃষ্ঠা।)

গুণহীন পুত্র পুত্রই নয়—কিছুই নয়, কেবল কষ্টের কারণ। হিতোপদেশেই আছে—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্॥

বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন সে পুত্রে কি ফল ?
কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল।

দানে তপসি শৌর্য্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ॥

দানে তপে শৌর্য্যে যার নাহি ঘুষে মান,
সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান।

(তারাকুমার, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা।).

চাণক্যশ্লোকে আছে—

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা।

যেরূপ অগ্নিযুক্ত একটি মাত্র কুবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধীভূত হয়, সেইরূপ একটি কুপুত্রের দোষে সমস্ত বংশ কলুষিত হয়।

এমন অসংখ্য শ্লোক আছে। চাণক্য হইতে আর একটিমাত্র দিব—

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রো রবির্দিবসদীপকঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সুপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

যেরূপ চন্দ্র রজনীর দীপস্বরূপ, রবি দিবসের দীপস্বরূপ, ধর্ম্ম ত্রিভুবনের দীপস্বরূপ, সেইরূপ সুপুত্র বংশের দীপস্বরূপ।

এই যে সুপুত্র ও কুপুত্রের প্রভেদ, এ প্রভেদ কেবল হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে, হিন্দুদিগের মধ্যেই আছে; আর কোন শাস্ত্রে নাই, আর কোন জাতির মধ্যে নাই। তাহার কারণ, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুজাতি যাহাকে পুত্রত্ব বলে তাহা আর কোথাও নাই। সেই হিন্দুর প্রকৃত পুত্র, লোকে যাহাকে ধার্ম্মিক ও গুণবান্ বলিয়া ভক্তি করে, যে দানশীল ও পরোপকারী, যে পিতৃ-

পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ দেবসেবা, অথিতিসেবা, সদাব্রত প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়া এবং স্বয়ং নূতন নূতন হিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। হিন্দুর পুত্রত্ব, পিতা বা মাতা বা অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, হিন্দুর পুত্রত্ব সমস্ত বংশের জন্য। এই জন্যই বোধ হয় পৃথিবীতে হিন্দু যত বংশাভিমানী ও বংশানুরাগী আর কেহ তত নয়। এত বংশাভিমানী ও বংশানুরাগী বলিয়া হিন্দুর আত্মাভিমান বা স্বার্থভাব একরকম নাই বলিলেই হয়। হিন্দুর আমিত্ব বংশত্বে বিলীন ও বিলুপ্ত, হিন্দুর আত্মাভিমান বংশাভিমানে পরিণত। এবং বংশাভিমান বা বংশানুরাগরূপ প্রবল ও পবিত্র উত্তেজনায় হিন্দুর মধ্যে শ্রেণী বর্ণ ও অবস্থানির্বিশেষে যত লোকে যত সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও করে, বোধ হয় যে আর কোথাও অপর কোন উত্তেজনায় তত লোকে তত সৎকর্ম্ম করে নাই ও করে না। স্বদেশানুরাগ বা লোকানুরাগ অনেক সৎ-কর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু প্রকৃত বা বিশুদ্ধ স্বদেশানুরাগ ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশেও অতি বিরল। স্বদেশানুরাগ বা লোকানুরাগ অনেক স্থলেই অপ্রকৃত, আত্মানুরাগের আবরণ মাত্র, সৎকর্ম্মের কলুষিত উৎস। এবং প্রকৃত হইলেও তদ্দারা উত্তেজিত হইয়া সৎকর্ম্ম করা অতি অল্প-লোকের পক্ষেই সম্ভব। পুত্র ধার্ম্মিক ও গুণবান্ হইয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে ও পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি রক্ষা করিবে, হিন্দুর এই বাসনা বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের দ্বিতীয় অর্থ।

হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের তৃতীয় অর্থ বংশরক্ষা। পাছে বংশের

নাম ও গৌরব বিলুপ্ত হয়, এই জন্য হিন্দু বংশরক্ষার এত পক্ষপাতী। কিন্তু হিন্দুর বংশের নাম ও গৌরব রক্ষা করিবার ইচ্ছাই বা এত বলবতী কেন? ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে যে সকল তথ্য লাভ করা যায় তন্মধ্যে একটি প্রধান তথ্য এই যে, হিন্দু নিত্যত্বের একান্ত পক্ষপাতী। যাহা অনিত্য, হিন্দুর চক্ষে তাহা অতি হেয়, অতি অকিঞ্চিৎকর, অস্তিত্বহীন বলিলেই হয়। হিন্দুর চক্ষে নিত্য অস্তিত্বই অস্তিত্ব, অনিত্য অস্তিত্ব অস্তিত্বই নয়। নিত্যত্বের এত পক্ষপাতী বলিয়া যাহা অনিত্য হিন্দু তাহাকেও নিত্যের অনুরূপ করিতে যত্নবান্। এ কথার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হিন্দু-জাতির অলৌকিক অস্তিত্বে দেখিতে পাইবে।

পৃথিবীতে যত সভ্য জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দুজাতি অতিশয় প্রাচীন। হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের পর আরও অনেক সভ্যজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। মিশর, আসীরিয়, পারস্য, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সকলেই হিন্দুজাতির পরবর্ত্তী। কিন্তু কতকাল হইল তাহারা সকলেই কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মে, আচারে, সংস্কারে, সামাজিকতায় এখনকার গ্রীক, রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি তখনকার গ্রীক, রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীক রোমক প্রভৃতির অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে, যে হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্ম্মে, আচারে, সংস্কারে, সামাজিকতায় এখনও সে হিন্দু সেই হিন্দু রহিয়াছে—কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত রাজনৈতিক বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন সত্ত্বেও সেই হিন্দু রহিয়াছে। সে হিন্দুর অনেক গিয়াছে সত্য;

রাজশক্তি গিয়াছে, ধর্ম্মবল কমিয়াছে, প্রতিভা হীনপ্রভ হইয়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত হিন্দু আছে, সকলের প্রতি চাহিয়া বল দেখি, এত দিন পরপদানত থাকিয়াও হিন্দুর যে ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিবল, যে বাহুবল, যে মনুষ্যত্ব আছে, ইউরোপের মধ্যেও কয়টা জাতির সে ধর্ম্মবল, সে বুদ্ধিবল, সে বাহুবল, সে মনুষ্যত্ব আছে? রোম কর্ত্তৃক গ্রীস বিজয়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে গ্রীক জাতি কোথায় উড়িয়া গেল। বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম-বিজয়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে রোমক জাতি কোথায় উড়িয়া গেল। আর এই যে আজিকার ইংরাজ জাতি, যাহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া সম্রাজ্য বসাইয়াছে, নিশ্চয় জানিও কাল যদি ইহাদের রাজশক্তি যায়, ইহারা পররাজ্যভুক্ত হয়, ইহাদের রাজনৈতিক স্বাধিনতা অপহৃত হয়, ইহাদের বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে পরশ্ব ইহাদের আর চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। ইহাদের সমাজপ্রণালীতে এমন কিছুই নাই যাহা দেখিয়া বলিতে পারি যে ইহাদের এতটুকু ধুলগুঁড়ি থাকিবে। কিন্তু এই যে এতকালের হিন্দুজাতি, যাহারা এতদিন পরপদানত হইয়া রহিয়াছে, বল দেখি, ইহাদের এখনও যে রকম সমাজশক্তি, ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল ও বাহুবল আছে, আজিকার কয়টা সভ্য ও স্বাধীন জাতির সে রকম আছে? এতবড় যে ইংরাজ রাজা ইঁহাকেও হিন্দুর ধর্ম্মবলের কাছে হারি মানিতে হইয়াছে, বুদ্ধিবল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইয়াছে, বাহুবল লইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে হইতেছে। বল দেখি, এক হিন্দুজাতি ছাড়া আর কোন্ জাতির মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ধানেও

রামানুজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারক জন্মিয়াছে? জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস, মুকুন্দরামের ন্যায় কবি জন্মিয়াছে? গঙ্গেশ, গদাধর, রঘুনাথের ন্যায় নৈয়ায়িক জন্মিয়াছে? তোড়ল মল্ল, মাধব রাও, দিনকর রাওয়ের ন্যায় রাজপুরুষ জন্মিয়াছে? ফলকথা, হিন্দু আপন সমাজপ্রণালীর গুণে যেন নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা নিত্যত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এমনি করিয়া সমাজপ্রণালী বাঁধিয়া গিয়াছেন, যেন সে বন্ধন আর কস্মিন্ কালে খুলিবে না এবং সে সমাজও কস্মিন্ কালে নষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে এরূপ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে তাঁহারা মানবজীবন ও সমাজ উভয়কেই ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। মানবজীবন ও সমাজের নানাবিধ ভিত্তি হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। ধনতৃষ্ণা, বাণিজ্যানুরাগ, প্রভুত্বপ্রিয়তা, সমরস্পৃহা প্রভৃতি মানবজীবন ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ধনতৃষ্ণা বল, বাণিজ্যানুরাগ বল, সকলই পার্থিব ও অনিত্য, একমাত্র ধর্ম্মই নিত্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সেই ধর্ম্মরূপ নিত্য ভিত্তির উপর সমাজ স্থাপন করিয়া সমাজকে নিত্যত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ধনতৃষ্ণা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, সমরস্পৃহা সকলই শক্তি, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সকলই হয় রাজসিক, নয় তামসিক শক্তি। রাজসিক বা তামসিক শক্তি দেখিতে অতিশয় উগ্র, অতিশয় সতেজ বটে, কারণ পার্থিব মোহকর বস্তুই উহার লক্ষ্য। মোহকর বস্তুর অনুধাবনাতেই মানুষ বেশি চঞ্চল, বেশি ব্যস্ত, বেশি উগ্র হইয়া থাকে।

কিন্তু উগ্র ও সতেজ বলিয়াই রাজসিক ও মানসিক শক্তির শীঘ্র লয় হইয়া থাকে। যে জ্বরে শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হয়, সে জ্বর অধিক ক্ষণ থাকে না এবং রোগীকেও অধিক ক্ষণ রাখে না। কিন্তু ধর্ম্ম সাত্ত্বিক শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তির উগ্রতাও নাই, ক্ষয় লয়ও নাই। নিত্যত্বানুরাগী হিন্দুশাস্ত্র-কার হিন্দুসমাজকে নিত্যত্ব দিবেন বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুর জীবনকে ধর্ম্মমুখী করিয়া গিয়াছেন। এবং সেই জন্যই নিত্যত্ব-প্রিয় হিন্দুর স্মৃতিসংহিতাদিতে মনুষ্যের ক্ষণভঙ্গুর দেহ ও ক্ষণস্থায়ী সংসার প্রভৃতি নিতান্ত অনিত্য বস্তুর সংরক্ষণ ও মঙ্গলবিধান পক্ষে যত বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাই, অনিত্য-পার্থিবতাপ্রিয় কোন জাতির শাস্ত্রেই তত দেখিতে পাই না। নিত্যত্বপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্রকারের অনিত্যত্বের এই অপরূপ আদর কেহ লক্ষ্য করিয়াছ কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—ইহার অর্থ, মনুষ্যের অনিত্য দেহ ও অনিত্য সংসার প্রভৃতিকে ধর্ম্মমুখী বা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া উহার ক্ষয়লয়শীলতা হ্রাস করিয়া, তদ্দ্বারা সমাজের নিত্যত্বপ্রাপ্তির বিধান বা সহা-য়তা করা। এই সকল কথার একটি গুরুতর তাৎপর্য্য এই যে, যে ধর্ম্মরূপ সাত্ত্বিক শক্তির সাহায্যে হিন্দুজাতি এক রকম নিত্যজীবন লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই শক্তিই অপর সকল শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে fittest বা যোগ্যতমের survival-এর কথা বলেন, বোধ হয় সেই সাত্ত্বিক শক্তিসম্পন্ন জাতিই সেই যোগ্যতম জাতি। আমাদের সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ করাও উচিত নয় এবং সামাজিক নিত্যত্ব ছাড়িয়া সামাজিক পরিবর্ত্তনশীলতার পক্ষপাতী হওয়াও উচিত

নয়। আমাদের বহুল সংস্কারের প্রয়োজন, কিন্তু নিত্য পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের দিকেও যাওয়া উচিত নয়। আমাদের জীবনের ও সমাজের যেমন পাকা ভিত্তি আছে, আর কাহারও জীবনের বা সমাজের তেমন পাকা ভিত্তি নাই। আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে ভিত্তি ঠিক রাখিয়া করিতে হইবে। নচেৎ ঠকিতে হইবে। আমাদের যেন সর্ব্বদাই এই কথাটি মনে থাকে যে, পৃথিবীতে এক হিন্দু সমাজ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোন সমাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবার লক্ষণ প্রদর্শন করে নাই।

হিন্দুর নিত্যত্বপ্রিয়তার প্রধান প্রমাণ দিলাম। আরও অনেক প্রমাণ আছে, যথা—হিন্দুর স্থপতি ও ভাস্কর কার্য্য। উভয়ই কিছু মোটা, দৃঢ়তাব্যঞ্জক, যেন কতকাল রহিয়াছে, কতকাল থাকিবে। হিন্দুর সূক্ষ্ম শিল্পও আছে। হিন্দুর শাল রুমাল অলঙ্কার পত্র সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শ স্বরূপ; কিন্তু এমনই উপকরণে ও প্রণালীতে প্রস্তুত যে যুগান্তেও যেন তাহার ক্ষয় লয় হয় না। হিন্দুর গৃহসামগ্রী—ঘটি, বাটি প্রভৃতি—কাচ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত নয়, ধাতুনির্ম্মিত, পুরুষানুক্রমে চলিবে। আমাদের পিতা পিতামহাদির আমলের ঘড়া গাড়ু বাটা বাটি ডাবর প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় তাঁহারা বুঝি চারিযুগ ঘরকন্না করিবার নিমিত্ত বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেন। হিন্দুর সকল জিনিষই টেকসই; হিন্দু 'ফঙ্গ' জিনিস দেখিতে পারে না। ইউরোপ 'ফঙ্গ' জিনিষেরই পক্ষপাতী। এমন কি হিন্দুর ঔষধের ফলও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, ইংরাজি ঔষধের ফলের ন্যায়

ক্ষণস্থায়ী নয়। ভাবিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রমাণ পাইবে। এবং হিন্দুর বংশরক্ষার ইচ্ছাও যে সেই নিত্যত্ব-প্রিয়তার প্রমাণ, তাহাও বুঝিতে পারিবে। এবং সাত্ত্বিক শক্তি ভিন্ন যদি নিত্য বা চিরস্থিতি অসম্ভব হয়, তাহা হইলেও কি বলিবে যে হিন্দুর এই বংশরক্ষার ইচ্ছা সাধু ও মহতী ইচ্ছা নয়? বংশের সাত্ত্বিক শক্তি বা পুণ্যের সাহায্যে বংশের স্থিতি বা নিত্যত্বের বিধান করিবার ইচ্ছা হিন্দুর মনে বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুত্রপ্রয়াসের তৃতীয় কারণ।

যে মানুষ হয়, সেই হিন্দুর ন্যায় পুত্র-প্রয়াসী হয়। কারণ সে প্রয়াসও যেমন মহৎ, তাহা সিদ্ধ হওয়াও তেমনি পুণ্য-সাপেক্ষ। যে পুত্র পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে, বংশ আলোকিত ও গৌরবান্বিত করিতে পারিবে ও বংশের ধারা রক্ষা করিয়া প্রকৃত বংশধর হইতে পারিবে, অনেক পুণ্যবল, অনেক ভাগ্যবল থাকিলে তবে সে পুত্রের পিতা হইতে পারা যায়। অভিমন্যুর পিতা হইতে পারে, তত বীরপুরুষ, তত মহাপুরুষের মধ্যে এক অর্জ্জুন ভিন্ন এমন আর কেহ ছিল না। সুপুত্রের পিতা হইতে হইলে দেহ বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য হওয়া চাই, মন বিশাল ও বলশালী হওয়া চাই, হৃদয় উদার হওয়া চাই, ইন্দ্রিয়াদি সংযত হওয়া চাই, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই, পত্নীর লক্ষণাক্রান্তা, পতিব্রতা, পুণ্যবতী হওয়া চাই। সকল স্ত্রীই যে সুপুত্রের জননী হইতে পারেন, তাহা নয়। গালব যখন মাধবীকে রাজা হর্য্যশ্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন তখন রাজা হর্য্যশ্ব এইরূপ কহিয়াছিলেন;—'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকললোকদর্শনীয়া বালার করপৃষ্ঠ,

পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উন্নতি; কেশ, দশন, করপদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা; স্বর, নাভি ও স্বভাবের গম্ভীরতা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমা প্রভৃতি বহুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ইনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত পুত্র প্রসবসমর্থা বলিয়া বোধ হইতেছে—(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ১১৬ অধ্যায়)। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ লক্ষণযুক্তা স্ত্রী লাভ করা সম্পূর্ণরূপে নিজের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই বলিতেছি, অনেক পুণ্যবলে ও ভাগ্যবলে সুপুত্রের পিতা হইতে পারা যায়। প্রভূত শক্তির অধিকারী হইলে তবে তত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারা যায়। দেহ, মন, হৃদয়, সব নিষ্কলঙ্ক রাখা কি সামান্য শিক্ষা, সামান্ত সাধনার কাজ? কোন লোককে বিশেষ গর্হিত কর্ম্ম করিতে দেখিলে এ দেশের লোকে বলিয়া থাকে, উহার বংশ রক্ষা হইবে না। কথাটি বড় সত্য। পিতার পাপ পুত্রপৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া বংশ নষ্ট করে। পিতার বুদ্ধি-শক্তির অভাব হইলে, পুত্রপৌত্রাদি উপার্জ্জনাদি করিতে অক্ষম হইয়া শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে মানুষ কোপন-স্বভাব বা হিংসাপরায়ণ সে স্বল্পায়ু হয় এবং তাহার সন্তানাদিও শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় বা লোকের অপ্রিয় বা অনিষ্টকারী হইয়া যার-পর-নাই হেয় হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কত শক্তিশালী, কত সংযমী, কত পুণ্যবান হইলে তবে সুপুত্রের পিতা, প্রকৃত বংশধরের জনয়িতা হইতে পারা যায়। পিতার প্রকৃত পরীক্ষা পুত্রে। অর্জ্জুন মহাবীর

ও মহাপুরুষ, কিন্তু অভিমন্যুর পিতা না হইলে তাঁহাকে তত বীর তত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত না। আর যে ভাগ্যলব্ধা গৃহলক্ষ্মীর গর্ভে প্রকৃত বংশধরের জন্ম হয় তিনিও ধন্যা। তাই হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব—

এ সকল কথা আমরা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। এ সকল কথা আবার স্মরণ না করিলে আমাদের মঙ্গল নাই। শুদ্ধ এই কথাগুলি স্মরণ ও অনুসরণ করিতে পারিলেও আমাদের অনেক দোষ কাটিয়া যায়। আমরা মানুষ হইয়া যাই, আমাদের সমাজ আদর্শ সমাজ হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব হিন্দুর গৃহ ও সমাজে নিত্যত্বপ্রিয়তা পাইলাম। এ নিত্যত্বপ্রিয়তা যে ধর্ম্মের জন্য, বাহ্য বৈভবের জন্য নয়, তাহাও দেখিলাম। আর বুঝিলাম যে অনিত্যে নিত্যত্বপ্রিয়তা একমাত্র হিন্দু ভিন্ন আর কাহাতেই নাই। অতএব পূর্ণ ও প্রকৃত নিত্যত্বপ্রিয়তা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

---

* গ্রন্থকারের ত্রিধারায় 'বউ কথা কও' নামক প্রবন্ধ দেখ।

আহার।

[সর্ব্বত্র ধর্ম্মদর্শিতা—ফল, আচারানুবর্ত্তিতা]

লয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছি—

"আগাগোড়া এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে—জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে *।"

পৃথিবীতে মনুষ্যের অনেক কাজ আছে, অতএব অনেক উদ্দেশ্যও আছে। বিদ্যাসঞ্চয়, জ্ঞানসঞ্চয়, ধনোপার্জ্জন, পরিবার পালন, দেহ রক্ষা, সমাজসেবা, স্বদেশসেবা, পরহিত সাধন, এইরূপ অনেক কাজ, অনেক উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সকল কাজ অপেক্ষা বড় কাজ, সকল উদ্দেশ্য অপেক্ষা বৃহৎ উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা মুক্তি সাধন। সেই জন্য হিন্দুর মতে মনুষ্যের অপর সমস্ত কাজ অপর সমস্ত উদ্দেশ্য সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ সেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উদ্দেশ্যের অধীন বা অধঃস্থ। অতএব মনুষ্যের অপর সমস্ত কাজ ও উদ্দেশ্য এমন করিয়া সাধিত বা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক যেন তদ্দ্বারা সেই বৃহত্তম কাজ বা উদ্দেশ্যের বিঘ্ন না হইয়া বিশেষ অনুকূলতাই হয়।

---

* ২৫ পৃষ্ঠা।

পার্থিব সকল কাজই এক রকমে করিলে ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টির ও ধর্ম্মচর্য্যার অনুকূল হয় আর রকমে করিলে তাহার প্রতিকূল হয়। পরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা কর দেখিবে তোমার মানসিক প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা কর দেখিবে তোমার মানসিক প্রকৃতি আবিল ও অবিশুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ন্যায়ানুমোদিত প্রণালীতে ধনোপার্জ্জন কর দেখিবে তোমার ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে; লুব্ধের ন্যায় নীতিবিগর্হিত প্রণালীতে ধনোপার্জ্জন কর দেখিবে তোমার ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যের সকল কাজের সহিতই ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। কাজ করিবার প্রণালীর গুণে সকল কাজই ধর্ম্মের অনুকূল হইতে পারে, কাজ করিবার প্রণালীর দোষে সকল কাজই ধর্ম্মের প্রতিকূল হইতে পারে। এই জন্যই মনুষ্যের কোন কাজই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত বিবেচিত হয় নাই এবং সকল কাজ সম্বন্ধেই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা আছে। সেই সকল ব্যবস্থা পালন করিলে মনুষ্যের সকল কাজই ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টির ও ধর্ম্মচর্য্যার অনুকূল হয়। এবং এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের ব্যাপকতা এত বেশী এবং ধর্ম্মের নিমিত্ত আচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা এত অধিক। ধর্ম্মের এই ব্যাপকতা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মের নিমিত্ত আচারানুষ্ঠানের এই প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান এক মাত্র হিন্দু ভিন্ন আর কাহাতেই দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বত্র ধর্ম্মদর্শিতা এবং ধর্ম্মার্থ আচারানুবর্ত্তিতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

আমাদের শাস্ত্রের আচারাধ্যায় অতি বিস্তীর্ণ, কেন না প্রাতঃকৃত্য, স্নান, পান, ভোজন প্রভৃতি মনুষ্যের সমস্ত কাজ সম্বন্ধেই আচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অতএব সমস্ত আচারের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা এরূপ গ্রন্থে অসম্ভব। বড় সৌভাগ্যের কথা আমাদের এক মহাপুরুষ আমাদের সমস্ত আচারপদ্ধতির ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষই এই কঠিন কার্য্য করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সে ব্যাখ্যা এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। কিছুদিন পরে তাহা অবশ্যই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। তখন আমরা আমাদের আচারানুবর্ত্তিতার এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইব। এখন আমি কেবল আহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

আহার সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু আহারে বিচার সকলে করে না। মোটামুটি বলিতে গেলে, আহারে বিচার ইউরোপে নাই, এসিয়াতে আছে। এসিয়াতে মুসলমানের আহারে বিচার আছে কিন্তু হিন্দুর মতন আহারে বিচার আর কুত্রাপি কাহারও নাই। হিন্দুর আহারে এত অধিক বিচার যে ইংরাজি শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে উহাকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং সেই সূত্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব আহারের কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়।

মুসলমান আহারে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু কি পরিমাণ বিচার করেন তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। অনেকে এইমাত্র জানেন যে, মুসলমান কেবল শূকর মাংস

ভক্ষণ করেন না আর সকলই ভক্ষণ করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নয়। শূকর মাংসের ন্যায় আরও অনেক মাংস মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে সকল মাংস মুসলমানের শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাকে 'হালাল' বলে এবং যে সকল মাংস সে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহাকে 'হারাম' বলে। এই হারামের শ্রেণীতে অনেক মাংসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে সকল পশু ও পক্ষী নখ দ্বারা মাংস ধরিয়া চঞ্চু বা দন্ত দ্বারা তাহা ছিঁড়িয়া খায় সেই সকল পশু ও পক্ষীর মাংসই বেশী। কি জন্য এই শ্রেণীর পশু ও পক্ষীর মাংস নিষিদ্ধ হইল মুসলমানের শাস্ত্রে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু বিদ্বান, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুসলমানেরা বলেন, এই শ্রেণীর পশু পক্ষীব মাংস ভক্ষণে এই শ্রেণীর পশু পক্ষীর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা ও বিবেচনায় এই সকল মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে, খাদ্য দ্রব্যের উপর কেবল শরীরের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে না, মানসিক ইষ্টানিষ্টও নির্ভর করে। খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে শারীরিক ইষ্টানিষ্টের বিচার সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু মানসিক ইষ্টানিষ্টের বিচার সকলে করে না। ইউরোপীয়েরা কেবল শারীরিক ইষ্টানিষ্টের বিচার করে, মুসলমানেরা মানসিক ইষ্টানিষ্টের বিচারও করে। খাদ্যের সহিত মানসিক প্রকৃতির সম্পর্ক আছে কি না, ইহা স্বতন্ত্র কথা। প্রমাণ ও বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু যাহারা কেবল শারীরিক ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা শরীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করে তাহারা যে অধিক বা উৎ-

কৃষ্টতর অধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। এবং প্রকৃত পক্ষেও দেখা যায় যে ইউরোপীয়ের অপেক্ষা মুসলমানের ধর্ম্মপ্রবণতা অনেক বেশি।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের বিচারের যেরূপ প্রণালী ও প্রকৃতি তদ্রূপ আর কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। দেহরক্ষার নিমিত্ত আহার, এ কথা অন্যান্য শাস্ত্রেও যেমন আছে হিন্দু-শাস্ত্রেও তেমনি আছে। কিন্তু আহার দ্বারা দেহ রক্ষা না করিলে পাপ হয়, এ কথা বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। ইহার কারণ এই যে হিন্দুশাস্ত্র মতে শরীরধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা। অনাহারে শরীর ক্লিষ্ট হইলে ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হয়; অতএব শরীর রক্ষার্থ আহার না করিলে পাপ হয়। এই জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাংচৈবান্তঃ শরীরস্থঃ তান্ বিদ্ধ্যসুরনিশ্চয়ান্॥ (১৭—৬)

যে শাস্ত্রে দেহরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা সে শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ বিচার থাকাই সম্ভব। এবং সে বিচার যে মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া করা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছেও তাহাই। হিন্দুশাস্ত্র মতে আহার তিন প্রকার— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। গীতায় লিখিত আছে—

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। (১৭—৭)

কিরূপ আহার সাত্ত্বিকস্বভাব ব্যক্তির প্রিয়, অর্থাৎ সাত্ত্বি-কতার অনুকূল, কিরূপ আহার রাজস ব্যক্তির প্রিয়, অর্থাৎ

রাজসিকতার অনুকূল, এবং কিরূপ আহার তামসস্বভাব ব্যক্তির প্রিয়, অর্থাৎ তামসিকতার অনুকূল,ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সে বর্ণনা এ স্থলে উদ্ধৃত করিবারর প্রয়োজন নাই। এখন সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতা কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি। সাত্ত্বিকতার অর্থ উচ্চ বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতা, রাজসিকতার অর্থ অনতিবিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতা মিশ্রিত পার্থিবতা বা ভোগপরায়ণতা, তামসিকতার অর্থ অধর্ম্মপরায়ণতা বা হীনতাপ্রিয়তা। অতএব সাত্ত্বিক আহার অর্থাৎ উচ্চ বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতার অনুকূল যে আহার হিন্দু শাস্ত্রে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অপর দুই প্রকার আহার নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহারের এরূপ শ্রেণী বিভাগ, মনুষ্যের মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট বিবেচনায় আহারের এরূপ তারতম্য বিধান, এক হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রে নাই—কেবল কোম্‌তের শাস্ত্রে ইহার একটু আভাষ আছে।* হিন্দুশাস্ত্রের আহারতত্ত্ব হিন্দু-

* "*The Woman.*—Your definition of religion will satisfy me completely, my father, if you can succeed in clearing up the serious difficulty which seems to me to arise from its too great comprehensiveness. For in defining our unity, you take in the physical as well as the moral nature. They are, in fact, so bound up together that no true harmony is possible if you try to separate them. And yet I cannot accustom myself to include health under religion, so as to make moral science, in its full conception, extend to medicine.

The Priest.—And yet, my daughter, the arbitrary separation which you wish to perpetuate would be di-

ধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির অতুলনীয় আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব লক্ষণ। এ লক্ষণ অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। অন্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য বুঝিতে হইলে, অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এই লক্ষণটির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, আহার বা খাদ্য দ্রব্যের উপর মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে কি না। এ প্রশ্নের মীমাংসায় আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিশেষ সহায়তা করে না। সহায়তা করিতে পারে না বলিয়া সহায়তা করে না। কোন্ দ্রব্য আহার করিলে শরীরের কোন্ উপাদান ক্ষয় হয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ রূপে না হউক কিয়ৎ পরিমাণে বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু কোন্ দ্রব্য আহার করিলে ক্রোধ বৃদ্ধি হয়, কোন্ দ্রব্য আহার করিলে ক্রোধ কমিয়া যায়. ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহার কিছুই বলিতে পারে না। সে বিজ্ঞানে জড়ের জড়ক্রিয়ারই আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, জড়ের জড়াতীত ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে দেহ ও মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে খাদ্যদ্রব্যের উপর কেবল

rectly contrary to our unity. It is due solely to the inadequacy of the last provisional religion, which could not discipline the soul save by giving into profane hands the management of the body. In the ancient theocracies, the most complete and most durable forms of the supernatural *regime*, this groundless division did not exist; the art of hygiene and of medicine was then always a mere adjunct of the priesthood. Catechism of Positive Religion.

শারীরিক ইষ্টানিষ্ট নয় মানসিক বা আধ্যাত্মিক ইষ্টানিষ্টও নির্ভর করে বলিয়া অনুমান হয় এবং নির্ভর করিবারই কথা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

স্থূলবিজ্ঞান ছাড়িয়া ভূয়োদর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে খাদ্যের উপর যেমন শরীরের তেমনি মনেরও ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। পৃথিবীতে যে সকল জন্তু আছে তাহারা খাদ্য সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত— আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী। আমিষভোজী ও নিরামিষ-ভোজী জন্তুর মধ্যে এই প্রভেদটী প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, আমিষভোজী জন্তু উগ্র ও কোপনস্বভাব, নিরামিষভোজী জন্তু শান্তস্বভাব। পশুর মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তু বড়ই নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, উগ্র ও কোপন-স্বভাব। উহারা পোষ মানে না, উহাদিগকে কোন হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায় না। উহারা কেবল ধ্বংস কার্য্যেই নিযুক্ত এবং উহাদের আয়ু বড় দীর্ঘ হয় না। অপর পক্ষে, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ যাহারা উদ্ভিদভোজী, তাহারা বড়ই ধীর ও শান্ত। তাহারা মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নানা-বিধ কল্যাণকর কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা অরণ্যে থাকি-লেও সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী পশুর ন্যায় আপনাকে আপনি লইয়া থাকে না, দলবদ্ধ থাকিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সমাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাহারা সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ধ্বংসপ্রিয় নয়। এবং মোটামুটি বলিতে গেলে, তাহারা সিংহ ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশু অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

সেইরূপ পক্ষীর মধ্যে যাহারা মাংসাশী—যথা, কাক, চিল, শকুনী, হাড়গিলা, ইত্যাদি—তাহারা বড়ই নিষ্ঠুর, দুর্বৃত্ত, উগ্র, কোপন-স্বভাব ও কলহপ্রিয় এবং তাহাদিগকে পোষ মানান যায় না। তাহাদের স্বরও বড় কর্কশ। অপর পক্ষে, যে সকল পক্ষী মাংসাশী নয় তাহারা কি সুকণ্ঠ, কি শান্তস্বভাব, কত পোষ মানে, লোকালয়ে আসিয়া মানুষের কতই আনন্দবর্দ্ধন করে এবং অরণ্যে থাকিয়া প্রকৃতির কি শোভা সম্পাদন করে! তাহারা মাংসাশী পক্ষিদিগের ন্যায় একলা একলা ভীষণ নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া অরণ্যে, উদ্যানে, সুনীল সৌন্দর্য্যময় আকাশে, সুবিস্তীর্ণ নদী-সৈকতে ঝাঁকে ঝাঁকে খেলিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। এবং বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে যত দীর্ঘজীবী পক্ষী আছে মাংসাশী পক্ষীদিগের মধ্যে তত দীর্ঘজীবী পক্ষী নাই। আবার জলচর জন্তুদিগের মধ্যে কুম্ভীর, হাঙ্গর, চিতল, বোয়াল, শোল প্রভৃতি যাহারা মাংস ও মৎস ভক্ষণ করে তাহারা যত নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, উগ্র ও কোপন-স্বভাব হইয়া থাকে, রোহিত কাতলা প্রভৃতি যে সকল জলচর মাংস বা মৎস্য আহার করে না তাহারা তাহার একশতাংশও হয় না। অধিকন্তু হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি জলচরেরা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী স্থলচরদিগের ন্যায় একা একা থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু রুই কাতলা প্রভৃতি নিরামিষভোজী জলচরেরা, গোমহিষাদি নিরামিষভোজী স্থলচরদিগের ন্যায়, দলবদ্ধ থাকিয়া যেন সমাজধর্ম্মের প্রতি অনু-রাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। সর্ব্বশেষে মনুষ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে মাংসাশী মনুষ্য যেমন

স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, ধ্বংসপ্রিয়, উদ্ধত, উগ্র ও কোপনস্বভাব হইয়া থাকে, নিরামিষভোজী মনুষ্য তেমন হয় না। নিরামিষভোজী মনুষ্য প্রায়ই শান্ত-শিষ্ট ও সুশীল হইয়া থাকে। মাংসাশী মনুষ্য যত যুদ্ধ, কলহ ও জীবক্ষয় করিয়াছে, নিরামিষভোজী মনুষ্য তাহার এক-শতাংশও করে নাই। মাংসাশী মনুষ্যে দুষ্প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—"আজ ফ্রান্স জর্ম্মানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জর্ম্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পরশু বুল্‌গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন।" কিন্তু আজ বলিয়া নয়, ইউরোপে চিরকালই এই হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি চলিতেছে। প্রাচীন গ্রীকেরাও ইহা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমকেরাও ইহা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য এ সকল হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি হইয়াছে ও হয় বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেটা কথার কথা মাত্র। দুষ্প্রবৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ এইরূপ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। নিরামিষভোজী হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি কখন দেখা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু এক ন্যায় যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের মধ্যে অপর সকল যুদ্ধই নিন্দনীয়। এবং তাহারা কখনই আপন সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য বা সমর-পিপাসা মিটাইবার জন্য কালান্তকের ন্যায় মানবকুল ক্ষয় করিতে স্বদেশ হইতে বহির্গত হয় নাই। মাংসাশী

মনুষ্য এতই নিষ্ঠুর যে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য জীবন্ত মনুষ্যকে পোড়াইয়া মারিয়াছে এবং নিরপরাধ মনুষ্যের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। মাংসাশী স্থলচর ও জলচরের ন্যায় মাংসাশী মনুষ্য মধ্যেও সামাজিক-ভাব বড় দুর্ব্বল। ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যে সকল অকথ্য অত্যাচার হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে, এই সামাজিক ভাবের দুর্ব্বলতা তাহারও একটি কারণ। এই সামাজিক ভাবের দুর্ব্বলতা হইতে ইউরোপে ইদানীন্তন আত্ম-নির্ভর (self reliance) বাদের এতই বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে তথায় দারিদ্র্য দুঃখের পরিমাণ অপরিমেয় হইয়া উঠিয়াছে এবং দরিদ্রের দুঃখ যথার্থই অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই সামাজিক ভাবের দুর্ব্বলতা বশতঃ ইউরোপে আজকাল ব্যক্তিগত-স্বাধীনতার স্পৃহা এতই প্রবল হইয়াছে যে. বোধ হয় যে তথায় শীঘ্র এক অতি শোচনীয় সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইবে। অনেকে মনে করেন যে ইউরোপের এই আত্মনির্ভরবাদ বা ব্যক্তিগত-স্বাধীনতাবাদ বুদ্ধি বিকাশের ফল। আমরা মনে করি, অন্যান্য অনেক মত যেমন হৃদয়ের ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধি দ্বারা কেবল মাত্র সমর্থিত বা সাজান হয়, ইউরোপের এই সকল আধুনিক মতও তেমনি ইউরোপের সামাজিক ভাবের খর্ব্বতা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইউরোপের প্রবল বুদ্ধি দ্বারা সাজান হইতেছে।

আহারের সহিত মানসিক ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধের প্রধান প্রমাণ দিলাম। তৎসম্বন্ধে আরো কিছু বলা যাইতে পারে। আহারে পলাণ্ডু ব্যবহার করিলে, শরীর ও মনের প্রশান্ত

ভাবের কিছু ব্যতয় হয়, ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং পলাণ্ডুরসপ্লাবিত মাংসাহারে মস্তিষ্ক যে ধূমময় হইয়া উঠে এবং সমস্ত আভ্যন্তরিক মনুষ্যটা স্থূল বা মোটা (coarse) হইয়া পড়ে, ইহাও আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধিক মৎস্য ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, কামরিপু ভয়ানক উত্তেজিত হয়। সুরা সেবনের ত কথাই নাই। তাহাতে দেহ মন হৃদয় সমস্তই বিষম বিকারগ্রস্ত হয়। যাহারা রিপুসেবার জন্য উন্মত্ত বা দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত তাহারা অগ্রে মদ্য মাংস দ্বারা উদর পূরণ করিয়া লয়।

এই সকল কথা আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলায় ক্ষতি নাই।

মনের সহিত দেহের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সে সম্বন্ধ আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আহারের তারতম্য বা ভিন্নতা অনুসারে আমরা কেবল যে শারীরিক অবস্থার ভিন্নতা অনুভব করি তাহা নয়, মানসিক অবস্থার বিভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। ফলতঃ আমাদের মানসিক অবস্থা যে বহুল পরিমাণে শারীরিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আহারের ফলে উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকলেই জানেন যে সে বিকৃতি শুধু শরীরে সম্বদ্ধ না থাকিয়া মন পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। উদরাময় বল, শিরঃপীড়া বল, শারীরিক যে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয়

বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শান্তি, স্থৈর্য্য প্রভৃতি স্বল্লাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি সে সমস্তের গুণ সমান নয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণাগুণের যে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। আমরাও নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু বায়ু পিত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবস্থারও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে মানসিক উগ্রতা ও চঞ্চলতা জন্মে, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবসাদ ও আচ্ছন্নতা হইয়া থাকে। এ সকল নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সকল অতি স্থূল কথা—ইহার সূক্ষ্মতত্ত্বও আছে। তদালোচনায় আমি সম্পূর্ণ সমর্থ নহি। যাঁহারা সমর্থ তাঁহাদিগের নিকট সে তত্ত্ব শিখিতে হইবে। কিন্তু যে স্থূলতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত কেবলমাত্র তদ্দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায় যে আহার ভেদে মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। আহারবিশেষে রাগদ্বেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট নয়। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল বা মনের শান্তি স্থৈর্য্য প্রভৃতির অভাব সেখানে ধ্যান ধারণা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মচর্য্যায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিত্তস্থৈর্য্য ও চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। অতএব যে আহার চিত্তস্থৈর্য্য ও চিত্তশুদ্ধির বিরোধী সে আহার ধর্ম্মচর্য্যারও

বিরোধী। যাহা ধর্ম্মচর্য্যার বিরোধী তাহা আত্মারও বিরোধী। ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। এবং এই জন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন। অথবা শুধু ইহাই কেন বলি—সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া প্রাতঃস্নান প্রাণায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্যবর্দ্ধক আচার ও প্রক্রিয়াগুলিকে আমাদের নিত্যধর্ম্মানুষ্ঠানের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ করিয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিবেন যে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকেই আহার করিয়া থাকে। তবে আর হিন্দুর আহার সম্বন্ধে এত কথা কেন? কথা এই জন্য যে অনেকে আহার করিয়া দেহের স্বাস্থ্যলাভ করিলেই আহার সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্য করা হইল মনে করে। আহার দ্বারা মানসিক বিকার হইতেছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করে না। আহার করিয়া দেহের বল বাড়িলেই হইল—কামক্রোধাদি বাড়িল কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি একেবারেই অনাবশ্যক। আহারে শরীরের পীড়া না হইলেই আহার উত্তম হইল, স্বাস্থ্যকর হইল; আহারে মনের পীড়া হইল কি না তাহা দেখিবার দরকারই নাই, সে কথা মনে উঠিবেই বা কেন? আহার সম্বন্ধে ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির এই সংস্কার। অতএব তাঁহারা স্বাস্থ্যকর আহারের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাদের আহারতত্ত্ব হিন্দুর আহারতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেহের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আহার এবং দেহ ও মন

উভয়ের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আহার এই দুই আহার সর্ব্বথা সমান হয় না, সকল সময়ে সমান হইতে পারেও না। অতএব হিন্দুর আহারতত্ত্ব বিশেষ করিয়া বলিবার ও বুঝিবার কথাই বটে।

অতএব আহারের উপর যে কেবল শরীরের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে না, মনের ইষ্টানিষ্টও নির্ভর করে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যে আহারে কামক্রোধাদি রিপুর অসঙ্গত উদ্রেক হয়, স্বভাব রুক্ষ উগ্র বা উদ্ধত হয়, চিন্তাশক্তি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, মানসিক ধাতু মোটা হইয়া যায়, চিত্ত যেন কেমন এক রকম আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, দেহ এবং মনের চিরনির্ম্মলতা ও চির ফুল্লতা নষ্ট হইয়া উভয়ই আবিল ও অবসাদগ্রস্ত হয়, সে আহার সাত্ত্বিকতার বিরোধী। যেখানে শরীর যত দূর সম্ভব সুস্থ ও বলিষ্ঠ এবং পীড়াজনিত যন্ত্রণা ও বিকার যত দূর সম্ভব কম, যেখানে মন চিরপ্রফুল্ল এবং রিপু সকল সুসংযত, যেখানে চিত্ত সদাই স্নিগ্ধ নির্ম্মল ও প্রশান্ত,যেখানে চিন্তাশক্তি সদাই অপ্রতিহত ও অবিকৃত, যেখানে হৃদয় শান্ত পবিত্র মোহমুক্ত ও আক্ষেপ শূন্য সেই খানেই সাত্ত্বিকতার আবাস, অন্যত্র নয়। কেবল সাত্ত্বিক আহারেই যে সে আবাস প্রস্তুত হয় তাহা নয়। সে আবাস প্রস্তুত করিতে আরও অনেক দ্রব্য আবশ্যক। কিন্তু আরও অনেক দ্রব্য যেমন আবশ্যক, সাত্ত্বিক আহারও তেমনি আবশ্যক। না, ঠিক তাহা নয়। সে আবাস প্রস্তুত করিতে অন্য দ্রব্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক আহার বেশি আবশ্যক। কারণ সাত্ত্বিক আহার সে আবাসের ভিত্তি স্বরূপ। আহারে যথেচ্ছাচারী হইয়া কোন মতেই সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। কি এসিয়া, কি ইউরোপ, কি আমে-

রিকা যেখানেই প্রকৃত সাত্ত্বিকতা, সেই খানেই আহারে বিচার, ভোজনে সংযম।

আহারে বিচার সকল শাস্ত্রেই আছে,সকল লোকেই করে। এমন কি, মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট জন্তুগণও আহারে বিচার করে। পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে না, কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে, কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। যে সকল দ্রব্য তাহাদের শরীরের অনিষ্টকর, তাহারা তাহা ভক্ষণ করে না। ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া যে ভক্ষণ করে না তাহা নয় বটে, সহজাত সংস্কার বশে ভক্ষণ করে না। তথাপি কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না ত বটে। অতএব শরীরের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া আহারে বিচার করা খুব প্রয়োজন হইলেও তাহা যে খুব একটা মহত্ত্বসূচক বা বিশেষ আধ্যাত্মিক-শক্তি-সূচক কার্য্য তাহা নয়। কিন্তু মনের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া, মানুষের সাত্ত্বিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া আহারে বিচার করা যথার্থই অলৌকিক মহত্ত্বের কাজ, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ। জগতে সে কাজ হিন্দু ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে নাই। আহারে আধ্যাত্মিকতা, আহারে ধর্ম্ম, জগতে হিন্দু ভিন্ন আর কেহ এ কথা বলিতে পারে নাই। তাহার কারণ, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব কি, জগতে হিন্দু যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমন বুঝে নাই। আহারে সম্যক্ বিচার না করিলে সাত্ত্বিকতা লাভ করা যায় না, প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না, হিন্দুশাস্ত্রের এই শিক্ষা। এ শিক্ষা কুশিক্ষা নয়, এ শিক্ষা কুসংস্কার নয়। এ বড় ঢগূ

শিক্ষা, এ বড় আশ্চর্য্য শিক্ষা, এ বড় মহৎ শিক্ষা। এ শিক্ষা ভুলিলে বা ছাড়িলে, হিন্দুকে হাড়ী হইয়া যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিক জগতের বড় উচ্চ স্তর হইতে বড় নিম্ন স্তরে নামিয়া পড়িতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সকল দ্রব্যই মানসিক প্রকৃতির অনিষ্টকর না হইতে পারে। ভুল ভ্রান্তি সকল শাস্ত্রেই আছে, হিন্দু-শাস্ত্রেও থাকিতে পারে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনটী ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয়, তবে সে দ্রব্যটী ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানীও নষ্ট হইবে না, তোমার হিন্দুনামে ও কলঙ্ক পড়িবে না। কিন্তু যদি আহারে বিচার একেবারেই পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তুমি আর হিন্দু থাকিবে না, তোমার হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া যাইবে। এ দ্রব্যটী ভক্ষণ করিলে বা ও দ্রব্যটী ভক্ষণ করিলে হিন্দুয়ানী না যাইতে পারে কিন্তু ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার না করিলে নিশ্চয়ই হিন্দুয়ানী যাইবে। কারণ ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার, ধর্ম্মের জন্য আহারে বিচার, হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ এবং কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মেরই লক্ষণ। পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মের এ লক্ষণ নাই। এই লক্ষণটী হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও বিশেষত্বের একটী প্রধান কারণ। যদি হিন্দুধর্ম্মের এ লক্ষণটী পরিত্যাগ কর তবে তোমার হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইবে, তোমার হিন্দু নামেও কলঙ্ক পড়িবে, বোধ হয় তোমার হিন্দু নামও বিলুপ্ত হইবে। ইটী খাইলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক উটী খাইলে জাতি যায়, হিন্দু শাস্ত্রের এই যে শাসন আছে ইহা কুসংস্কারের কুউক্তিও নয়, লোভপরবশ পুরোহিতের প্রতারণা বাক্যও নয়। ধার্ম্মিক

হইবার জন্য, সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য আহারে বিচার কত আবশ্যক ইহা যিনি কিছুমাত্র বুঝেন বা উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই এরূপ শাসনের প্রয়োজনীয়তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

আহারের প্রথম উদ্দেশ্য দেহের পুষ্টিসাধন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আত্মার শক্তিবর্দ্ধন। অতএব যে আহারে কেবল প্রথম উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা মনুষ্যের পক্ষে নিকৃষ্ট আহার, যে আহারে কেবল দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাও নিকৃষ্ট আহার, যে আহারে উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট বা উত্তম আহার। ইন্দ্রিয়াদি আত্মার সমস্ত শারীরিক বিঘ্ন নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা দিনান্তে একবার অথবা সপ্তাহে একবার বা দুইবার মাত্র অতি অল্প লঘু আহার দ্বারা দেহকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের আহারের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আত্মার শক্তিবর্দ্ধন। সেরূপ আহারে আত্মার শক্তি প্রকৃতপক্ষে বর্দ্ধিত হয় কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা যে হ্রাস বা নষ্ট হইয়া যায় তাহা নিশ্চয়। মানবজীবনের কোন অবস্থায় সেরূপ আহার বিহিত বা হিতকর হইতে পারে কি না সে বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিহিত বা হিতকর হইলেও যে অবস্থায় উহা বিহিত বা হিতকর হইতে পারে তাহা মনুষ্যের সাধারণ অবস্থা নয়। অধিকন্তু গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকে মনুষ্যের বিশিষ্ট পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং জ্ঞানমার্গাবলম্বী যোগীর পক্ষেও যে কর্ম্ম অনাবশ্যক নয় তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। অতএব যে আহার দেহকে জীর্ণ শীর্ণ শক্তিহীন করিয়া মনুষ্যকে কর্ম্ম

করিতে অক্ষম করে তাহা আত্মার শক্তিবর্দ্ধক হইলেও খুব উৎকৃষ্ট আহার নয়।

কেবলমাত্র দেহের পুষ্টিসাধনার্থ আহার করা অকর্ত্তব্য, এসংস্কার ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও কখন দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষেও এ সংস্কার এখন পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার ও প্রবল নাই। কি জন্য আহারে বিচার করিতে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা এখন জানেন না। শাস্ত্রে বলে আহারে বিচার আবশ্যক, তাই তাঁহারা আহারে বিচার করেন। শাস্ত্রে কেন আহারে বিচার করিতে বলে তাহা তাঁহারা জানেনও না, কেহ তাঁহাদিগকে বলিয়াও দেয় না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে তাহা জানেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই লোক-সাধারণকে বলিয়া দেন না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের লোকশিক্ষা প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। প্রতি গৃহে এখন আহার সম্বন্ধে সৎশিক্ষা দিতে হইবে। নহিলে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া আহারে অনাচারী হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারাও শুদ্ধাচারী হইবেন না এবং যাঁহারা শাস্ত্রার্থ না বুঝিয়া কেবল শাস্ত্রের শাসনে বা সমাজের ভয়ে আহারে শুদ্ধাচারী আছেন তাঁহারাও ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অনাচারী হইয়া উঠিবেন। এই শিক্ষা, গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভাল হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি এ শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই এ শিক্ষা দিতে হইবে। আহার সম্বন্ধে সুশিক্ষা লাভ করিয়া আপন গৃহমধ্যে তাহা প্রচার করা এবং গৃহের সমস্ত ব্যক্তিকে তাহার অনুবর্ত্তী করা প্রত্যেক গৃহকর্ত্তার এখন গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করেন আহারের সহিত মন ও চরিত্রের সম্বন্ধ তাঁহারা একেবারেই স্বীকার করেন না। সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার তাঁহাদের বিশিষ্ট কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীরা অস্বীকার করেন বলিয়া তাঁহারাও অস্বীকার করেন। অধিকন্তু তাঁহাদের অস্বীকার করিবার একটি অতি লজ্জাকর কারণ আছে বলিয়াও আমার মনে হয়। তাঁহারা বড় অসংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সংযমশিক্ষা একেবারেই হয় না। এইজন্য তাঁহারা প্রায়ই সম্ভোগপ্রিয়, ভোগাসক্ত হইয়া থাকেন। শুধু আহারে নয়, ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্য্যেই তাঁহারা কিছু লুব্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু মোহাচ্ছন্ন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে লোভপরবশ হইয়া গোমাংস, শূকরমাংস, মুর্গী মাংস প্রভৃতি নানাবিধ মাংস ভক্ষণ করেন, অতি অল্পসংখ্যকই দেহের পুষ্টিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করেন, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহারা লুব্ধ বলিয়াই গুরুজনের মতে যাহা অখাদ্য তাহা গুরুজনের কথা না মানিয়া গুরুজনের মনে ব্যথা দিয়া ভক্ষণ করেন। তাঁহারা লুব্ধ বলিয়াই যেখানে গুরুজনের শাসন অনতিক্রমণীয় সেখানে লুক্কাইত ভাবে গৃহের বাহিরে গিয়া নীচপল্লীতে নীচশ্রেণীর মুসলমান হোটেলওয়ালার নীচতাপূর্ণ ক্ষুদ্র থাপ্‌রেলের ঘরে বসিয়া চপ্‌ কট্‌লেট ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। নৈতিক অবনতির একশেষ না হইলে লোকে আহারে এত লুব্ধ হয় না। লুব্ধ হইয়া যে আহার করা যায় তদপেক্ষা অপকৃষ্ট আহার আর নাই। কেবলমাত্র দেহের পুষ্টিসাধনার্থ যে আহার তাহা অপকৃষ্ট বটে। কিন্তু তাহা

লুব্ধের আহারের ন্যায় অপকৃষ্ট নয়, তাহা লুব্ধের আহার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। দেহের পুষ্টিসাধনার্থ যে আহার তাহারও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য খুব উত্তম না হউক খুব অধমও নয়। সে উদ্দেশ্য মনুষ্যেরই হইতে পারে, মনুষ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীর হইতে পারে না ও নাই। কিন্তু লুব্ধের আহারে কি উত্তম কি অধম কোন উদ্দেশ্যই নাই। পশুর আহারের ন্যায় সে আহার কেবলমাত্র লোভজনিত। সুন্দর শ্যামল শীতল শষ্প দেখিয়া যে গরু দড়িদড়া ছিঁড়িয়া তাহা খাইতে ছোটে এবং পলাণ্ডুপীড়িত চপ্ কট্‌লেটের সৌরভে সংসারের সারাৎসার আঘ্রাণ করিয়া যে স্বল্পশিক্ষিত বাবু লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া বাবুর্চী বাহাদুরের খাপ্‌রেল খচিত মুর্গী-মণ্ডপাভিমুখে ছোটেন সে গরু আর সে বাবুর মধ্যে বড় একটা ব্যবধান নাই। যে ব্যবধান আছে তাহা বাবুর পক্ষেই দুরপনেয় কলঙ্কের ব্যবধান। অনেক ইংরাজিশিক্ষিতের আহার সম্পূর্ণ পাশব আহার। লুব্ধ বলিয়া তাঁহারা আহারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া থাকেন।

বড় সুখের বিষয় আজ কাল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের মধ্যে আহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইতেছে—অনেকে শাস্ত্রোক্ত আহারতথ্য বুঝিয়া আপন আপন আহার-প্রণালী সংশোধিত করিতেছেন। এইরূপে আহারে সংযম ও সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি হইলে সমস্ত চরিত্রে সংযম ও সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি হইবে। এবং তাহা হইলে সমাজে অল্পে অল্পে সন্নীতির প্রসর বৃদ্ধি হইবার প্রশস্ত উপায় হইয়া যাইবে। আহার বিহার পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখন যে লোভাধিক্য জন্মি-

য়াছে তাহা সাত্ত্বিকতার বিষম বিরোধী, তাহাতে নীতিহীনতার ঐকান্তিক অভাব বুঝায়। এই লুব্ধের ভাবে আর পাশবভাবে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আর যত দিন এই প্রভেদাভাব থাকিবে তত দিন শত চেষ্টা সত্বেও আমাদের মধ্যে সাত্বিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্রেক হইবে না। আহারে লুব্ধ হওয়া দোষ বলিয়া আমি এমন কথা বলি না যে পলান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল খাদ্য পরিহার করিতে হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে আহার্য্য রুচিকর ও স্পৃহনীয় না হইলে আহারের সম্যক্ ফললাভ করা যায় না। কিন্তু আহার্য্যে স্পৃহাবান্ হওয়া এক, আহার্য্যে লুব্ধ হওয়া আর। ভাল আহার্য্য পাও, স্পৃহাবান্ হইয়া ভক্ষণ কর; না পাও, অসুখী বা অসন্তুষ্ট হইও না। ভাল আহার্য্য ভক্ষণ করিতে না পারিলে যে অসুখী বা অসন্তুষ্ট হয় সে লুব্ধ, তাহার আহার পাশব আহার। দেবীচৌধুরাণী অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও 'লুণ লঙ্কা ভাত' খাইয়া আহারে সংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন। সকলেরই সেরূপ করা কর্ত্তব্য। ইংরাজিশিক্ষিতদিগের মধ্যে আহারাদিতে যে লুব্ধ বা পাশব ভাব জন্মিয়াছে তাহা উন্মূলিত করিতে না পারিলে তাঁহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। ঐ ভাব দূরীকরণই নব্য সমাজের সংস্কারকার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। নহিলে সংস্কারের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইবে। এবং প্রতি গৃহে শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ভাব দূর করিবার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হইবে, সভা-সমিতির চেষ্টায় ও ভাব দূর হইবার নয়। আশৈশব অভ্যাসজাত শিক্ষা ব্যতীত সংযম ও সাত্বিকতা সঞ্চয় করা যায় না। সৎস্বভাব ও স্বচ্চরিত্র

সভাসমিতির সরু ও সৌখীন শাসনে পাওয়া যায় না, কঠোর সাধনায় পাইতে হয়।

যে আহারে দেহ মন দুইয়েরই পুষ্টি হয় তাহাই উৎকৃষ্ট আহার। কোন্ কোন্ দ্রব্যে এই উভয়বিধ পুষ্টি হয় তাহা এ স্থানে [illegible] ণ করা যাইতে পারে না। এ স্থানে মোটামুটি দুইটি কথা [illegible] বলিবে। একটি কথা এই যে, নিরামিষ আহারে [illegible] রই যের [illegible] আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় [illegible] বলিষ্ঠ লোকেরা প্রায় নিরামিষভোজী [illegible] যারা আমিষ ভক্ষণ করে তাহারা [illegible] ভক্ষণ করে। তথাকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা স্পূর্ণ [illegible]। বঙ্গের অধ্যাপকাদি পণ্ডিত ও সাধকশ্রেণীর লো[illegible] হবিষ্যাশী। এবং এই সকল হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগ[illegible] রীরিক ও মানসিক বলে এখনও বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। নব[illegible] মধ্যে যাঁহারা অধিক মাংসাহার করিয়া থাকেন তাঁহারা এই সকল হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় ধর্ম্মশীলও নন, ব্যাধিশূন্যও নন, দীর্ঘজীবী ও নন। আহারে দণ্ডেক কাল বিলম্ব হইলে তাঁহারা দশ দিক্ অন্ধকার দেখেন, এক দিন উপবাস করিতে হইলে তাঁহারা মৃতকল্প হইয়া পড়েন, অর্দ্ধক্রোশ পথ হাঁটিতে হইলে তাঁহারা শিরে অশনিপাত হইল মনে করেন। তাঁহাদের এক এক জন এক একটি ব্যাধিমন্দির। আর যদিও তাঁহাদের শরীর সুস্থ হয়, তাঁহাদের মন বড় গরম। ওদিকে অশীতিপর ব্রাহ্মণঠাকুর দিনে দুই চারি ক্রোশ পথ হাঁটেন, দশ জন ছাত্রকে দশ রকম পাঠ দেন, বেলা আড়াই প্রহরের সময় একবার

স্বহস্তপ্রস্তুত হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন, মাসে দশটা উপবাস করেন। আর স্বভাবের সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই—শান্ত, সরল, সাত্বিক, সংযত, বিনয়নম্র। আর একটি কথা এই যে, কামক্রোধাদি রিপু সকল সংযত করিতে পারিলে, দ্বেষহিংসাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আহার, বিহার, নিদ্রা, স্নান, ভ্রমণ, শারীরিক শ্রম প্রভৃতি যথাকালে যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক কথায়, শুদ্ধ সংযতচিত্ত ও সদাচারী হইতে পারিলে আহার্য্য সম্বন্ধে বড় বেশী ভাবিতে হয় না, সাদাসিদে সাত্বিক আহারেই দেহরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়। সময়ে আহার, সময়ে নিদ্রা, সময়ে শয্যাত্যাগ, সময়ে ভ্রমণ এই সকলে শরীর সুরক্ষিত হয়, এই সকল বিষয়ে যথেচ্ছাচারী হইলে মাংসাদি ভক্ষণ করিলেও শরীর রক্ষা হয় না। এই সকল কার্য্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা দেহের যে গুরুতর অনিষ্ট হয় মদ্যমাংসাদি দ্বারা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এবং এই সকল কার্য্যে নিয়মানুবর্ত্তিতার গুণে দেহের যে বলাধান ও প্রফুল্লতা হয় তাহাতে সাদাসিদে সাত্বিক আহার যোগ করিলেই প্রভূত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, এ মাংস খাইবার বা ও মাংস খাইবার অল্পই প্রয়োজন হয়। আবার এই সকল কার্য্যে নিয়ম পালন করা যেমন কর্ত্তব্য, কামক্রোধাদি রিপু সকল সংযত করা তদপেক্ষা বেশী কর্ত্তব্য। কামক্রোধাদিতে দেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবল ও দ্রুত হইয়া উঠে, রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া প্রখর বা দেহের একদেশসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে, হস্তপদাদি অঙ্গের ক্রিয়া বর্দ্ধিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইত্যাদি। এইজন্য কামক্রোধাদির শান্তি

হইলে পর লোকে ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করে। অতএব কামক্রোধাদি দেহরূপ-যন্ত্রের স্বাভাবিক ও সুচারু ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা করিয়া স্বাস্থ্য ও জীবনশক্তি নষ্ট করে। ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বারাও ঐরূপ অনিষ্ট হয়। যাহার মন ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না, দেহ ও মনের যে সুন্দর শান্তি ও স্ফূর্ত্তি থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার সে শান্তি ও স্ফূর্ত্তি থাকে না, আহার করিয়া তাহার সুখ বা বলাধান হয় না। অতএব ঈর্ষ্যা দ্বেষ কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া রাশি রাশি রকম বিরকম মাংস ভক্ষণ করিলেও দেহরক্ষা হইবে না, দীর্ঘজীবন লাভ করা যাইবে না। আর কামক্রোধাদি দমন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ শান্ত ও সুস্থির এবং দেহ সংক্ষোভশূন্য করিলে সাদাসিদে সাত্ত্বিক আহারেই প্রচুর স্বাস্থ্য শারীরিক বল ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যাইবে। দেশে স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আহারের আয়োজন ও আড়ম্বর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, দুরাকাঙ্ক্ষা, জিগীষা, যশোলিপ্সা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল বৃদ্ধি হওয়ায় আহার করিয়া দেহও বলিষ্ঠ হইতেছে না, জীবনও দীর্ঘ হইতেছে না। বরং ব্যাধিই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যৌবনের পরই জরা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অতএব বিশুদ্ধচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হও, মাংস মাংস করিয়া আর পাগল হইতে হইবে না, ডাল ভাত বা ডাল রুটি হইতেই অসুরের বিক্রম সঞ্চয় করিবে। আর মদ্যমাংসাদি পরিত্যাগ করিয়া আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতিতে অনিয়ম

উচ্ছৃঙ্খলতা যত দূর পার পরিহার করিয়া সাত্ত্বিক আহারে কৃতসঙ্কল্প হও, দেখিবে তুমি ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তশুদ্ধির এক অতি উৎকৃষ্ট উপায় অধিকার করিয়াছ। অন্যান্য সহস্র উপায় থাকিলেও এ উপায়টি অপরিহার্য্য। দেহ এবং মন উভয়েরই মঙ্গলজনক হয় এমন যত খাদ্য আছে তাহা খাইতে পার, এখন যাহা খাইতেছ তদপেক্ষা বেশী মঙ্গলজনক খাদ্য থাকিলে তাহাও খাইতে পার, ভাতের প্রসর কমাইয়া রুটির প্রসর বাড়াইতে পার, আর মূর্গীমাংস বল গোমাংস বল যে মাংস ভক্ষণ না করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পার না বা প্রাণ রক্ষা করিতে পার না, সুচিকিৎসকের উপদেশ লইয়া সে মাংস ভক্ষণ করিও, শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অহিন্দু হইয়া যাইবে না। কিন্তু ভাতই খাও, রুটিই খাও, মাংসই খাও, লুব্ধ হইয়া খাইও না।

খাওয়া শরীর ও আত্মা উভয়ের মঙ্গলের জন্য। অতএব আহার একটী ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া আহার করিবে। আহারকে একটি ধ্যানস্বরূপ করিয়া তুলিবে, তবেই আহার করিয়া দেহ ও আত্মার মঙ্গল হইবে। আহার অতি গুরুতর, অতি পবিত্র কার্য্য। এই জন্য শাস্ত্রে, নির্জ্জনে মৌনী হইয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রফুল্লান্তঃকরণে আহার করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আহারে পাশবভাব প্রবেশ করায় এ ব্যবস্থার প্রতি যৎ-পরোনাস্তি অনাদর হইয়াছে। তাই আহার এখন ইয়ারের হল্লা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে সেই পাশবভাব বিষম বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দশজনে একত্র হইয়া সাহেবদের মতন গল্প করিতে করিতে আহার না

করিলে খাদ্যসামগ্রী ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা হয় না এবং সেই জন্য আহার করিয়া পীড়া হয়*। কিন্তু আহার করিয়া দেহ এবং আত্মার মঙ্গল হইবে চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া ধ্যানে বসিবার ন্যায় আহারে বসিয়া ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা হইতে পারে না, আর চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা না করিয়া অথবা চিত্তের একাগ্রতা থাকিলেও দশ জনের সহিত আহ্লাদে মত্ত হইয়া সে একাগ্রতা হারাইয়া ভাল করিয়া চর্ব্বণাদি করা যাইতে পারে, এ কথা যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় ধ্যানধারণার অর্থ জানেন না, নয় আহারকে ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কিন্তু সন্তানাদি আপন পরিবারবর্গের সহিত বা অকৃত্রিম বন্ধুদিগের সহিত আহার করিলে আহার বৃথামোদে পরিণত হয় না, বরং প্রীতি স্নেহ সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরিপুষ্ট হয়। অতএব পরিবারবর্গ ও অকৃত্রিম বন্ধুদিগের সহিত কখন কখন আহার করা যাইতে পারে।

আর একটি কথা। আমি সাধারণতঃ আহার প্রণালীর কথা বলিতেছি। সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বা ব্যবসায়ির আহার সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। বিদ্যা বুদ্ধি ধার্ম্মিকতায় যাঁহারা সমাজের নেতা ও আদর্শ স্বরূপ হইবেন প্রধানতঃ

* ভোজন কালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি। ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন কথোপকথন করিতে করিতে ভোজন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই মুখের লালা নিঃস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হয়, এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাদের ঘন ঘন জল বা মদ্য পান করিতে হয়। লালা শুষ্ক হওয়া এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে জল খাওয়া পরিপাক ক্রিয়ার অনুকূল নহে। এডুকেশন গেজেট, ২৯-এ শ্রাবণ ১২৯৯।

তাঁহাদের আহার সম্বন্ধেই লিখিতেছি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য জাতি সেই ব্যবস্থা আপনাদের উপযোগী করিয়া লন। আমিও এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছি। এই প্রণালী অনুসরণ করিবার আরও একটি গুরুতর কারণ আছে। কর্ম্ম বা ব্যবসায় ভেদে আহার্য্যের বিভিন্নতা আবশ্যক হইতে পারে। যাহার কার্য্যে চক্ষুর ক্রিয়া বেশী তাহার এক রকম আহার আবশ্যক। যাহার কার্য্যে কর্ণের ক্রিয়া বেশী তাহার আর এক রকম আহার আবশ্যক। যাহার কার্য্যে হস্তপদাদির ক্রিয়া বেশী তাহার আর এক রকম আহার আবশ্যক, ইত্যাদি। কিন্তু কার্য্যের এই সকল ভিন্নতানুসারে আহারের ভিন্নতা নিরূপণ করা আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌দিগের কার্য্য ও কর্ত্তব্য—আমার সাধ্যায়ত্তও নয়, কর্ত্তব্যও নয়। কিন্তু কর্ম্ম বা ব্যবসায় ভেদে আহারের ভিন্নতা আবশ্যক হইলেও সকল প্রকার আহারেই যে সাত্ত্বিকতার ভাব রক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমার দৃঢ় ধারণা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারও লুব্ধ হইয়া আহার করা কর্ত্তব্য নয়—মানুষ যতই মূর্খ যতই নিম্নশ্রেণীর হউক, লুব্ধ হইয়া আহার করা তাহার অকর্ত্তব্য। তোমাকে যে প্রণালীর পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যদি তোমার মাংস না খাইলে না চলে, তাহা হইলে তুমি অবশ্য মাংস খাইবে, মাংস না খাইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে; কিন্তু মাংস খাইতে হইবে বলিয়া যেন লুব্ধ হইয়া খাইও না। মাংসাদি খাই-

লেই যে পশুর ন্যায় লুব্ধ হইয়া খাইতে হয়, এমন কোন কথাই নাই। মাংসাদি লুব্ধ হইয়া না খাইলে যে মাংসাদি খাইবার ফল হয় না, এমন কোন প্রমাণও নাই। তাই বলি, বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যতই নিকৃষ্ট হও না, সমাজে তোমার স্থান যতই নিম্ন হউক না, তুমি মানুষ, পশু হইতে শ্রেষ্ঠ, পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, কীটপতঙ্গাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির ন্যায় তুমি লুব্ধ হইয়া খাইও না। তোমারও ত পরকাল আছে, তোমাকেও ত ইহকালের ভাবনা অপেক্ষা পরকালের ভাবনা বেশী ভাবিতে হইবে। অতএব তোমার আহার সাত্ত্বিক আহার না হউক, সাত্ত্বিকভাবের আহার যেন হয়। সমাজের উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই যদি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইতে পারেন, বা হইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে ত কোন দোষ হইতে পারে না। অন্যান্য জাতি সে চেষ্টা না করেন, নাই করিলেন, আমরা কেন করিব না? বিধাতা অন্যান্য জাতিকে যে ছাঁচে গড়িয়াছেন, আমাদিগকে সে ছাঁচে গড়েন নাই। আমরা যেমন ছাঁচে গঠিত আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আশা আকাঙ্ক্ষা তেমনই হওয়া উচিত। তাহাতেই আমাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই আমাদের জাতীয়তা। বিশেষত্ব গেলে সবই যায়, বিশেষত্ব থাকিলে সবই আসিতে পারে। আমরা কেন অন্য ছাঁচ ধরিতে যাইব? আত্মহত্যার ন্যায় পাপ আর নাই। অতএব তুমি ধর্ম্মযাজক ও সমাজশিক্ষক, তোমাকেও বলি, হিন্দুমাত্রকেই মনুষ্যের ন্যায় আহার করিতে শিক্ষা দিও, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির ন্যায় মুগ্ধ ও লুব্ধের ন্যায় আহার করিতে নিষেধ করিও, যাহা না খাইলে নয়—মৎস্য হউক, মাংস

হউক, মদ্য হউক—যাহা না খাইলে নয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে ও ধর্ম্মনাশের ভয়শূন্য হইয়া খাইতে বলিও, কিন্তু পশুর ন্যায় খাইতে নিষেধ করিও। নহিলে তুমি মনুষ্যসমাজকে দুর্নীতিপরায়ণ করিবে—তোমার পাপের সীমা থাকিবে না। শিক্ষা যদি দশগুণ হয় ত শিক্ষানুযায়ী কার্য্য এক গুণও হয় কি না সন্দেহ—সদুপদেশ অনুসরণে মানুষের স্বাভাবিক অনিচ্ছা ও অসামর্থ্য এতই বেশী। অতএব শিক্ষায় শ্লথযত্ন হইও না।

আরও একটি কথা। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে যে কি মৎস্য কি মাংস আমি কোন দ্রব্যই পরিত্যাগ করিতে বলি না। ভারতে মাংস কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই—এখনও চলিতেছে। অতি প্রাচীন কালে বোধ হয় কিছু বেশী চলিত। অর্থাৎ বিবাহাদি সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানে যখন কিছু বিশৃঙ্খলতা ছিল বোধ হয় তখন মাংসাহারেও কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। আর উচ্ছৃঙ্খলতার ফল দেখিয়া সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানও যেমন নিয়মাধীন করা হইয়াছিল, মাংসাহারও তেমনি নিয়মিত ও সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিকেও যেমন ধর্ম্মের অধীন করিয়া নিয়মিত করা হইয়াছিল মাংসাহারকেও তেমনি ধর্ম্মের অধীন করিয়া নিয়মিত করা হইয়াছিল। এই জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বলির মাংস ভিন্ন অপর মাংস নিষেধ করিয়াছেন। এখনও নিষ্ঠবানেরা বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না। ইহার অর্থ এই যে, মাংসাদি ভক্ষণ যেন ভোজনসুখের জন্য না হয়, কারণ তাহা হইলেই ভোজনে পাশব ভাব আসিয়া পড়ে—অর্থাৎ

মাংসাদি যেন এমন করিয়া ভক্ষণ করা হয় যে তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাব হৃতবল না হইয়া বর্দ্ধিতবল হয়। অতএব আমি মাংসাদি ভক্ষণ একেবারেই অনুচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করি না। দেহ রক্ষার্থ আবশ্যক হইলে এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিরোধী না হইলে মৎস্য বল মাংস বল সকলই ভক্ষণ করা যাইতে পারে। আর যদি দেহ রক্ষার্থ না হইলে নয় এমন না হয় অথচ আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অনুকূল না হয় তাঁহা হইলে শুধু মৎস্য মাংস কেন, অনেক উদ্ভিজ্জও পরিত্যাগ করিতে হয়।

আমি মাংসাহার নিষেধ করি না, নিরামিষ আহার ভাল কি সামিষ আহার ভাল ইহাও আমার প্রধান কথা নয়, আহারে বিচার আবশ্যক, আহারে সাত্ত্বিকতা প্রয়োজন, ইহাই আমার প্রধান কথা। আমি কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলি যে নিরামিষ আহার সামিষাহার অপেক্ষা ভাল। নিরামিষ আহার বলিতে একেবারেই মৎস্যমাংসশূন্য আহার বলি না। আমরাও মধ্যে মধ্যে মাংস এবং প্রায় প্রত্যহই একটু একটু মৎস্য খাইয়া থাকি। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের আহার প্রধানতঃ নিরামিষ আহার এবং ইউরোপীয়দিগের আহারের তুলনায় একেবারেই নিরামিষ বলিলেই হয়। আর ধর্ম্মপথে বেশী অগ্রসর হইতে হইলে আমরা সচরাচর যে পরিমাণ মৎস্য মাংস খাইয়া থাকি তাহাও পরিত্যাগ করা আবশ্যক মনে করি। এবং সেই জন্যই আমি নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী। আধ্যাত্মিকতায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে প্রচুর মাংস ভক্ষণ করিয়া

ক্রমে তাঁহারাই মাংসাহার নিয়মিত ও সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। বেশী মাংসাহার যে আধ্যাত্মিকতার অনুকূল নয় ইহাই তাহার একটি অতি সন্তোষজনক প্রমাণ। যাহাদের আধ্যাত্মিকতা কম মাংসাহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহাদের মতামত তত আদৃত হইতে পারে না।

অনেকে আচার পালন অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে আচার পালন করিবার বড় একটা আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু নিয়ত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা লোক সাধারণের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। এবং লোক সাধারণের মধ্যে উন্নত জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব কিছু বিরলও বটে। অতএব লোক সাধারণকে অচারানুগামী করিলে যত সহজে সৎপথাবলম্বী করা যায় কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবের বলে তত সহজে করা যায় না।

আচার পালন করিতে হইলে একটু বেশী পরিমাণে বন্ধনের ভিতর পড়িতে হয়—এই সময়ে স্নান করিতেই হইবে, এই সময়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে, এই সময়ে আহার করিতেই হইবে—এইরূপ আঁটাআঁটি এইরূপ বাঁধাবাঁধির ভিতর পড়িতে হয়। এই জন্য আচারপালন অনেকের বিরক্তিকর হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বিরক্তির অর্থ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। এবং আচারপালনে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবের অর্থ নিয়ম পালনে বিরাগ অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা।

আমাদের আচারের সংখ্যা বড় বেশী বলিয়া অনেকে উহা পালন করিতে অসম্মত। তাঁহারা বলেন, প্রতিদিন এতগুলা আচার পালনে এতটা সময় অতিবাহিত করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা প্রতিদিন অন্যরূপ বহুসংখ্যক আচার পালনে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। চা-পান, চুরুট সেবন, সোপ ঘর্ষণ, সুবাসিত তৈল মর্দ্দন, কেশ বিন্যাস, বেশ বিন্যাস, দর্পণ-দর্শন—এ সমস্ত তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম, এ সকল কর্ম্মে প্রতিদিন তাঁহাদের অনেক সময় কাটিয়া যায়, কিন্তু এ সকল কর্ম্মে তাঁহাদের শ্রান্তি ক্লান্তি বিরক্তি কিছুই নাই। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচারপালনে তাঁহাদের যে আপত্তি সে কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে মতি নাই বলিয়া।

কিন্তু আচারপালন কর্ত্তব্য বলিয়া আচারপালনই যেন একমাত্র কর্ত্তব্য না হয়। ধর্ম্মার্থ আচারপালন, একথা মনে না রাখিয়া আচার পালন করিলে আচারপালন ঘোরতর অনিষ্টের হেতু হইয়া থাকে। আমরা এখন মিথ্যা কথা কহি-তেছি, প্রতারণা করিতেছি, চুরি করিতেছি, আর গোটা কতক আচার পালন করিয়া মনে করিতেছি আমরা ভারি ধার্ম্মিক, খুব ধর্ম্মচর্য্যা করিতেছি। কিন্তু ইহার অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই, ইহার অপেক্ষা অধোগতি আর হইতে পারে না। এই রূপ অধর্ম্ম করি বলিয়া আমাদের আজ এমন দুর্দ্দশা, আমরা আজ এত হেয়, এত ঘৃণিত। এ অধর্ম্ম আমাদিগকে ছাড়ি-তেই হইবে। কেবল মাত্র আচারপালন ধর্ম্মচর্য্যা, এরূপ মনে করিলে চলিবে না। ধর্ম্মার্থ আচার পালন না করিলে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত আচারানুবর্ত্তী না হইলে,

আচারপালন ঘোর অনিষ্টসাধন করে। আমাদের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেও বটে। আচার পালনার্থ আচার পালন নয়, ধর্ম্মার্থ আচার পালন, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আচার পালন, এই শিক্ষা এখন আমাদের প্রতিগৃহে প্রতিদিন দিতে হইবে— এই মহামূল্য কথা এখন আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি মুহূর্ত্ত মনে করিতে হইবে। আচারানুবর্ত্তিতা মহৎ গুণ, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত যে আচারানুবর্ত্তিতা তদপেক্ষা দোষও আর নাই।

আবার আচারানুবর্ত্তিতা গুণ বলিয়া আচারানুবর্ত্তিতার গর্ব্বের ন্যায় মহাপাতক আর নাই। তুমি আচার পালন কর, ভালই। কিন্তু যে আচার পালন করে না তাহাকে তুমি ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা কর কেন? তোমারই শাস্ত্রে না বিশ্বব্যাপী মৈত্রীর কথা আছে? তোমারই শাস্ত্র না তোমাকে বলে, সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিও? তোমার শাস্ত্র কি তোমাকে বলে, ম্লেচ্ছকে বাদ দিয়া অপর সমস্ত ভূতকে আপনাতে দেখিও? তবে অনাচারী বলিয়া ম্লেচ্ছকে ঘৃণা কর কেন? ম্লেচ্ছের সংসর্গে পাছে ম্লেচ্ছ হইতে হয় এই জন্য ম্লেচ্ছের সংসর্গ নিষেধ। কিন্তু ম্লেচ্ছকে ঘৃণা করিবার বিধি কোথায়? দুষ্টের সংসর্গ দোষাবহ বলিয়া দুষ্টের সংসর্গ পরিত্যজ্য। কিন্তু দুষ্টকে ঘৃণা করিবার বিধি কোথায়? এই যে তুমি চণ্ডালকে এত ঘৃণা কর— কিন্তু তোমার শাস্ত্রে যে চণ্ডালের কাছেও জ্ঞান শিক্ষা করিবার বিধি রহিয়াছে। এই যে তুমি যবনকে এত ঘৃণা কর—কিন্তু তোমার মনে নাই, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা একজন যবন জ্যোতিষীকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন*? তবে অনা-

* রোমকাচার্য্য।

চারী বলিয়া ম্লেচ্ছকে তুমি এত ঘৃণা কর কেন? কেন কর, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তুমি আচারানুবর্ত্তী বটে, কিন্তু যে জন্য তোমার শাস্ত্রে আচারানুবর্ত্তিতার ব্যবস্থা তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। যে ধর্ম্মের নিমিত্ত, যে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আচারানুবর্ত্তিতার বিধান, সে ধর্ম্ম সে চিত্তশুদ্ধি তোমার নাই। তাই তুমি ম্লেচ্ছকে অনাচারী বলিয়া ঘৃণা কর। তুমি জাননা যে ধর্ম্ম ভুলিয়া চিত্তশুদ্ধি হারাইয়া কেবলমাত্র আচার পালনকে ধর্ম্মচর্য্যার সার বুঝিয়া তুমি অন্তরে ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছ, ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছ। আর সেই জন্য অনাচারী বলিয়া ম্লেচ্ছকে ঘৃণা কর। নিশ্চয় জানিও, ম্লেচ্ছকে ম্লেচ্ছ বলিবার অধিকার তুমি হারাইয়াছ—সে অধিকার তোমার আর নাই। আবার ধর্ম্মার্থ, আবার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আচার পালন করিতে শেখ। নহিলে তোমার শ্রেয় নাই, নহিলে তুমি ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে, আপনাকে হিন্দু বলিয়া আর পরিচয় দিতে পারিবে না। তোমার শাস্ত্রের আচারানুবর্ত্তিতা সর্ব্বত্র ধর্ম্মদর্শিতার ফল। সে ধর্ম্মদর্শিতা একমাত্র তোমারই শাস্ত্রের, কেবল মাত্র তোমারই পূর্ব্বপুরুষের। অতএব আচারানুবর্ত্তিতা কেবল মাত্র তোমারই লক্ষণ, যদি এই পরিচয় দিতে চাও—ইহা সত্য সত্যই বড় মহৎ বড় উচ্চ পরিচয়—অতএব যদি এই পরিচয় দিতে চাও তবে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় প্রকৃতার্থে সর্ব্বত্র ধর্ম্মদর্শী হও। নহিলে তোমার হিন্দুত্বও লক্ষণশূন্য হইবে, তোমার হিন্দুধর্ম্মও লক্ষণশূন্য হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য।

[জীবনে ব্রহ্মৈকপরতা]

"জীবের জীবত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, যে সাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয় সে সাধনাও তেমনি বিরাট। নহিলে সেই বিরাট ব্যবধান কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে? সে বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। হয় ত কাহারো অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ হইয়া সংহারেও সে সাধনার শেষ হয় না। এই যে জীবন এখন যাপন করিতেছি এ জীবনের প্রারম্ভে তাহার আরম্ভ নয়। এ জীবনের কত পূর্ব্বে সে সাধনা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই। তুচ্ছ তোমার জন্ম, তাহাতেই বা তোমার কি আরম্ভ হয়, তুচ্ছ তোমার মৃত্যু, তাহাতেই বা তোমার কি শেষ হয়। জন্ম মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দেও—অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের কথা ভাব। এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে। এ রঙ্গ তামাসার কাজ নয়, প্রজাপতি পতঙ্গের মতন একবার এ পথের এ পাশে একবার এ পথের ওপাশে স্ফূর্ত্তি করিতে গেলে চলিবে না। আগাগোড়া এই

বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে—জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে। এত করিলে যদি এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারা যায় *।”

অতএব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মনুষ্যের সমস্ত জীবন ধর্ম্মচর্য্যার্থ নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাই জন্ম হইতে শৈশবের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য বা সংস্কার—জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি—দেবোদ্দেশে সম্পন্ন করা হয়, আর শৈশবের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে। ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া, ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বড় কঠিন—ব্রহ্মচর্য্যের বহু বিঘ্ন—ব্রহ্মচর্য্য বিষম সাধনা। তাই জীবনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা, জীবনের প্রারম্ভ হইতে ব্রহ্মচর্য্য এত আবশ্যক যে শাস্ত্রে পঠদ্দশাই ব্রহ্ম-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত, অপর আশ্রমগুলি ব্রহ্মচর্য্যমূলক হইলেও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত নয়। জীবনের প্রারম্ভ কালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ—বৃক্ষ সম্বন্ধে যেমন বৃক্ষমূল জীবন সম্বন্ধে তেমনি জীবনের প্রারম্ভ। অতএব বাল্যে যে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আছে তাহারই কথা কিছু বিস্তৃত ভাবে কহা যাউক।

* ২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা।

শিক্ষা কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়—শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার নিয়ম। হিন্দুশাস্ত্র মতে শিক্ষার বিষয় চারিটি—দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয়।

ব্রহ্মচারী অথবা ছাত্রের দেহ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত মনুসংহিতায় কতকগুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

(১) সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥ (২অ-২২১)

যে ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থায় সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হয়, সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহাপাপে লিপ্ত হয়।

(২) উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ। (২অ-১৯৪)

গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই শিষ্যকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে এবং গুরুর শয়ন করিবার পর শয়ন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠা কত আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। সেই নিয়ম এই দুই শ্লোকে এবং আরও কতকগুলি শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শারীরিকি বল এবং স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনার্থ দূরপথ গমন এবং অন্যবিধ শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় হিতকর ব্যায়াম আর কিছুই নাই। মনুও ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥ (২অ ১৮৬)

শ্রমশীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া তাহা রৌদ্রে শুখাইবে এবং তদ্দ্বারা সায়ং প্রাতে অগ্নিতে হোম করিবে।

(২) উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ ॥ (২অ—১৮২)

জল কলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ, প্রভৃতি আচার্য্যের তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতি দিন ভৈক্ষ্য-চর্য্যা করিবে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহারও উদ্দেশ্য—শারীরিক বল, স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮০ সংখ্যক শ্লোকে মনু বলিতেছেন :—

এবঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী যেমন তেমন শয্যায় শয়ন করিবে। কদাচিৎ ইচ্ছাক্রমে রেতস্খলন করিবে না। ইচ্ছাক্রমে ঐ কার্য্য করিলে সে আপনার ব্রত নষ্ট করে।

মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিখান হইত। তদ্দ্বারা ছাত্রের মানসিক শক্তি এবং জ্ঞানভাণ্ডার কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝিবার উপায় নাই। তবে এইটি বুঝিতে পারা যায় যে গুরু শিষ্যকে অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সকল শিখাইতেন এবং যাহা শিখাইতেন তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শিখাইতেন।

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ (৩অ—১৩২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর

এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অৰ্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদশাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি দুইটী বা একটি ভিন্ন বেদ-শাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

আত্মার শিক্ষাও প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর প্রধান অঙ্গ ছিল। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা এই ঃ—

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণং।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥

(২অ—১৭৬)

নিত্য স্নান করিবে পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ ও অর্চ্চনা করিবে। এবং কাষ্ঠাহরণ পূর্ব্বক হোমকার্য্য করিবে।

এবং—

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ (২অ—১৮৬)

এ শ্লোকের অর্থ উপরে লিখিয়াছি।

আচম্য প্রয়তো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপং জপ্যমুপাসীত যথাবিধি॥ (২অ—২২২)

আচমন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে পবিত্র স্থানে বসিয়া দুই সন্ধ্যা সাবিত্রী উপাসনা করিবে।

হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা, মাতা, আচার্য্য, জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রভৃতিকে ব্রহ্মচারী ভক্তি ও সম্মান করিবে। যে কেহ

কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করে, তাহাকে ব্রহ্মচারী গুরু বলিয়া মান্য করিবে।

অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।

তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥ (২অ—১৪৯)

যিনি অল্পই হউক বা বহুই হউক ব্রহ্মচর্য্যার সাহায্য করেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে গুরুবৎ পূজা করিবে।

যিনি ব্রহ্মচারী তাঁহার জীবহিংসা অকর্ত্তব্য।

প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং। (২অ—১৭৭)

প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে।

এই যে হৃদয়ের শিক্ষা, ইহা শুধু উপদেশসম্বদ্ধ ছিল না। ব্রহ্মচারীকে এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে হইত।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।

ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।

তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।

ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥

(২—২২৭, ২২৮ ও ২২৯)

মাতা পিতা পুত্রের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, সাধ্য কি যে পুত্র শত শত বর্ষেও সে ধার শুধিতে পারে। নিত্য সেই পিতা মাতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্ম করিবে, ইহাঁরা তিন জন তুষ্ট হইলেই সকল তপস্যা সিদ্ধ হয়। এই তিন জনের শুশ্রূষাই মহা তপস্যা। তাঁহাদের বিনানুমতিতে অন্য কোন ধর্ম্মই আচরণ করিবে না।

এই রকম অনেক নিয়ম ও উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এক রকম বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের শিক্ষা চারি প্রকার ছিল—দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মার শিক্ষা। এখন এদেশে ছাত্র কয় প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে? বোধ হয় এক প্রকার বই নয়, অর্থাৎ কেবল মনের শিক্ষা। এখন স্কুল কালেজে ছাত্রের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচালনা হইয়া থাকে এবং ছাত্র কিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জ্জন করে। হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা স্কুল কালেজে হওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বে যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভাস করিবার রীতি ছিল তাহাতে হইতে পারিত, এখন স্কুল কালেজে যে রকমে বিদ্যাভ্যাস করা হয় তাহাতে হওয়া বড় কঠিন। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং শিষ্য গুরুকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। অর্থাৎ গুরুশিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের একটি গ্রন্থি থাকিত এবং সেই জন্য গুরুর কাছে শিষ্যের উত্তম হৃদয়ের শিক্ষা হইত। এখন স্কুল কালেজে গুরুশিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের গ্রন্থি প্রায়ই থাকে না। কাজেই এখন বালকেরা স্কুল কালেজে হৃদয়ের শিক্ষা পায় না। ঘরে পিতা মাতা সন্তানকে এ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই সন্তানকে স্কুল কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। এই জন্য এখন আমাদের মধ্যে ভক্তি, স্নেহ, দয়া, সহৃদয়তা প্রভৃতির বিস্তর ভান দেখিতে পাওয়া যায়—প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ, দয়া, সহৃদয়তা বড়ই কম।

আত্মার শিক্ষা সম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। আমাদের স্কুল কালেজে প্রায়ই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। আর

প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় এ কথাও বলা যাইতে পারে যে স্কুলকালেজ প্রকৃত ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থান নয়। দুই চারি খানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। ধর্ম্মচর্য্যাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা। গৃহ, ধর্ম্মচর্য্যার উৎ-কৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখন গৃহে সন্তানের ধর্ম্মচর্য্যার প্রতি পিতা পিতৃব্যের মনোযোগ নাই। কাজেই এখন আত্মার শিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা যার পর নাই অঙ্গহীন হইতেছে।

শরীরের শিক্ষাও এখন হয় না বলিলেই হয়। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন শিক্ষকের নিমিত্ত জল তুলিবার রীতি নাই, কেন না জল তুলিবার আবশ্যক নাই। আর বোধ হয় ছাত্রের দ্বারা এক গেলাস জল আনাইয়া লইলে এখন শিক্ষককে পদচ্যুতই বা হইতে হয়। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ প্রভৃতি যে সকল স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করা উচিত, তৎপ্রতি লোকের এখন বিশেষ মনোযোগ নাই। সন্ধ্যাহ্নিকে আস্থা থাকিলে প্রকারা-ন্তরে এই সকল নিয়মের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু সে আস্থাও নাই, সে লক্ষ্যও নাই। হোমকাষ্ঠ আহরণার্থ পূর্ব্বকালে ছাত্রকে অনেক পথ হাঁটিতে হইত এবং অন্য রকমেও শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। এখন কেহ হোমও করে না, কেহ পথও হাঁটে না। স্কুলকালেজে যাইতে এবং স্কুলকালেজ হইতে বাটী আসিতে পথ হাঁটার প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে কলিকাতায় লোকে গাড়ি পাল্কি করিয়া এবং হিন্দুস্থানী বেহারার স্কন্ধে চাপাইয়া বালকদিগকে স্কুলকালেজে পাঠাইতে আজি কাল কিছু বেশী ভালবাসিতে-ছেন। এবং মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়া

লোকে বালকদিগের পথহাঁটারূপ হিতকর ব্যায়ামটি ক্রমে উঠাইয়া দিতে যত্নবান হইতেছেন। এইজন্য আমি বলি, গ্রামে গ্রামে স্কুল আমাদের উন্নতির লক্ষণ নহে, অবনতির লক্ষণ। বিদ্যার বহুল প্রচারের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে স্কুল আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাবলের অগ্রে শারীরিক বল চাই। যদি শারীরিক বল পরিবর্দ্ধনার্থ গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চ্চার অনুষ্ঠান করা না হয়, তাহা হইলে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করা অবিধেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ, উদ্যম এবং শক্তি বড় কম। স্কুল এবং ব্যায়ামানুষ্ঠান একেবারে দুইই তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠা অসম্ভব। তাই বলি যে পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুদিগের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আবশ্যক, কিন্তু আট দশ বৎসরের বা ততোধিক বয়সের বালকদিগের নিমিত্ত কাছে কাছে স্কুল স্থাপন করা ভাল নয়। মধ্যম এবং উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় দূরে দূরে স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং দেশের রাস্তা ঘাট যত বেশী ও ভাল হইবে, এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলের দূরতা তত বাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে অতি অল্প বয়স হইতে এদেশে লোকে যে রকম পথ হাঁটিতে পারিত, এখন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সে পথ হাঁটার কথা এখন গল্প বলিয়া মনে হয়। সাধে কি আমরা ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি?

অতএব শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃত ব্রহ্মচারী এখন নাই, পূর্ব্ব-কালে ছিল—জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এখন স্থাপিত হয় না, পূর্ব্ব কালে হইত।

প্রাচীন শিক্ষার নিয়ম কি ছিল এখন তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

মনুসংহিতার দুই চারিটি শ্লোক পড়িলেই সে নিয়ম জানিতে পারা যায়।

(১) সেবেতেমাংস্ত নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ (২অ-১৭৫)

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকরত ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক নিজ-তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবে।

(২) বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥
(২অ-১৭৭)

মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার বিলাস এবং প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে।

(৩) অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥
(২অ-১৭৮)

আভাঙ্ করিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, নেত্ররঞ্জন, পাদুকা ও ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

(৪) ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী।
(২অ-১৮৮)

ব্রহ্মচারী এক জনের অন্নে জীবন ধারণ করিবে না। ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

(৫) হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। (২অ-১৯৪)

গুরুসমীপে শিষ্যের অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্ব্বদা গুরুর অপেক্ষা হীন হইবে।

(৬) দূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং।

স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥ ২অ-১৭৯)

দ্যূতক্রীড়া, বৃথা বাগবিতণ্ডা, পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, স্ত্রীসেবা, স্ত্রীলোকের প্রতি কামদৃষ্টি এবং পরের অপকার পরিহার করিবে।

এইরূপ আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রকারদিগের মতে শিক্ষার নিয়ম চারিটি—(১) কষ্টসহিষ্ণুতা (২) বিলাসবিদ্বেষ (৩) চিত্তসংযম (৪) নিষ্ঠা। এই চারিটি একত্রিত না হইলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। বাবুগিরি করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না। বিলাসপ্রিয় হইলে মানুষ পরিশ্রম করিতে পারে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষের অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়, মানুষ কোন কাজই করিতে পারে না। যে কাজই কর, নিষ্ঠা না থাকিলে, অর্থাৎ দেহের মনের ও অন্তঃকরণের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। একটি কাজ করিতে করিতে অন্য কাজে মন দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। কোন একটি কাজ যেমন করিয়া করা উচিত তেমনি করিয়া করিতে হইলে তন্ময় হওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে কেহ কখন ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম ছিল এখনও কি সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়, সে নিয়ম এখন নাই। লোকে এখন সন্তান সন্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চায় না। পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেকে গাড়ি পাল্কি করিয়া স্কুলে পাঠায়। ছেলের গায় একটু রৌদ্র লাগিবে বলিয়া হাতে ছাতা না দিয়া ছেলেকে স্কুলে পাঠায় না। পাঠদ্দশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদিগকে বিলক্ষণ বিলাস-প্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উত্তম উত্তম জুতা, উত্তম উত্তম বস্ত্র, পমেটম প্রভৃতি নান গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, কখন কখন জামার বোতামে বড় বড় গোলাপ ফুল গুঁজিয়াও স্কুলে যায়। এই সকল কারণে এখন অধ্যয়নে নিষ্ঠা নাই। এবং আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যে এই সকল কারণ ব্যতীত আরো কতকগুলি কারণ বশতঃ এখন ছাত্রের নিষ্ঠা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ছাত্রদিগকে এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা কমিয়া যাওয়া এবং চিত্তসংযমের বিঘ্ন ঘটাই সম্ভব। বোধ হয় ঐ সকল আন্দোলনে তাহাদিগের নিযুক্ত না হওয়াই ভাল। সামাজিক বা রাজনৈতিক বা ধর্ম্মবিষয়ক অন্দোলন যে মন্দ বা অনাবশ্যক তাহা আমি বলি না। আমি এই মাত্র বলি, আন্দোলন যাহার কার্য্য আন্দোলন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকা উচিত নয়। কেন না অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার আন্দোলন হয় বিফল নয় অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হয়। তেমনি অধ্যয়ন যাহার কার্য্য, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার অধ্যয়ন

হয় বিফল নয় অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয়। দর্শনগ্রন্থ লিখিতে লিখিতে পার্লিয়ামেণ্টে বসিতে গিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী ডিস্‌রেলির উপন্যাস লেখক বলিয়া ভাল যশ হইল কৈ? লর্ড ব্রুহাম নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কোন বিষয়েই অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। রাজাধিরাজ লুই নেপোলিয়ন সিজরের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে এপর্য্যন্ত গ্রন্থকার বলিয়া উচ্চ আসনে বসাইল না। তাই বলি, অধ্যয়ন যাহার কাজ, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কাজ না থাকিলেই ভাল হয়। অধ্যয়ন শেষ করিয়া অন্য কাজ করিলে অধ্যয়ন ও ভাল হয়, অন্য কাজও ভাল হয়। এদেশে অধ্যাপক মহলে প্রবাদই আছে—ক্ষণা দূর্দ্ধমতার্কিক—অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী একদণ্ড শাস্ত্রচিন্তা হইতে বিরত হইলে তাহার অধীত শাস্ত্র বিফল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অধ্যয়ন একটী মহাযোগ। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে সেই মহাযোগ ভঙ্গ হয়।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষার যাহা প্রকৃত নিয়ম এদেশে এখন তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, চিত্তসংযম নাই, নিষ্ঠা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। Smiles' Self-Help এবং Craik's Pursuit of Knowledge under Difficulties প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল লোকের মানুষ হওয়ার বিবরণ লিখিত আছে, এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ তপস্যা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার আমাদের এ কঠোর তপস্যা শেখা আবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা ভূদেব মুখোপ্যাধ্যায় বলেন, "বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটি লাইকর্গস্ হইতে হইবে, কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।" (পারিবারিক প্রবন্ধ—১২৫ পৃষ্ঠা)

বাল্যকালের ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর অধিক বলিব না। কিন্তু বাল্যকাল ফুরাইলেই ব্রহ্মচর্য্য ফুরায় না। যদি ফুরাইত বা ফুরাইতে পারিত তাহা হইলে বাল্যেও ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক হইত না। ব্রহ্মচর্য্য জীবনের সকল ভাগেই আবশ্যক বলিয়া বাল্যকালে ইহার জন্য এত কঠিন ব্যবস্থা। মনু বলিতেছেন ঃ—

১। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।

অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে।

২। স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছিতা।

সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ (৩ অ-৭৯)

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

এ সকল কথার অর্থ এই যে মানুষের সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য হওয়া উচিত। এবং এই জন্যই গৃহস্থের পালন জন্য শাস্ত্রে

এত কঠিন নিয়ম। সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে ভোগস্পৃহা, স্বার্থপরতা, বিলাসপ্রিয়তা সকলই পরিত্যাগ করিতে হয় এবং সংযমী, কষ্টসহিষ্ণু, পরার্থপর, সমদর্শী হইতে হয়। আর সেই সকল নিয়ম পালন করিতে করিতেই শেষোক্ত গুণগুলি আয়ত্ত হইয়া আইসে। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারেরা সেই সমস্ত নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। অতএব এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জীবনের শেষ দুইটী আশ্রম গৃহ ও সমাজ হইতে পৃথক্, একমাত্র ব্রহ্মসাধনার স্থল। এবং সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচর্য্যার বিধান ও আবশ্যকতা। গৃহে প্রস্তুত না হইলে বনে যে বিফল হইতে হয়—গুরুগৃহে ও আপন গৃহে কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে বনের যে বিষম সাধনা তাহাতে প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, সিদ্ধিই বা হইবে কেমন করিয়া ?

অতএব বুঝা গেল যে হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যের সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য—জীবনের কোন অংশ—কৈশোর বল, যৌবন বল, প্রৌঢ়াবস্থা বল—জীবনের কোন অংশেই ব্রহ্মচর্য্য ভুলিবার যো নাই, ছাড়িবার যো নাই। আর ভুলিলে চলিবেই বা কেমন করিয়া, ছাড়িলে চলিবেই বা কেমন করিয়া ? কত শতাব্দী কত যুগ সাধনা করিলেও যাহা পাওয়া যায় না তাহা পাইবার ইচ্ছা করিলে এইত ক্ষুদ্র জীবন ইহারও আবার খানিকটা ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া বা ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন ? এই জন্যই ত হিন্দুর মতে সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য। সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য, এ কথা হিন্দু ভিন্ন আর কেহ বলে না, হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রে নাই। বোধ হয় যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ

বা অর্থবোধক শব্দ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায়ও নাই। না থাকিবারই কথা। যাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে তাহা যে অন্য জাতির মধ্যে একেবারেই নাই তাহা নয়। গার্ফিল্‌দ্‌ গারিবল্‌দি গর্দন গ্ল্যাদিষ্টোন ইঁহারাও ব্রহ্মচারী। কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে ব্রহ্মচারী থাকিলেও হিন্দুর মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য যেমন জীবন যাপন করিবার প্রণালী ও জীবনব্যাপী অনুষ্ঠান তেমন ব্রহ্মচর্য্য নাই। নাই কেন? না, হিন্দুর জীবনের উদ্দেশ্য যেমন বিরাট ও যত সাধনাসাপেক্ষ অন্য কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য তেমন বিরাট ও তত সাধনাসাপেক্ষ নয়। উদ্দেশ্যের এই বিরাট বিভিন্নতা বশতঃ হিন্দুকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন ব্রহ্মৈকপর হইতে হইয়াছে এবং সেই জন্য সমস্ত জীবনকে অবিচ্ছিন্ন অবিশ্রান্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মৈকপরতা ও ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

এইখানে অল্পবয়স্ক পাঠকদিগের উপকারার্থ একটি সম্ভবপর প্রশ্নের উত্থাপন করিব। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ ব্যাখ্যা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কঠোরতাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত প্রাণ এবং গূঢ় অর্থ। যদি তাহাই হয়, তবে কোমলতার সহিত কি মানুষের কোন সম্পর্ক নাই বা রাখা উচিত নয়? আকাশে মেঘের যে বিচিত্র খেলা হয়, মানুষ কি তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীতে সান্ধ্য সমীরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণপ্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? বসন্তে বসুন্ধরা যে অপূর্ব্ব পুষ্পাবরণে আবৃতা হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? অবশ্য

দেখিবে। না দেখিলে মানুষ মানুষ হইবে না। মনুষ্য দেহে কঠিন অস্থিও আছে কোমল মাংসও আছে। পৃথিবীতে কঠিনতম পর্ব্বতও আছে, কোমলতম কুসুমও আছে। জগতে রুদ্র রৌদ্রও আছে, কমনীয় কৌমুদীও আছে। বিশ্বের এই দুই মূর্ত্তি ধ্যান না করিলে মানুষ মানুষ হয় না। বিশ্বে কঠিনতা ও কোমলতা দুইই আছে। ব্রহ্মপ্রার্থীকে সেই দুইকে এক করিতে হইবে—অতএব তাহার দুইয়েরই ধ্যান আবশ্যক। ব্রহ্মচারী দুইয়ের ধ্যান করিয়া থাকেনও বটে—কঠিনতার ধ্যানও যেমন করেন, কোমলতার ধ্যানও তেমনি করেন। লক্ষ্মণ সসত্বা সীতাদেবীকে তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী বাল্মীকি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন ঃ—

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥
(রঘুবংশ, ১৪ সর্গ, ৭৮)

তুমি নিজ বলের অনুরূপ জলকলস লইয়া যখন আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বাড়াইবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর উপর প্রসূতির যে অপূর্ব্ব প্রীতি, তাহা তুমি তোমার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিবে।

পৃথিবীর কোমলতার কি চমৎকার, কি রমণীয়, কি মহিমাময় ধ্যান! পৃথিবীর নীল আকাশ, পৃথিবীর স্বচ্ছ সলিল, পৃথিবীর সুপ্রস্ফুটিত কুসুম, পৃথিবীর সুকণ্ঠ, পৃথিবীর সুগন্ধ, পৃথিবীর সুন্দর দেহ, পৃথিবীর শ্যামল কান্তি এইরূপে ধ্যান করিও, তোমার ব্রহ্মচর্য্যার বিঘ্ন না হইয়া, বলবৃদ্ধি হইবে। কেন না এইরূপ ধ্যানে পৃথিবীর মোহ কমিয়া প্রীতি বৃদ্ধি হয়,

আত্মাদর বিনষ্ট হইয়া বিশ্বের প্রতি আদর বর্দ্ধিত হয়। যাহার তপস্যা যত কঠোর, তাহার কোমলতার তত প্রয়োজন। কারণ যত দিন জড়ত্ব তত দিন শ্রান্তি আর তত দিন বিশ্রামের আবশ্যকতা। প্রখর রবিকর পীড়িত পথিকের সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধি জলের যত প্রয়োজন, আর কাহারো তত নয়, এবং সেই পথিকের হাতে সেই জল যত পুণ্যপথগামী আর কাহারো হাতে তত নয়। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে তপস্বীর তপোবনেই বেশী ফুল ফুটিত, বেশী মৃগ মৃগী খেলাইয়া বেড়াইত, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যাইত। আর ব্রহ্মপ্রিয় ব্রহ্মপ্রার্থী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মের সংযোগে ব্রহ্মের সন্ধানে বিশ্ব দেখিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্যে যত সূক্ষ্মতা যত বিশুদ্ধতা যত পবিত্রতা যত একপ্রাণতা যত একাত্মতা যত মোহপরিশূন্যতা দেখিয়া থাকেন, আর কেহ তত দেখিতে পান না। অন্ততঃ দেখিতে পাইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। এবং আমরা যাহাকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বলি বোধ হয় একমাত্র ব্রহ্মচারীই তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম, অপর সকলে সে সৌন্দর্য্যের কেবল অপমান বা অপব্যবহার করে।

ব্রহ্মচারী ভিন্ন জগতের সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্য্য দেখিও, তাহা হইলে সে সৌন্দর্য্যের প্রসর তুমি যত দেখিবে, সে সৌন্দর্য্যে ব্রহ্ম তুমি যত দেখিবে, আর কেহই তত দেখিবে না।

ব্রহ্মচর্য্যের নাম শুনিলে আজিকালি যাঁহারা হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই

ভাল। তাঁহারা অধার্ম্মিকের শত্রু নন, ধর্ম্মের শত্রু। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। কিন্তু যাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া জানি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন আর ব্রহ্মচর্য্য চলে না। কেন তাঁহারা এরূপ মনে করেন, বুঝিতে পারি না। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসবিদ্বেষ, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তশুদ্ধি, ইত্যাদি। অথবা যে প্রণালীতে জীবনযাপন করিলে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারা যায় সেই প্রণালীর নাম ব্রহ্মচর্য্য।' তবে ব্রহ্মচর্য্য এখনকার কালে চলিতে পারে না এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? ইন্দ্রিয়দমন বিলাসবিদ্বেষ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ যদি এখনও মানুষের আবশ্যক হয়, এখনও গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য সেকেলে অনুষ্ঠান, একালের নয়, একথা বলিবার কারণ কি? একথা বলিলে কি এইরূপ বুঝায় না যে একালটা বড় খারাপ, অতএব একালে এ সকল গুণের প্রয়োজন নাই? আর এ কথা বলিলে ইহাও কি বুঝায় না যে তুমি স্বয়ং বিলাসত্যাগ করিরার, ইন্দ্রিয়দমন করিবার, চিত্ত শুদ্ধ করিবার কষ্টস্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ এবং হাসিয়া খেলিয়া ধার্ম্মিক হইবার প্রয়াসী তাই ব্রহ্মচর্য্য নিষ্প্রয়োজন মনে কর? কিন্তু তোমার এরূপ মনে করিবার আরো একটু হেতু থাকিতে পারে। শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মচারী প্রতি দিন প্রত্যূষে গুরুর নিমিত্ত দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবে। তুমি হয় ত মনে কর, এ সকল কাজ সেকালে করা যাইতে পারিত, একালে কি করা যায়? আর এইরূপ মনে করিয়া বল, ব্রহ্মচর্য্য সে

কালের, এ কালের নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এইরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা তাহা অন্যরূপ কার্য্যের দ্বারাও ত সাধন করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যলাভের নানা উপায় আছে, গুরুভক্তি অনুশীলনেরও নানা পন্থা আছে। যে উপায় যখন ভাল বোধ হইবে সে উপায় তখন অবলম্বন করা যাইতে পারে, যে পন্থা যখন উত্তম বোধ হইবে সে পন্থা তখন অনুসরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। হানি হয়, শাস্ত্রে এমন কথাও নাই। অতএব শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যে পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে শুধু তাহা দেখিয়া যদি তুমি বল যে ব্রহ্মচর্য্য সে কালের, এ কালের নয়, তাহা হইলে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছ। কারণ কালভেদে পদ্ধতিভেদ অশাস্ত্রীয় নয়। আর বোধ হয় যে এই প্রকার ভ্রম বশতই শুধু ব্রহ্মচর্য্য নয় হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট আরো অনেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তুমি বলিয়া থাক, ও সব সে কালের, এ কালের নয়। কিন্তু শুধু ব্রহ্মচর্য্যের পদ্ধতি বিবেচনা না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য কি জিনিষ তাহা বিবেচনা করিয়াও যদি তুমি মনে কর, ব্রহ্মচর্য্য সে কালের এ কালের নয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও তুমি অধঃপাতে গিয়াছ, তোমার আর আশা ভরসা নাই।

বিবাহ।

[ধর্ম্মার্থ সামাজিকতা—পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণ]

"শিক্ষা ও শাসন দ্বারা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংযত করিতে না পারিলে মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও দেবপ্রকৃতি লাভ করিতে বা নির্গুণ প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহা জানিতেন, অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা ইহা বেশী বুঝিতেন, তাই তাঁহারা গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও এত কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, বিবাহাদি যে সকল গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের ঐন্দ্রিয়িক স্পৃহাদি চরিতার্থ হয় মানুষকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। * * * কিন্তু জীবপ্রকৃতির ভোগ অনিয়ন্ত্রিত হইলে জীবপ্রকৃতি কখনই দেবপ্রকৃতি লাভের অনুকূল হয় না, বিষম প্রতিকূলই হইয়া থাকে। অপর পক্ষে জীবপ্রকৃতি সুনিয়মে চরিতার্থ হইলে দেবপ্রকৃতিলাভের বিশেষ অনুকূলই হয়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করা সম্বন্ধে এত আঁটাআঁটি নিয়ম। ' এবং এই জন্যই বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া

দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।*"

আর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে তাহাতে বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া না দিলেও চলে না। বিবাহই সমাজবন্ধনের মূল গ্রন্থি। যেখানে বিবাহ নাই সেখানে সমাজও নাই। যেখানে বিবাহগ্রন্থি শিথিল সেখানে সমাজবন্ধনও শিথিল। আজি কালি ইউরোপাঞ্চলে কেহ কেহ বিবাহ উঠাইয়া দিবার কথা কহিতেছেন। বিবাহ তথায় কখন উঠিবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু যদি উঠে তাহা হইলে সমাজও যে তথায় অতি বিচিত্র আকার ধারণ করিবে এবং সেই সঙ্গে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতেও যে অতি বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জল্পনা এখন অনাবশ্যক, কারণ সে বৈচিত্র্য ঘটিতে এখনও অনেক বিলম্ব। এখনও ইউরোপে বিবাহ সমাজবন্ধনের মূলগ্রন্থি, কিন্তু অনেক স্থলেই আইন-মূলক চুক্তিমাত্র, ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়। আমাদের বিবাহ চুক্তি নয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই প্রভেদের কারণ এই যে আমাদের জীবনের যে প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় বা মুক্তি, তাহা এত অধিক ও এত কঠিন সাধনাসাপেক্ষ যে জীবনের সমস্ত কার্য্যকে সেই সাধনার অনুকূল বা সহকারী না করিলে চলে না এবং সেই জন্য আমাদের বিবাহও ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইউরোপে এরূপ

---

* ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা।

নয়। তথায় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এত অধিক ও এত কঠিন সাধনাসাপেক্ষও নয় এবং তথাকার লোকের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে প্রধান বলিয়া অনুসৃতও হয় না। প্রকৃত পক্ষে প্রধান বলিয়া অনুসৃত হইলে, তথায়ও বিবাহের সহিত ধর্ম্মভাব কতকটা সংযুক্ত থাকিত, বিবাহকে ধর্ম্ম হইতে এত দূরে লইয়া যাওয়া হইত না। ইউরোপে কর্ম্ম ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসরণ করে না বলিয়া বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। ভারতে হিন্দু-দিগের মধ্যে কর্ম্ম ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসরণ করে বলিয়া বিবাহ সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান। ধর্ম্মই মানুষের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি, ইউ-রোপে লোকের বিশ্বাস এই বটে, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মে এ বিশ্বাসের প্রমাণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। হিন্দুর বিশ্বাসও এই, কর্ম্মও এই বিশ্বাসেরই প্রমাণ। তাই হিন্দুর গৃহও ধর্ম্ম-চর্য্যার্থ, বিবাহও ধর্ম্মচর্য্যার্থ। প্রধান উদ্দেশ্যকে প্রকৃত প্রাধান্য দিতে হইলে অপর সকল উদ্দেশ্যকে প্রধান উদ্দেশ্যের অনুকূল ও উত্তরসাধক না করিলে চলে না। ইংরাজ জাতি বড় অর্থপ্রিয়। অর্থোপার্জ্জন তাঁহাদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু বিশ্বাসে প্রধান নয়, কার্য্যতঃ প্রধান। তাই তাঁহাদের এক-খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এই উপদেশটী দেখিতে পাই—

Thrift means to *thrive* or to do well in the world. If we wish to thrive we must spend our time and our earnings to the best advantage. In the first place we must work hard. Even our leisure—our time for play,—must be passed in the way which will best prepare as for our work. In the second

place we must be very careful not to spend even a penny for any thing we can well do without. *

অর্থাৎ ধনসঞ্চয় ও ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে একটি পয়সাও খরচ করা হইবে না, আর ধনসঞ্চয় করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি বাড়ে কার্য্যের অবসর কালটুকুও এমনি করিয়া কাটাইতে হইবে। প্রকৃত কথাই ত এই। ধনসঞ্চয় যথার্থই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য ধনসঞ্চয়ের জন্য সেখানে এইরূপই ত করিতে হইবে। ধন সঞ্চয়ের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, কড়া-ক্রান্তিটীও বৃথা ব্যয় করা হইবে না, দিনান্তে দুই এক দণ্ড অবসর পাইলে ধর্ম্মচিন্তা করা হইবে না, সেই ধনের ভাবনাই ভাবিতে হইবে। অপর পক্ষে আমাদের শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মকে প্রকৃত পক্ষে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া সমস্ত জীবনকে এবং জীবনের সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্মচর্য্যারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ধর্ম্মের অনুকূল ও উত্তরসাধক করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মকে প্রকৃত প্রাধান্য দিতে হইলে এরূপ না করিলেও ত চলে না। ধনসঞ্চয়েও যেমন ধর্ম্মচর্য্যায়ও তেমনি, কড়াক্রান্তিটী ছাড়িবার যো নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে আহার বিহার পান ভোজন গৃহ সমাজ বিবাহ সকলই ধর্ম্মের জন্য, সকলই ধর্ম্মের উত্তরসাধক। ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইলে সকলই বৃথা, সকলই অধর্ম্ম। তাই আমাদের শাস্ত্রে সমাজও ধর্ম্মের জন্য

---

*Longmans' Fourth Reader নামক পুস্তকে অষ্টাদশ পাঠ, ৭১ পৃষ্ঠা। স্কুলে আমাদের ছোট ছোট ছেলেগুলিকে এই পুস্তক পড়ান হইতেছে!

এবং সমাজের মূলে যে বিবাহ তাহাও ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্মার্থ সামাজিকতা—ইহা কেবল হিন্দুরই কথা, হিন্দুধর্ম্মেরই লক্ষণ, হিন্দুত্বেরই লক্ষণ। সমাজের মূলে যে বিবাহ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক এ কথা কত সমীচীন।

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম; তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম; চতুর্থ, সন্ন্যাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন ঃ—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্ততে সর্ব্বআশ্রমাঃ॥ (৩অ-৭৭)

যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ (৩অ-৭৮)

যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহঃ এই গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ (৩অ-৭৯)

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥ (৩অ-৮০)

ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য প্রাণীগণ পুত্রাদিপরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা অপর তিনটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়াধীন। গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ বলিয়া সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। অপর সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান আশ্রম। পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। পরোপকার গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম। গৃহস্থাশ্রম আত্মসুখের জন্য নয়, ভোগবিলাসের জন্য নয়, যশ গৌরবের জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য—পরোপকারের জন্য। অতএব শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংযম গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি। কিন্তু এই যে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, এই যে আত্মসংযম-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার পরিগ্রহ ব্যতিরেকে ইহাতে প্রবেশ করা যায় না—ভার্য্যা ব্যতিরেকে এই পরম পরোপকার ব্রতে ব্রতী হওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন

করিতে ক্রটি করেন তিনি মনুষ্য মধ্যে এতই অধম যে জীবন-সত্বেও তিনি মৃত বলিয়া গণ্য। যথা ভগবান মনুঃ—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছসন্ন স জীবতি॥ (৩অ-৭২)

যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং আত্মার সন্তোষসাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্বেও জীবিত নন।

কিন্তু যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে মনুষ্যের জীবন সার্থক হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে, ভার্য্যা ব্যতিরেকে সে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না।

মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ (৩অ-৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ, এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং মহামুনি কশ্যপ বলেন—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্ব প্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।

বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এবং উদ্দেশ্য, ধর্ম্মচর্য্যা এবং তদন্তর্গত পরোপকার। হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের জন্য। ভার্য্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না

এবং সমাজসেবা হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে একথা বলে না। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা এবং সমাজসেবা বা পরোপকারের জন্য দার পরিগ্রহ করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহা করে নাই, একা হিন্দু তাহা কেন করে, সে কথা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জানা আবশ্যক। জানাও গেল যে হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও পরোপকার। জানা গেল যে পবিত্র পরোপকার-ব্রত পালন করিবার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পবিত্র পিতৃপুরুষগণের আত্মার যথাবিহিত পূজার জন্য, জগতে মনুষ্য বল, পশু বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু পুরুষ রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, সে বিবাহে পত্নী অথবা ভার্য্যা কি বস্তু তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে সংক্ষেপে আর একটী কথার নিষ্পত্তি করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যানির্ব্বাচন করিতে

হুয়। নির্ব্বাচন প্রণালী সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এবং যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রকারেরা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর বিরোধী এবং ইংরাজি courtship প্রণালীর পক্ষপাতী। দুইটি প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা মীমাংসা করা কঠিন কি সহজ বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথাটী বলিতে পারি, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজসেবা সে বিবাহের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত যুবক বিবাহ করিবেন তিনি না করিয়া বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান্, প্রশান্তচিত্ত, ধর্ম্মশীল, সূক্ষ্মদর্শী বক্তি নির্ব্বাচন করিলেই ভাল হয়। যে ভার্য্যাকে প্রধানতঃ পতির নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে হইবে, সে ভার্য্যা স্বয়ং পতি দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধর্ম্মচর্য্যার জন্য কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে যতগুলি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্থিরচিত্তে এবং বহুদর্শিতাসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিলে ততগুলি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা হয় না। তিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন, ধর্ম্ম বা সমাজের ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন না। এবং সেই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসেবা এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। অতএব বিবাহের উদ্দেশ্য

ভেদে কন্যানির্ব্বাচন প্রণালীভেদ। আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা যদি প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশে, নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বিবাহ করা মহত্ব মনে করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিব যে ইংরাজি courtship প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কন্যানির্ব্বাচন-প্রণালী তাঁহারা আর পাইবেন না। কিন্তু যদি তাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত, সমাজ সেবার নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করা তদপেক্ষা মহত্ব মনে করেন, তাহা হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বয়োজ্যেষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা-নির্ব্বাচনের ভারটি কাড়িয়া না লন। মনুই ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্দ্রিয় না হইলে সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট কোন্‌টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় তাহা মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। লালসা তৃপ্তি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক ভাল জিনিষ, বোধ হয় হিন্দুকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। তবে যাঁহারা আত্মোদ্দেশমূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহাদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক। যেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ আত্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে পুরুষ সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে স্ত্রী সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কালযাপন করে। সেই জন্য তাহারা অপরের ভাবনা ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয়। এবং পরস্পরের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে

অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী হইয়া সর্ব্বদাই কলহ করে এবং যার পর নাই অসুখী হইয়া পড়ে। মূর্খতা ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতাবশতঃ অন্য দেশেও যেমন এ দেশেও তেমনি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কলহ হইয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্পিত তাচ্ছিল্য লইয়া অথবা মনোযোগের কড়াক্রান্তি কম হইয়াছে অথবা তদ্রূপ অপর কোন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশে হইয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহাদের প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আত্মবিশ্লিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষ দুইজনে এক হইয়া এক মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হয়। যদি তাহাতে কাহারো ত্রুটি হয়, তবেই তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুবা নয়। অতএব বোধ হয় যে আপনার উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক, এবং এবং ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজসেবার জন্য যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন না করাই ভাল। স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াই সম্ভব।

হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা

যাউক, সেই বিবাহক্রিয়া অনুসারে হিন্দু ভার্য্যা কি বস্তু হইয়া দাঁড়ান। ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে চুক্তি বই আর কিছুই নয়। অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরের তুল্য, কেহ কাহার বড় নয়, কেহ কাহার ছোট নয়, স্বামী ও যত বড় এক জন, স্ত্রী ও তত বড় এক জন। হিন্দুপত্নীও কি হিন্দুপ্রতির সম্বন্ধে তাই? দেখা যাউক।

হিন্দু-বিবাহরূপ যে কার্য্য তাহা চুক্তি অথবা contract নয়। ইংরাজি বিবাহ যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহন করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরুষকে পতিরূপে গ্রহন করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পন্ন হইয়া যায়, হিন্দু বিবাহ তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহে প্রথম কার্য্য—দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্ত্তা বরকে কন্যা দান করেন। কিন্তু সে দানের গুণে কন্যা বরের ভার্য্যা হন না। বরের সম্পত্তি হন মাত্র। মনু বলিয়াছেনঃ—

সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥ (৯অ-৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার—সাধুদিগের এই তিন কার্য্য এক বার।

এ কথার তাৎপর্য্য এই, সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও যেমন এক বারের বেশি দুই বার দান করিতে পারা যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের বেশি দুইবার দান করিতে পারা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন্যাদান করার অর্থও তাই। এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহিতার

যেরূপ স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহিতার সেইরূপ স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে। আর এক স্থলে মনু একথা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥ (৫অ-১৫২)

বিবাহ কালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ।

এখানে স্বামিত্বের অর্থ অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব সম্প্রদানরূপ কার্য্যের গুণে কন্যা ভার্য্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হন মাত্র। ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্পত্তি হন মাত্র। বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু অর্থ আছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাহাকেই তাঁহারা পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মনুঃ—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯অ-৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ।

এই চমৎকার কথার যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য তাহা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। জানা গেল যে হিন্দু শাস্ত্রকার দিগের মতে, ভার্য্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি, ভার্য্যা

ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন তাঁহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, নহিলে পুরুষ কি প্রকারে তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া তাঁহার দ্বারা তাঁহার আপনার অভাব পূরণ করিবেন? দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যায় না। প্রভু ও কৃতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক চুক্তিমূলক, তাহাদের মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্য্যের দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন। পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। স্ত্রীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব ও মহত্ত্বের কথা? পতির উদ্দেশে এত আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মতন সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একটা হিতকর বা সম্মানসূচক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্তি সৃষ্টি হয়, ভার্য্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব জন্মে তাহা এই :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।

তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ (৮অ-২২৭)

পাণিগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্রকৃত দারলক্ষণ। সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়—বিজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

সপ্তপদীগমনরূপ যে একটি প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যতক্ষণ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন

হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন:—

ভার্য্যাশব্দোযূপাহবনীয়াদিবদলৌকিকাঙ্গসঙ্গেনালৌকিক সংস্কার-যুক্তোস্ত্রীবচনঃ।

(উদ্বাহতত্ত্ব)।

যেমন যূপ বলিলে যে সে পশুবন্ধন কাষ্ঠ বুঝায় না, যেমন আহবনীয় বলিলে যে সে অগ্নি বুঝায় না, কোন অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা অগ্নি বুঝায়, তেমনি ভার্য্যা বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায়।

পশু বাঁধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি দুইই অতি সামান্য জিনিষ—পথের ধূলা যেমন সামান্য জিনিষ, তেমনি সামান্য জিনিষ—কাহারো কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু ধর্ম্মযাজক যখন সেই কাষ্ঠ অথবা অগ্নির সহিত একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর পথের ধূলার ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবতা অথবা দেবত্বের ন্যায় একটি অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে, এ কথার অর্থ, মনুষ্যবুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় না এমন পদার্থ হইয়া পড়ে, মনুষ্য বুদ্ধির কাছে রহস্যবৎ এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়া পড়ে, মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা যাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে তদপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়া পড়ে। হিন্দুভার্য্যাও তাই। দানগ্রহণের গুণে যে স্ত্রী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য বস্তু বই আর কিছুই নয়, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের

অলৌকিক গুণে সেই স্ত্রী অলৌকিক্ সংস্কার-প্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় পবিত্র, দেবতুল্য, অলৌকিক পদার্থ। হিন্দুপত্নী পতির সম্পত্তি বটে, কিন্তু পতির সম্বন্ধে অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি অলৌকিক, অতি দেবতুল্য বস্তু। সে বস্তুর মর্য্যাদার, সে বস্তুর পবিত্রতার, সে বস্তুর দেবত্বের কি সীমা আছে? ভগবান মনু শিক্ষাগুরুকে পিতা-মাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন, বলিয়া সেই শিক্ষাগুরুকে আহবনীয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন (২অ-২৩১)। আবার রঘুনন্দন বলিলেন, আহবনীয়ও যা, হিন্দুভার্য্যাও তাই। একবার হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ, হিন্দুভার্য্যার কি পদ, কি মহিমা! যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ যাঁহার আরাধ্য দেবতা, যজ্ঞের আহবনীয় যাঁহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠও যা যজ্ঞের আহবনীয়ও যা ভার্য্যাও তাই! আবার বলি, হিন্দুর চক্ষে দেখ বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুভার্য্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল সবই! হিন্দুর ধর্ম্মভাবে ভোর হইয়া দেখ বুঝিতে পারিবে, হিন্দুভার্য্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবী-মাহাত্ম্যে মণ্ডিতা! যত দূর পার হিন্দুর অলৌকিক শব্দের অলৌকিক অর্থ ভাবিয়া দেখ, চিত্ত এই ভাবে ভরিয়া উঠিবে যে মানুষ যতদিন মানুষ অপেক্ষা বড় না হইবে, ততদিন হিন্দু ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব যে কি অননুভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি—হিন্দু ভার্য্যা হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না দেবতার ন্যায় মনুষ্যের সম্পত্তি আর কি আছে? মানুষ

যদি দেবতাকে নিজের সম্পত্তি মনে না করেন, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? হিন্দুশাস্ত্রকার ভার্য্যাকে পতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তাহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্য্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর, তাঁহার ভার্য্যাও তেমনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর। ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সংসারধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে যথার্থই দেবতার প্রয়োজন হয়। যে যেখানে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেবশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ বনবাসরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুভার্য্যার এই অর্থ। হিন্দুভার্য্যা কি সামান্য জিনিষ!

ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে স্ত্রীজাতিকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ম্মই প্রথম স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাল

এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি হিন্দুবিবাহপ্রণালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতের হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"—যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন (মনু ৩অ-৫৬)।

বিবাহ দ্বারা স্ত্রী কি বস্তু বা পদার্থ হইয়া থাকেন তাহা দেখা হইল। বিবাহিতা স্ত্রীর কাহার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা এখন বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ সে সমস্ত সম্বন্ধ না বুঝিলে বিবাহের উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝা যায় না।

এখন যেমন এ দেশে প্রায় দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ হইত না। পূর্ব্বকালে উপনয়নের পর সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পত্নীগ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার রীতি ছিল। মনুর ব্যবস্থা এই :—

> ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
> তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥
> বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
> অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ (৩অ-১৪২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক হইলে ততোধিককাল, অথবা তাহার অর্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি, বা একটি ভিন্ন বেদ-শাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

অতি উত্তম ব্যবস্থা। ব্রতাবলম্বীর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি উন্নত শাস্ত্র সকলের মর্ম্মগ্রহণ করত জ্ঞানবান্ ও বিদ্যানুরাগী হইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর আর না কর, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই ; সুতরাং এখন দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এরূপ হইতে পারিত না। এখনকার ন্যায় তখন বিবাহ সখের খেলা ছিল না, মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত। মনু বলেনঃ—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ (৯-৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুর দর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা সামান্যতঃ উদাহরণ মাত্র। ফলে, পুরুষের বয়স কন্যার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া চাই। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ অল্প-বয়সেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে কন্যার পিতৃকুলের উপরনীচে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। কি জন্য তাঁহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স এবং কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সে তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণালীর মতন নয়। এখানে যাহাকে একান্নবর্ত্তী পরিবার বলে, ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলণ্ডে শুধু পতিপত্নী লইয় পরিবার। এখানে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, ভাই, ভগিনী, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা প্রভৃতি লইয়া পরিবার। কাজেই ইংলণ্ডের পত্নীর একমাত্র সম্বন্ধ পতির সহিত। এখানে যত গুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ, বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ। যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই দুইটী শিক্ষার প্রকৃতিও

এক নয়। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে অনেক কর্ত্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক কর্ত্তব্য কষ্ট করিয়া শিখিতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অল্প বয়স হইতে পতির পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায় না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, বয়োধর্ম্ম বশতঃ শুধু পতির প্রতি স্ত্রীর এতই অনুরাগ হয় যে অপরের প্রতি পারিবারিক নিয়মানুসারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে সে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। আরো এক কথা। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে। কিন্তু যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ তাহার অনেকের মনের মত হওয়া আবশ্যক। কিঞ্চিৎ রূপ, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য, কিঞ্চিৎ হাবভাব থাকিলে পত্নী পতির মনের মত হইতে পারে। কিন্তু অপরের মনের মত হইতে হইলে, সে সব গুণ কার্য্যকর হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা শিক্ষিত হইলেই ভাল হয়। সে রকম শিক্ষা অল্প বয়সে যত সহজলব্ধ ও কার্য্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব। ফল কথা, যাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয় এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায় :—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।

ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন :—শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে :—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলোভূয়াসম্।

হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি যেমন অচল আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, পতির পরিবারে সকলের সহিত পত্নীর সুখ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি কাহারো প্রীতিপ্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন না।

ইংরাজপত্নীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে পতি-কুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দু-স্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হিন্দুপত্নীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম তাহা ছাড়া তাহার আর একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ পত্নী মাত্রেরই

আছে; কেননা তাহা পতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু বোধ হয় যে পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয়। অন্য দেশে পত্নী পতির সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক না, তাহাতে পার্থক্যের ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লোক সাধারণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্যমূলক পৃথক্ পৃথক্ স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান হইয়া থাকেন। ইংরাজ পতি এবং পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং মহাকবি শেলির *Revolt of Islam* নামক কাব্যে এবং কতিপয় গদ্যে রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্বল্যমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্নীকে একটি ব্যক্তি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ পুরুষ হইবেন। মনু বলেন:—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯অ-৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ।

হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সেই একত্ব সাধন। যথা—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন :—বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবায়ু, * প্রজাপতি, উপদেষ্ট্রী দেবতা, ইহারা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি নিযুনক্তু মহ্যম্।

তুমি আমার কার্য্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন।

বিবাহ সমাপনে অন্ন ভোজনকালে বর বধূকে কহিতেছেন:—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে॥

অর্থাৎ—যাহা মহারত্ন আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধন স্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

---

* ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থে হলায়ুধ মাতরিশ্বা শব্দের প্রাণবায়ু অর্থ করিয়াছেন।

এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয় ইহা তোমার হৃদয় হইক।

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। তাঁহারা সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী। সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন ঃ—

" প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

কড়াক্রান্তিটী বাদ পড়িবে না। পূর্ব্বের সেই কড়াক্রান্তির কথা মনে আছে ত?

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকি। সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন আমরা কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে যেমন পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২ আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ আবার ১ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ম্ভু নিজ

দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে*। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভূ ও যা, মুক্তিও তাই। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যও মুক্তি। তাই হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্গতি লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহ-নিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক। তাঁহারা বলেন, "স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হন এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন †।" পত্নীর ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ (৫অ ১৫৫)

স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই, স্ত্রী কেবল পতি-শুশ্রূষা করিয়াই সুরলোকধন্যা হন।

এবং পতির ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

(১) পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু।

অর্থাৎ, ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু।

---

* "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই শরীর এক হইয়া যায়"—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতমহিলা নামক গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা।

† ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা।

(২) দারাঃ পরা গতিঃ।

অর্থাৎ, ভার্য্যা পতির পরম গতি।

(৩) এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহলোকে পরত্র চ॥

অর্থাৎ, ভার্য্যা শুধু ইহকালের জন্য নয়, ইহকাল ও পরকালের জন্য; এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে।

(৪) রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্ত মবেক্ষ্য হি।

অর্থাৎ মনুষ্যের রতি প্রীতি ও ধর্ম্ম ভার্য্যারই আয়ত্ত।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুশাস্ত্রমতে পতি এবং পত্নী, উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি—উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হৃদয়, এক উদ্দেশ্য, এক স্বর্গ, এক নরক। অবার বলি, পতি-পত্নীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে *।

* ভারতে বলিয়া এ কবিত্ব মানুষের জীবন প্রণালীতে দেখিতে পাওয় যায়। অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্মা কবির কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষায় থাকে, যথা শেলি :—

"We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh! wherefore two?
One passion in twin-hearts, which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same,
Touch, mingle, are transfigured; ever still

কিন্তু পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে গড়িয়া লওয়া আবশ্যক। পতি নিজে যেমন, তাঁহার পত্নীকে তেমনি করিয়া লওয়া চাই। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা চাই। পত্নী পতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য গোড়ায় ভিন্ন হয় না। পরকে সর্ব্ব রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব্বস্ব আপনার

Burning, yet ever inconsumable :
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser pray,
Which point to Heaven and cannot pass away
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds ; one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation."

এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিন্দু-দম্পতির একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং কর্ম্মের। কবির একত্ব শুধু অন্তর্জ্জগৎ লইয়া, হিন্দু-দম্পতির একত্ব অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎ দুই লইয়া। কবির একত্বের সঙ্গীত নির্জ্জন নীরব স্থানে ভিন্ন শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতির একত্বের সঙ্গীত পৃথিবীর সুপ্রশস্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একতানে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একত্ব poetic, হিন্দু-দম্পতির একত্ব cosmic। কবির একত্ব lyric, হিন্দু দম্পতির একত্ব dramatic। নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক থাকে না। হিন্দু-দম্পতির একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব।

হাতে রাখা চাই, পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়োধিক্য হইলে তাহার সর্ব্বস্ব আপনার হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মনের মত চেলা করিতে হইলে, মহান্ত বালক দেখিয়া চেলা নিযুক্ত করেন। পশুশাবক যেমন পোষ মানে, বড় পশু তেমন পোষ মানে না। রাম সীতাকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেনঃ—

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াম্ সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥

(উত্তরচরিত)

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি; এমনি প্রণয় যে আমার হৃদয়ের যে ভাব, তাঁহার হৃদয়েরও সেই ভাব, কোন ভেদ নাই। তাঁহাকে আজ কি না ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিতা পক্ষিণীটিকে বধ করিতেছি।

ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে, তাহার বালিকা

হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন,না অনিষ্টকর? ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, তাহা এক রকম বুঝাইলাম। অনিষ্টকর কি না, তাহাই এখন বুঝাইব।

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া যদি চিরকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষের শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অতএব বিবাহের বয়স সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ? দুইটি ব্যক্তিকে যদি একটি কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহারা এক-মন এক-প্রাণ হইলেই কর্ম্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক জনের কম অনুরাগ বা কম যত্ন হইলে কার্য্যটিও সুসম্পন্ন হয় না এবং দুইজনের মধ্যে কেহই কর্ম্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তিলাভ করে না। অতএব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং পত্নীর এক-মন এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, স্ত্রী এবং পুরুষ, এই দুই লইয়া মনুষ্য। স্ত্রী ঋক্, পুরুষ সাম; স্ত্রী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ *। পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণ জগৎ হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিলন না হইলে মনুষ্য হয় না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং

* সমাহমস্মিঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবীত্বং।

পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয়। কাজেই পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি দুই জনকে সম্পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিশিয়া এক হওয়া আবশ্যক। মিশ্রণে যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্রব্যকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের সহিত মিষ্ট দ্রব্য মিশাইতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিষ্ট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব-সাধক। তাই বলি. যদি ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা জীবন পবিত্র করিতে হয় তবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্ম্মচর্য্যা না করিলে ধর্ম্মচর্য্যা অঙ্গহীন এবং এক রকম অসম্ভব হয়। দুইটি হৃদয়রূপ দুইটি নদী মিলিয়া একটি ধারায় অনন্তে মিশিতে না পারিলে মানুষের জীবনরূপ আহুতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে দেবার্চ্চনা করিয়া কি আশ্ মিটে? হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ। সে উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং গূঢ় তথ্যমূলক, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

যাঁহারা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাইয়া এক করিলে, দুই জনের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে, তাহার স্বাধীন এবং সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না। একথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই না ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্য? শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য, না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? যদি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না

যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লইয়া কি হইবে? যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয়? এবং মানুষ কি তাহা করে না? সামাজিক জীবনের অর্থই ত তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎ পরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরের সাহায্যে আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যায় সঙ্গত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে দুই জনের যে পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, একমনে, একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইলে কি পতি, কি পত্নী,

কাহারো পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয় প্রগাঢ় প্রণয়স্থলে সেটুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না।

যাঁহারা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরো দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে, হিন্দু, পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিবাহকালে বর কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন:—

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমার ন্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি।

তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন:—

ওঁ ধ্রুবাদ্যোঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে, ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্॥

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু-শাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং প্রতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি পতিপত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। তাঁহারা যে পত্নীপতির সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক তাহা নয়। কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা,

আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায় সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ হয়, পরশ্ব তাহা অদৃশ্য হউক, মোট্ কথা, পতি এবং পত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউন।* ইংরাজ বলেন, পতি এবং পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে পরশ্বই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন. আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতি-পত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে

---

* বিবাহান্তে বর, অগ্নি ও সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ—

(১) ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

হে সর্ব্বদোষহর অগ্নি! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ই হার (এই কন্যার) পতিবিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর।

(২) ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি। যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

হে সর্ব্বদোষহর সূর্য্য! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এইজন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইঁহার (এই কন্যার) গৃহধর্ম্ম-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর।

চান। ইংরাজ পতিপত্নীর বিরোধে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য গ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্রভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটি তাৎপর্য্য আছে। একটি তাৎপর্য্য এই, হিন্দু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যত দিন যায়, তিনি ততই পতিতে মিশিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজরমণীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য তাঁহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ তাঁহাতে থাকিলে পতি তাহা নষ্ট করিতে অক্ষম হন, এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালীর এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি তাৎপর্য্য এই, অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতিকর্ত্তৃক প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইতে পারেন না ইংরাজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না—অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরাজ অল্প বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সংস্কার ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটি হওয়া উচিত নয়। সেটি হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ যখন মিলিত হইবে তখন তাহারা পরস্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীন থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। কোন একটি কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না! আপনিই প্রধান এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আত্মপ্রিয়তা ইংরাজি বিবাহ-প্রণালীর মূল সূত্র। তাই ইংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত যত্নবান। হিন্দুর বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া, হিন্দু বিবাহ-গ্রন্থি আঁটিয়া রাখিতে চান। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল, না জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে তবে এমন হইতে পারে যে তোমারই সুখ হইল; আর কাহারো কিছু হইল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী হইবে। এ জগতে একলা থাকিবার যো নাই; পশু একলা থাকিতে পারে, মানুষ পারে না। আবার সকল পশুও একলা থাকিতে পারে না, মানুষ ত দূরের কথা। যদি পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হইল, তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ

করিতে পারিলেই এ জগতে এ জীবনের কার্য্যটা এক রকম করা হইল না? কিন্তু সেই মহৎ কার্য্য সাধনার্থ যদি স্ত্রীপুরুষের মিলন আবশ্যক হয় তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না ভাবিয়া সেই মহৎ কার্য্যটি বড় ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না? যদি বল যে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয় হউক; কিন্তু যে মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল, সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যোদ্দেশে মিলিলে মিলনটা যত মহৎ এবং মনুষ্যত্বসূচক হয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে মিলিলে তত হয় না। এ কথা যদি ঠিক হয় তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে বা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ; যিশু খৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য? না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া বা স্বার্থসাধনার্থ স্বাধীনতা নষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু মনুষ্যজীবনের মহৎ কার্য্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধীনতার

বিলোপ হয়, সে ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকার্য্য সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা কহিবার যো নাই। মহৎকার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও তাহা ত দূষণীয় দান নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দু করেন।

বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দুবিবাহে স্ত্রীপুরুষের যে মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গলসাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? তবেই ত বোধ হয় যে হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের বেশী বয়সে ও স্ত্রীর বাল্যাবস্থায় বিবাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

তুমি বলিবে যে এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার এখনও ত এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ এখনও অল্প বয়সে হইবে না? আর যে সকল ইংরাজি শিক্ষিত

ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া একলা একলা থাকেন বা থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও বলি যে, অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পতি অনেক সময় পত্নীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্নীকে পতির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া তাঁহার চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাকে পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পত্নীকে নিজের মনের মত করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন মহৎ, প্রীতিকর এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ পুরুষের আর কি আছে! এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও মহাপাপ!

বাল্যাবস্থায় স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থার আর একটী প্রধান কারণ কড়াক্রান্তির কথায় বুঝাইয়াছি।

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতিহস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই যে, পতি বালিকাপত্নীর সহিত অযথা ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু

বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের ফল তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহার জন্য নয়। যে দেহের প্রয়োজনে বিবাহ করে সে পশু, বালিকারূপ পবিত্র বস্তু তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, অর্থাৎ যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহারই প্রাপ্য। যিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণতবয়স্ক, উন্নতমানা, মহৎ আশায় মহিমান্বিত, তাঁহার পত্নী চিরকালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাঁহার সন্তান সন্ততি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প। তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে বিদ্যা দান করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহ্যশাসনে নাই। চোর বার বার জেলে যায়, তথাপি চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উন্নতিতে। এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা বড় কম বলিয়াই বাল্যবিবাহের অপব্যবহার হয়। এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য তত মনে নাই বলিয়াই, বিবাহের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ তত লক্ষিত হয় না বলিয়াই, বিবাহের ফল কদর্য্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম্ম প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীন হইতেছে। নৈতিক উন্নতি কর, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য অনুসরণ কর, করিয়া লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক, দেখিবে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ ধর্ম্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর

ঘরে জগতের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সপত্নীক হিন্দু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বীরপুরুষ হইয়াছে, দেশে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই—সকলই উন্নত, সকলই পবিত্র, সকলই বীরোচিত।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝা গেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে সে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা এবং সে বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতিপত্নীর সম্পূণ একীকরণ। কিন্তু বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব ধর্ম্মার্থ সামাজিকতা এক মাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। আর পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণ—ইহাও একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। এবং পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণের অর্থ সেই সমগ্রদর্শিতা ও সমগ্রগ্রাহিতা—যাহা সোঽহং-এ দেখিয়াছি, লয়ে দেখিয়াছি, কড়াক্রান্তিতে দেখিয়াছি।

যে উদ্দেশ্যে বিবাহ তাহা যে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে অনুসৃত হয় এমন কথা বলিতে পারি না। কোন দেশেই কোন সমাজেই এরূপ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুসৃত হয় না, ইহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ অনুসৃত হয় না। ইংরাজি বিবাহের উদ্দেশ্য হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহাও সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে অনুসৃত হয় না। কিন্তু আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য যে একেবারেই অনুসৃত হয় না, এ কথা বলিলেও মিথ্যা কথা কওয়া হয়। যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা করেন না তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পত্নীকে সহধর্ম্মিনী

বলিয়া বুঝেন এবং পত্নীর সহধর্ম্মিনী নাম সার্থক হয় পত্নীর সহিত এমনি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আর পত্নীর সহিত একত্বানুভূতি, ইহাও তাঁহাদের অনেকের থাকে। কিন্তু অনেকের আবার এ উদ্দেশ্য ও একত্ববোধ নাই। নাই বলিয়া কিন্তু এ উদ্দেশ্য মন্দ হইতে পারে না অথবা এই একত্বজ্ঞান দূষনীয় হইতে পারে না। অনেকে ধর্ম্ম মানে না বলিয়া ধর্ম্ম মন্দ জিনিষ হইতে পারে না। অনেক ইংরাজিওয়ালা কিন্তু তাহাই মনে করেন। বিবাহ বিষয়ক এই প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হইলে পর অনেকে ইহার যে প্রকার সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের মনের ঐ রূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। হিন্দু বিবাহের যে উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিস্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। পতিপত্নীর একীকরণের কথা লইয়াও সেই রূপ করিয়াছিলেন। যেন ধর্ম্মচর্য্যার্থ বিবাহ ও পতি পত্নীর একীকরণ বড়ই দূষণীয়! জ্ঞানী ও সাধু লোকে এরূপ করেন না। লোকে যাহাতে বিবাহের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য অনুসরণ করিতে শিখে, তাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে সেই কামনাই প্রবল হয়। কিন্তু যে সকল সমলোচনার উল্লেখ করিলাম তদ্বিষয়ে অধিক কথা অনাবশ্যক। রবীন্দ্র বাবু ভারতীতে একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে বিবাহ বিষয়ক কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথার কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যক হইয়াছিল। রবীন্দ্র বাবুর সমালোচনায় যে সকল কথা ছিল তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র এখানে উল্লেখ করিলাম:—

(১) হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা নয়, সংসারযাত্রা—প্রমাণ, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

(২) বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতিপত্নীর একীকরণ নয়।

(৩) পতির সম্বন্ধে পত্নীর পদ বড় নিকৃষ্ট—প্রমাণ, যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে দ্যূতে পণ করা।

(৪) বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ বাল্যবিবাহ, বঙ্গের জলবায়ুর দোষ নয়। জলবায়ুর দোষ কারণ হইলে বাঙ্গালার সুন্দরবনের বাঘের কথা কেহ শুনিতে পাইত না।

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে নবজীবনে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট হইল।

তেত্রিশ কোটি দেবতা।

[সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শিতা]

এখন একবার সেই সোহহং-এ প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

সোহহং—ইহার অর্থ আমি সেই; আর ইহার অর্থ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই।

অতএব সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই ব্রহ্ম।

জগৎ এবং জগদীশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে মনুষ্য মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং সেই জন্য জগদীশ্বর হইতে পৃথক। মুসলমান এবং খৃষ্টানের এই মত। আর একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নয়, জগদীশ্বরের রূপ, বিকার, বা বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে পৃথক নয়। হিন্দুর এই মত। হিন্দু যে সৃষ্টির কথা একেবারেই মানেন না এমন নয় এবং খৃষ্টান যে জগদীশ্বরকে জগৎ বলিয়া বুঝেন না তাহাও নয়। হিন্দু যখন বলেন—'সকলই তিনি করিয়াছেন'—তখন তিনি জগদীশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন বৈ কি; এবং খৃষ্টান যখন বলেন—'In Him we live and move and have our being'—তখন তিনি জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভাবেন বৈ কি। ফল কথা, জগদীশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল কথা মানিয়া থাকেন ও বলিয়া থাকেন। জগদীশ্বর

যথার্থই এমনি সর্ব্বময়, এমনি সর্ব্বরূপ, এমনি সর্ব্বস্ব যে তাঁহাকে সকল সংজ্ঞাই অর্পণ করা যায় এবং সকল রকমেই ভাবা যায়। তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদীশ্বর সম্বন্ধে এক একটি চিন্তাপ্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি যে হিন্দু প্রধানতঃ জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না, খৃষ্টান করেন। কোন্ মতটি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তাহা এস্থলে মীমাংসা করা যাইতে পারে না এবং মীমাংসা করিবার বড় আবশ্যকও নাই *। এখানে কেবল ইহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দ্বয়ের বিভিন্নতার সহিত মূর্ত্তিপূজার কি সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করেন না জগৎ তাঁহার কাছে নীচ বা অধম জিনিষ নয়, অতএব জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তিনি অপকর্ম্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে মূর্ত্তিপূজা দোষশূন্য। এ কথা যিনি বুঝেন, হিন্দু জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তিনি হিন্দুকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎকে তাঁহার অধম জিনিষ বলিয়া মনে করা সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দুষ্কর্ম্ম মনে করিতে পারেন। তাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ উহার বিরোধী। তাই ইউরোপ মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ

---

* পূর্ব্বে এ কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে—১ হইতে ১১ পৃষ্ঠা।

করা অতি গর্হিত কার্য্য। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার বড় ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলনা হয় না, অতএব জগতেরও তুলনা হয় না। সেই জন্য হিন্দুও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া বুঝিয়াও উহা জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়া অতএব অতি অসার এই বিবেচনা করিয়া জগন্মুক্ত হইতে কামনা করেন। কিন্তু জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বশতঃ স্রষ্টা জগদীশ্বরের সহিত তাহার তুলনা হয় না বলিয়া জগৎ যে অধম জিনিষ এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? ম্যাকবেথ সেক্ষপীয়রের সৃষ্টি, কুমার কালিদাসের সৃষ্টি। তাই বলিয়া সেক্ষপীয়র এবং কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া ম্যাকবেথ এবং কুমারকে কি অপকৃষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে? তা যদি না হয় তবে জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে? এবং জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয় তবে জগতের দ্বারা জগদীশ্বর কেনই না প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন? জগদীশ্বরের সহিত তুলনায় জগৎ অতি ক্ষুদ্র জিনিষ বটে; জগদীশ্বর এই জগতের মতন কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য হইবে? আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়া দেখ দেখি। সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় যে মনে করিলে তিনি আরও ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার মানসিক, শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুঝিয়া লও। কিন্তু সেক্ষপীয়র এতগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া বা আরও এতগুলি লিখিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন

এক খানি নাটক—ম্যাকবেথ বা হ্যামলেট বা ওথেলো—কি তাঁহার পরিচয় প্রদানের অযোগ্য ? তাঁহার এক খানি নাটক তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বলিয়া এক খানি নাটক তাঁহার যত টুকু পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তত টুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য ? শক্তি প্রসূত [illegible] ভক্তি অপেক্ষা কি এতই নিকৃষ্ট যে সে শক্তির প[illegible]ত একেবারেই অযোগ্য ? যদি তাহা [illegible] হয়, [illegible]ন করিয়া মানু-ষের কারা বা কীর্ত্তি [illegible] প্রতিষ্ঠিত করে ? কেমন করিয়া রণলব্ধ তরবারি [illegible] রাজ্যের প্রতিনিধি রূপে প্রদর্শিত হয় ? কেমন করিয়া [illegible] স্মরণার্থ মহোৎসবে মহাকবির মহাকাব্য তাঁহার প্র[illegible] প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শিতও পূজিত হয় ? কথায় বলে 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' কীর্ত্তিতেই মানুষ জীবিত। এখন দেখি মানুষের সৃষ্ট পদার্থ যদি সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মানুষের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের সৃষ্ট জড় সৃষ্ট বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বরের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য হইবে ? অতএব জড় সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া [illegible]ত অপকৃষ্ট এবং সেই জন্য জড়ের সাহায্যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা মহাপাপ বা অপকর্ম্ম [illegible] ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রান্ত। এবং এ দেশের [illegible] সকল লোক এই ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে [illegible] করিয়া এ দেশের মূর্ত্তিপূজাকে মহাপাপ বলিয়া [illegible] নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও ভ্রান্ত। কেন না তাঁহারা আপনাদের সত্যকে

ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করত অপরের ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

অতএব হিন্দুর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়াই ভাব না খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ বলিয়াই ভাব, কোন প্রণালীতেই জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দূষণীয় নয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে—জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ যদি প্রশস্ত কাজই হয় তবে তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন নয়। মানুষের সম্বন্ধে জগতেই জগদীশ্বরের বিকাশ। জগৎ না থাকিলে মানুষের জগদীশ্বরও থাকেন না। অতএব জগদীশ্বর কি, বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্মে জগদীশ্বরের স্বরূপ গ্রন্থে নির্ণীত আছে। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা জগতে জগদীশ্বরের অন্বেষণ অবৈধ কাজ মনে করেন না এবং সেই জন্যই Natural Theology বা প্রাকৃত দেবতত্ত্ব তাঁহাদিগের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বলিয়া গণ্য। ফল কথা, জগৎ দেখিয়াই জগদীশ্বরের রূপ বল, গুণ বল সকলই নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের রূপই জগদীশ্বরের রূপ, জগতের গুণই জগদীশ্বরের গুণ। কিন্তু বল দেখি, জগতের রূপ কি? জগতের গুণ কি? জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া তা হবে? বল দেখি, একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ? প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, তার পর আর এক রকম, তার পর আর এক রকম—প্রাতে এক রকম, মধ্যাহ্নে আর এক রকম, অপরাহ্নে আর এক রকম—অন্ধকারে এক রকম, আলোকে আর এক রকম—খেলিবার সময় এক রকম, খাইবার সময় আর এক রকম, আবার

ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যখন তাহার ঠোঁঠের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে তখন আর এক রকম। অতএব যদি প্রজাপতির মূর্ত্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে ও বুঝিতে হয় বল দেখি! বল দেখি একটি মানুষের মূর্ত্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে হইবে? মানুষ শৈশবে এক রকম, বাল্যে আর এক রকম, যৌবনে আর এক রকম, প্রৌঢ়াবস্থায় আর এক রকম, বার্দ্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকালে আর এক রকম। মানুষের রাগে এক রূপ, শোকে এক রূপ, ঘৃণায় এক রূপ, ঈর্ষায় এক রূপ, স্নেহে এক রূপ। অতএব একটি মানুষ বুঝিতে হইলে কতই মূর্ত্তি দেখিতে হইবে, কতই মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে! বল দেখি, এক খানি মেঘের, একটি নদীর কয়টি রূপ? তবে অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি রূপ, কেমন করিয়া বলা যাইবে? অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত রূপ তাহা কে নির্ণয় করিবে? প্রাতে এক রূপ, মধ্যাহ্নে আর এক রূপ, রাত্রিতে আর এক রূপ—সমুদ্রে এক রূপ, পর্ব্বতে আর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ—স্থির বায়ুতে এক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, ঝঞ্ঝাবাতে আর একরূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ! পৃথিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্যময় তখন আর এক রূপ, যখন হিমময় তখন আর এক রূপ, যখন ভীষণ অসীমকায় ম্যামথ ম্যাস্তদনে পরিপূর্ণ তখন আর একরূপ, যখন বিকটদর্শন বিষমায়তন সরীসৃপে পরিবৃত তখন আর এক রূপ, যখন মানবপূর্ণ তখন আর এক রূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ! আর রূপভেদে গুণ

ভেদ এবং গুণভেদে রূপভেদ হয় বলিয়া পৃথিবীর অশেষ, অগণ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। অতএব জগতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ দুইই অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। জগতে জগদীশ্বর যথার্থই দয়ালু, নিষ্ঠুর, সুন্দর, ভীষণ, উগ্র, শান্ত, উৎকট, কমনীয়—সর্ব্বরূপ সম্পন্ন, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। এই জন্য ও সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু জগদীশ্বরকে নির্গুণ এবং নিরাকার বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। যাহার রূপ বা আকার সর্ব্ব রকম, অর্থাৎ যাহার রূপের বা আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নিরাকার; এবং যাঁহার সকল গুণই আছে, অর্থাৎ যাহার গুণের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ।

জগতের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইতেছে, তখন জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে অসীমকে সসীম করা হইবে, অনন্তকে সান্ত করা হইবে, এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তি খর্ব্ব এবং অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। অতএব প্রকৃত মূর্ত্তিপূজায় জগদীশ্বর অসংখ্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত—অনন্ত পুরুষ অনন্ত আকার বিশিষ্ট। তাই হিন্দুর ব্রহ্মারূপ, বিষ্ণুরূপ, রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, কৃষ্ণরূপ, বরাহরূপ, কূর্ম্মরূপ মৎস্যরূপ, কালীরূপ, জগদ্ধাত্রীরূপ, তারারূপ, ছিন্নমস্তারূপ—অনন্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। মানুষের দেবতা-জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনন্ত পুরুষ কাহাকে বলে মানুষ তাহা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্থ—পৃথিবীর অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুর মনে

অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সে অনন্তত্ব আর কাহারো মনে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হয় নাই। হিন্দুর মন যেমন পূর্ণায়তন তেমন পূর্ণায়তন মন পৃথিবীতে আর কেহ কখন পায় নাই। আর হিন্দুর মনের উপলব্ধি শক্তি (power of comprehensive realisation) যেমন পূর্ণায়তন, তেমন পূর্ণায়তন উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা একটি অমূল্য তথ্য, তেত্রিশ কোটি দেবতা অত্যুৎকৃষ্ট মানব প্রকৃতির অনিবার্য্য অভিব্যক্তি। যেখানেই মানুষ অনন্ত জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বুঝিয়াছে সেই খানেই মানুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটি কোটি দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ কথার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। খৃষ্ট-ধর্ম্মে ঈশ্বর এক এবং একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। বাইবেলে সে প্রকৃতি কসামাজা, সীমানা-সর্হদ্দ বিশিষ্ট। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে সেই সীমানাসর্হদ্দ বিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দেয় না। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কীর্ণ হইলে মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল, সৃষ্টপদার্থের কাছে পূজার্থ প্রণত হইও না। কোলরিজ উচ্চ মণ্টব্লাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলেন।

> 'Thou too again, stupendous Mountain ! thou
> That as I raise my head, awhile bow'd low
> In adoration, upward from thy base.*

* Hymn before Sun-rise in the Vale of Chamouny নামক কাব্য দেখ।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবতা এবং সে দেবতা জগৎ হইতে পৃথক, জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষ সে কথা মানিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নামাইলেন, সেই এক দেবতাকে অসংখ্য করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সাহিত্য দেখ। কোল্‌রিজ একটি কাব্যে * বলিতেছেন—

"O what a goodly scene ; Here the bleak Mount,
The bare bleak mountain speckled thin with sheep;
Grey clouds, that shadowing spot the sunny fields;
And River, now with bushy rocks o'erbrow'd,
Now winding bright and full, with naked banks ;
And Seats, and Lawns, the Abbey, and the Wood,
And Cots, and Hamlets, and faint City-spire :
The Channel there, the Islands and white Sails,
Dim Coasts,and cloud-like Hills,and shorelessOcean--
It seem'd like Omnipresence ! God, methought,
Had built him there a Temple ; the whole world
Seem'd imaged in its vast circumference."

উচ্চ স্বর্গের ঈশ্বর নিম্নে পৃথিবীতে নামিলেন! যে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে পৃথক্ এবং সেই জন্য পৃথিবী অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন—যে জড়ের দ্বারা মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খৃষ্টীয়ানের মতে অপমানিত হন, সেই

* Reflections on having left a Place of Retirement নামক কাব্য দেখ।

জড়-নির্ম্মিত পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া তাঁহার একত্ব পরিত্যাগ করিয়া বহুত্ব প্রাপ্ত হইলেন :—

—"Eair the vernal Mead,
Fair the high Grove, the Sea the Sun, the Stars
True Impress each of their creating Sire!"

স্বর্গের এক ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া শুধু অসংখ্য হইলেন তা নয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর হইলঃ—

————————"Early had he learned
To reverence the volume that displays
The mystery, the life which cannot die,
But in the mountains did he *feel* his faith.
All things, responsive to the writing, there
Breathed immortality, revolving life,
And greatness still revolving infinite:
There littleness was not; the least of things
Seemed infinite; and there his spirit shaped
Her prospects, nor did he believe,—he *saw.*"

পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই ঈশ্বর—অসীম, অনন্ত। আবার পৃথিবীতে নামিয়া ঈশ্বর কেবল সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃথিবীতে তাঁহার রূপও অসীম। বাইরণ সমুদ্র দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাহাতে ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পাইলেন। আহা কতই রূপ!

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,—
Calm or convulsed, in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime

Dark-heaving—boundeess, endless, and sublime,
The image of eternity, the throne
Of the Invisible."

আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে ইংরাজ কবির বাহ্যজগৎ বর্ণনা জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইংরাজ কবি বাহ্য জগতের অনেক পদার্থে জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন—অনেক পদার্থে জগদীশ্বর খুঁজিয়া থাকেন, ইংরাজ কবির দেবতা একটি নয়, তেত্রিশ কোটি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে একটি বৈ দেবতা দেয় না বলিয়া, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কাব্যে কোটি কোটি দেবতার সৃষ্টি করেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে কোটি কোটি দেবতা দেয় সে ধর্ম্মের সেবক বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখে না, ঈশ্বর খুঁজে না, কাব্যে কোটি কোটি দেবতা সৃষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায় ঈশ্বরপ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। কিন্তু হিন্দুর সাহিত্য দেখ—কোথাও দেখিবে না হিন্দু কবি ইউরোপীয় কবির ন্যায় বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখিতেছে, ঈশ্বর খুঁজিতেছে, কোটি কোটি ঈশ্বর পূজিতেছে। হিন্দু কবি বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিতে বড়ই ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহার বাহ্য জগৎ বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্য জগৎ লইয়া উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, বাহ্য জগতের প্রাণে গাঢ় প্রবিষ্ট। সকলেই বাহ্য জগৎকে যত রকমে দেখিতে হয় তত রকমে দেখিয়াছেন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত রকমে বুঝিয়াছেন। সকলেই বাহ্য জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জীবন, মন, প্রাণ, হৃদয়, আত্মা

সকলই দেখিয়াছেন। কিন্তু কেহই বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খুঁজেন নাই, কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথা এখন বলিতে পারিব না— বলিবার স্থান নাই। কেবল দুইটী পদার্থের কথা বলিব। পর্ব্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীশ্বরের কথা যেমন মনে পড়ে, আর কিছু দেখিলে তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে মহাকবি বাইরণ সমুদ্রে জগদীশ্বরের কি পরিষ্কার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই দেখিলেন! কিন্তু ভারতে কবিগুরু বাল্মীকি সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিহ্নমাত্রও দেখিলেন না। অগাধ অসীম সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার মনে ঈশ্বর-প্রেম ঈশ্বর-ভক্তি উথলিয়া উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছেন—

সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্॥
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ॥
চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মিভিঃ॥
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিল মহাগ্রাহৈঃ কীর্ণন্তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ॥
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্ব্বরুণালয়ম্।
অবগাহং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্॥
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ॥
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।

অগ্নিচূর্ণনিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা॥
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্ব্বিশেষমদৃশ্যত॥
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা।
তাদৃগ্রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে॥
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ।
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎসাগরস্যাম্বরস্য চ॥
অন্যোঽন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ।
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্য ইবাম্বরে॥
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা।
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধঃ যাদোগণসমাকুলম্॥
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্।
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্ম্মিভিঃ॥

(যুদ্ধ কাণ্ড, ৪র্থ সর্গ।)

"উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই; চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তু সকল প্রচণ্ড

বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল, উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিনীত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভবে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

(হেমচন্দ্রের অনুবাদ)

জর্ম্মণির ফ্রেদরিকা ব্রুণ, ইংলণ্ডের কোল্‌রিজ ক্ষুদ্র মণ্ট ব্লঙ্ক শৃঙ্গে জগদীশ্বর দেখিয়া নতশিরে তাঁহার স্তুতি গান করিলেন। ভারতের কালিদাস গিরিশ্রেষ্ঠ হিমাচল দেখিয়া একবার জগদীশ্বরের নামও করিলেন না। কুমারে হিমালয় বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ, অতএব এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিত্বে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম, ইশ্বরমোহের চিহ্ন মাত্র নাই। সংস্কৃত কবির সকল জগদ্বর্ণনাই এইরূপ। তাহাতে সবই আছে, কেবল ঈশ্বর নাই। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রই এ কথা জানেন।

এ আশ্চর্য্য প্রভেদ কেন হয়? এ আশ্চর্য্য প্রভেদের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত পুরু-

যকে নির্দ্দিষ্ট সীমানা-সরহদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হৃদয়স্থিত অনন্তের-আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া রাখে বলিয়া এবং ইউ-রোপবাসীর ঈশ্বরপিপাসা মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাহ্য জগতে,প্রত্যেক বাহ্য পদার্থে—সমুদ্রে,সরোবরে,প্রস্তরে,পর্ব্বতে, গাছে,পাতায়,লতায়, ফুলে, ফলে—ঈশ্বর খুঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পূজা করেন। আর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত পুরুষকে অসংখ্য মূর্ত্তিতে দেখাইয়া হিন্দুর হৃদয়স্থিত অনন্তের-আকাঙ্ক্ষা পূরাইয়া তুলে বলিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইয়া দেয় বলিয়া হিন্দুর বাহ্য জগতে—সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তরে,পর্ব্বতে,গাছে,পাতায়,লতায়,ফুলে,ফলে—ঈশ্বর খুঁজিবার, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিবার, ঈশ্বর পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয় কবির জগদ্বর্ণনা এবং হিন্দু কবির জগদ্বর্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে মানুষ ধর্ম্মশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা না পাইলে, কাব্যে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি করে। আর সে কথার অর্থ এই যে,যেমন করিয়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা না হইলে চলে না। মানুষ এক অনন্ত পুরুষ ধারণা করিতে পারে না। তাই এক অনন্ত পুরুষকে কোটি কোটি পুরুষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব উপলব্ধি করে। একে অনন্ত—এ বড় বিষম ধারণা,এক অনন্তেরই আয়ত্তাধীন। অনেকে অনন্ত অথবা অনন্তে অনন্ত—এ কিছু সহজ ধারণা,মানুষের আয়ত্তাধীন। মানুষ সংখ্যা দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে। দুইখানি সমতেজসম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্রের মধ্যে যদি একখানি অল্প সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, আর একখানি

অধিক সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, তবে প্রথমোক্ত খানিকে দ্বিতিয়োক্তাপেক্ষা কম তেজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি দুই খানি মাত্র নাটক লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এত বড় মনে হইত না। পৃথিবীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উদয় হইত কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন জগৎ অনেক না হইলে, জগতে অনেক না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উঠিত না। সেই অনেকে অনন্তের, সেই অনন্তে-অনন্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। মনে করিও না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা—সকলে সেই এক অনন্ত পুরুষ নয়। যে হিন্দু প্রত্যেক দেবতাকে বলেন—তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা—সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক অনাদি অনন্ত জগদীশ্বর—সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার সকল দেবতাই সেই এক অনাদি অনন্ত জগদী-শ্বরের এক একটী শক্তি—জীবনদায়িনী শক্তি, সৌভাগ্যদায়িনী শক্তি, বিদ্যাদায়িনী শক্তি, সিদ্ধিদায়িনী শক্তি, সন্তানদায়িনী শক্তি, সৃষ্টিকারিণী শক্তি, পালনকারিণী শক্তি, সংহারকারিণী শক্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জগদীশ্বরের জগৎ তাঁহার তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িলে অনেকগুলি মূর্ত্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্র হইবে? হইলই বা। তাহাতে ক্ষতি কি, দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ্বর প্রেমময়, অতএব শান্ত এবং

সুন্দর, তাঁহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন করা বড়ই গর্হিত কার্য্য হইবে। আমি বলি, তিনি সুন্দর বটে, কিন্তু আমি যে তাঁহাকে অনেক সময় ভীষণ দেখি। সুন্দরকে ভীষণ দেখিলে আমার মন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমি কি সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিয়া আমার ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়, প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভয় দেখান? জননীর সে কুঞ্চিত ভ্রূ কি কেবলই ভীষণ, সুন্দর নয়? আহা! সে কুঞ্চিত ভ্রূ বড়ই সুন্দর, কেন না বড়ই স্নেহে সে ভ্রূ কুঞ্চিত। জগদীশ্বরও তাই। তিনি প্রেমে ভীষণ; কেন তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভাবিব না? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই সুন্দর নয়? আর যদি তাঁহাকে সকল সময়ে প্রেমময় বলিয়া নাই বুঝিতে পারি, যদি তাঁহাকে কখনও কেবল ভীষণ বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভাবিব? তিনি যদি আমাদের আদ-রের সামগ্রী হন, তবে তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভাবিলেও কি আনন্দ হইবে না? আর ভীষণ ভাবিয়া তাঁহাকে না ভাবিলেই বা তাঁহার ধ্যান পূর্ণ হইবে কেন? অজ্ঞানের কাছে অন-ন্তত্ব এবং ভীষণত্ব যে একই জিনিষ। আর পূর্ণ দেখা না দেখিলে দেখিয়াই বা সুখ কি?

আরো এক কথা। এমন হইতে পারে যে তুমি পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দরই মনে কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাস। তুমি আজিকার পৃথিবীতে বাস করিতেছ বলিয়া এইরূপ ভাবিতে

পারিতেছ। আজিকার পৃথিবীতে মানুষ সর্ব্বপ্রধান—স্বয়ং প্রকৃতিই আজ অনেকাংশে মানুষের অধীন। মানুষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত—মানুষের আজ অতুল সম্পদ। অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য বৃহদাকার হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বস্ত্রহীন, আবাসহীন, সংখ্যায় দুই চারিটি, তখনও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং পৃথিবীর পতি জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ভীষণ দেখে নাই? আর জগদীশ্বরের সে মূর্ত্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির জাতীয় জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি ছিল সে মূর্ত্তি ভুলিলে, সে মূর্ত্তি ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্ত্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে? অথচ সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে না পাইলে ত জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দর্য্য, সম্পূর্ণরূপ, সমস্ত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারা যায় না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিংস্র জন্তুর ভয়ে, অস্ত্রাভাবে, বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজসম্পদের অধিকারী। বল দেখি, জগদীশ্বরের কেমন পৃথিবী কেমন হইয়া উঠিয়াছে, আবার যুগযুগান্তর পরে আরো কেমন হইয়া উঠিবে! জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি—নরকতুল্য অবস্থা হইতে স্বর্গতুল্য অবস্থায় পরিণতি—দেখিলে

জগদীশ্বরের প্রেমের এবং সৌন্দর্য্যের ভাব মনে উদয় হয়, জগতের একটি মাত্র অবস্থা দেখিলে সে ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না। ঐতিহাসিক জগদীশ্বরকে না দেখিলে, মানব জাতির জগদীশ্বরকে না দেখিলে, জগদীশ্বরের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখা হয় না, কিছুই বুঝা হয় না, মানবকুলের, জীব-কুলের, ভূতরাশির অখণ্ডত্ব ও অসীমত্বও হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই বলি, জগদীশ্বরের কোন মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিও না, পরিত্যাগ করিলে জগদীশ্বরকে দেখা হইবে না, মানবকুল, জীবকুল, ভূতরাশিও দেখা হইবে না। আর জগদীশ্বরকে না দেখিলে, সমস্ত মানবকুল, সমস্ত জীবকুল, সমস্ত ভূতরাশিকে—বৈদিক মানব, দার্শনিক মানব, পৌরাণিক মানব, ম্যামথ, ম্যাস্তোদন, গজ, অশ্ব, সিংহ, বরাহ, কূর্ম্ম, গরুড়, হংস, পেচক, ময়ূর, মূষিক, জল, স্থল, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, অন্ন, বস্ত্র, শব্দ, গন্ধ, রস—এই সমস্তকে সঙ্গে লইয়া জগদীশ্বরকে না দেখিলে জগদীশ্বরের পূজা করিয়া সুখও হইবে না। হিন্দুর মন বিশ্বব্যাপী, সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রদর্শী বলিয়া হিন্দু জগদীশ্বরের এত মূর্ত্তি দেখেন, এবং জগদীশ্বরের এত মূর্ত্তি দেখেন বলিয়া হিন্দু জগদীশ্বরের পূজায় এত পাগল, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

দেখা গেল অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষকে যাহা দেয় না, হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দুকে তাহা দেয়। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দুই পাঁচ জন যাহা তৈয়ারি করিয়া লয় হিন্দুশাস্ত্র সমস্ত হিন্দুকে তাহা তৈয়ারি করিয়া দেয়। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহা প্রণালী বহির্ভূত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালী। এ প্রভেদের কারণ, অন্য ধর্ম্মে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক,

হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড একই। অন্য ধর্ম্মে সোঽহং নাই, হিন্দুধর্ম্মে সোঽহং আছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শিতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। আর এ লক্ষণেরও অর্থ সমগ্রদর্শিতা ও সমগ্রগ্রাহিতা।

প্রতিমা বা মূর্ত্তিপূজা।

[ধর্ম্মে অধিকারদর্শিতা

—ফল—

ধর্ম্মে রাজনৈতিকতা]

হিন্দুশাস্ত্রে সাকার নিরাকার উভয়বিধ পূজারই ব্যবস্থা আছে। নিরাকার পূজার ব্যবস্থা জ্ঞানীর জন্য, সাকার পূজার ব্যবস্থা অজ্ঞানের জন্য। সাকার পূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। খৃষ্টীয়ান মুসলমান প্রভৃতির মুখে সাকার পূজার বড়ই নিন্দা শুনা যায়। অতএব সাকার পূজার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, দুইটি ভিন্ন রকম জিনিষ বলিয়া অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্কে আবদ্ধ, যে একটি অপরটিকে ছাড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় না, একটির চরিতার্থতা অপরটিতে। দেহ—মনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু—দেহকে পাইলে তবে মনের পরিতৃপ্তি হয়। সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি—কিন্তু সন্তানকে কোলে করিলে তবে জননীর হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। বন্ধুত্ব মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে; কিন্তু সেই মনে মনে, সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত মিল, যত মিশামিশি, দেহে দেহে আলিঙ্গন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল,

হৃদয়ের মিশামিশি অসম্পূর্ণ, তত দিন কেবল কথাবার্ত্তা; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি ষোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাসনে বসিয়া একত্রে ভোজন। ভগ্নপ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া যান; অভিমানিনীর হৃদয়ের তুফান-রাশি একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে মিলাইয়া যায়। আবার মন—দেহের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃপ্তি হয়। সুসন্তানকে কোলে করিয়া জননীর কোল যত পরিতৃপ্ত, কুসন্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। সুন্দর দেহে সুন্দর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের সুখ হয় না। অন্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরম মূর্ত্তি। অতএব প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর কাছে জগতে দুইটি জগৎ নাই—জগতে একটি মাত্র জগৎ।

দেহ এবং মনের, জড়জগৎ এবং মানসিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত গাঢ়, তাহাদের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরে পরিণতি এত অনিবার্য্য বলিয়াই মানুষের মনের ভাব মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। তাই এথেন্সবাসীর তত সুন্দর পার্থিনন, পাল্‌মায়রার তত গর্ব্বের সূর্য্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্নের ঈশ্বরাবাস, পোপ-দিগের অনুপম শিল্পরত্ন শোভিত মাইকেল এঙ্গেলোর অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রসূত সেণ্টপিটার্স, মুসলমান বাদশাহের মতি-মসজীদ, আর হিন্দুর অপূর্ব্ব অলৌকিক অলোকসামান্য ষোড়শোপচারে পূজা। তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর', রোমান ক্যাথলিকের 'মেদনা', আর হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা। ইহার কোনটিই

তুচ্ছ নয়—সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই মনুষ্যত্ব, সকলগুলিই মানব-প্রকৃতির এবং জগৎ-প্রকৃতির গূঢ় রহস্য। স্বয়ং ভগবানই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাময় বা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।

মহ্যাদির্ম্মহিমা তব।

পৃথিবী প্রভৃতি তোমার ঐশ্বর্য্য। (রঘুবংশ—১০ম সর্গ।)

জড়জগতই অন্তর্জগতের ঐশ্বর্য্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হৃদয় যথার্থই শক্তিহীন, যথার্থই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি। সে মরুভূমে ফুলও ফোটে না, জলও ছোটে না, গাছও গজায় না, পাখী ও গায়না, মেঘও খেলে না, বারিও বর্ষে না! পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক মৃগতৃষ্ণিকা বৈ আর কিছুই জুটে না।

দেবপ্রতিমার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রকৃতিতে, জগৎ প্রকৃতিতে, ঈশ্বর প্রকৃতিতে। এখন প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ঐশী শক্তি জড়-মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিবার নাম প্রতিমা বা মূর্ত্তিপূজা। সে শক্তি মূর্ত্তিপূজক আপন মনে আপন মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই রূপ উপলব্ধি করার নাম idealisation বা ভাবাভিনয়ন। অতএব প্রতিমা বা মূর্ত্তি নির্ম্মানের অর্থ artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, দেবপ্রতিমা যদি artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়নই হয়, তবে ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত লোকসাধারণের দেবপ্রতিমার আবশ্যক আছে কি না। বোধ হয় হৃদয়ের শিক্ষা idealisation বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত সাধিত হয়, আর কিছুরই দ্বারা তত

হয় না। উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের যত শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তত হয় না। দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের কার্য্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্য্য হৃদয়ের উপর। দর্শন বা, নীতিশাস্ত্র—বিচার করিবার, তর্ক করিবার, ও বুঝাইবার শক্তি দেয়। কাব্য হাসায়, কাঁদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে অভিভূত করে, দুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে। যাহা করিতে পারিলে মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রবল হয় এবং মানুষ সেই ভাবের অনুযায়ী কার্য্যের দিকে প্রধাবিত হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি বা দর্শনশাস্ত্র তাহা সহজে করিতে পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ এত উচ্চ। তাই বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্‌ফার্ণো, সেক্ষ-পীয়রের নাটক, শেলির গীতি, বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের প্রধান রত্ন। তাই অর্ফিয়সের সঙ্গীত, ফিদিয়সের প্রস্তর-মূর্ত্তি, টর্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য। অতএব যে idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সেই idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে মূর্ত্তিপূজাই বা কেন মহিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু খুলিয়া বলি। পতিভক্তি বা পাতিব্রত্য কি জিনিষ, সকলেরই তাহার এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার আছে। কিন্তু সকলের সংস্কার সমানও নয়, সম্পূর্ণও নয়। কেহ মনে করেন, আপনি না খাইয়া পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ

মনে করেন, প্রতিদিন পতির চরণামৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি চিত্র দেখাই, দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের সেই প্রজামণ্ডলী-পরিবেষ্টিত বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর মুখে একটি কথা নাই—রাগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটিমাত্র নাই।

তখন দেবীর—

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥ (রঘুবংশ ১৫ সর্গ)

রক্তবস্ত্রে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্ন, তিনি যে পবিত্রস্বভাবা তাহা তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিযা উপস্থিত প্রজামণ্ডলী আপনাদের প্রচারিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। মহামুনি বাল্মীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিরাকৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন। কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবেন! দেবী কহিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবী বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎপ্রভা উথলিয়া উঠিল। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা দুঃখিনী সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। তখন সীতা কি করিতেছেন?

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম, "না" "না" ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!—বল দেখি, পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কাহার মনে আছে? এ কি কম শিক্ষা? এ শিক্ষাব বলে একটা মানুষ কি আর একটা মানুষ হইয়া যায় না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, প্রতিভাশালী কবি যে চিত্র আঁকিলেন, প্রতিভাশালী চিত্রকর যদি সেই চিত্র পটে ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই পটই বা কি অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালাভ হয়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী উপযোগী। কেন না কাব্য শব্দরচিত; শব্দ সঙ্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়া লইতে হয়; চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিষ বুঝান যায় না, বা বুঝান সহজ হয় না,—যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের মূর্ত্তিবিশেষ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায়। কবি বলিয়া দিলেন—তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। ইহাতে পতিভক্তির তুমি একটি অপূর্ব্ব আভাস পাইলে। কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব কবি তাহা ফুটাইয়া দিতে অক্ষম। কিন্তু তাহা চিত্রিত দেখিলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি

কত গাঢ়তর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল দেখি। তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের সমতুল্য কোন হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে আঁকিয়া দেখান, তাহা হইলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কেমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, যাহাতে idealisation বা ভাবাভিনয়ন আছে তাহাই মানুষের আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী। আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী নয়—অপূর্ব্ব মহিমাময়। জ্ঞান* বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিভার আবির্ভাব। স্বর্গ কেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীষ্ম, সেক্ষপীয়রে দিস্‌দেমনা, শিলরে থেক্‌লা, গফ্‌ক্লিসে অন্তাইগনি। আবার ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্তু। তবেই দেখ, ভাবাভিনয়নমূলক কাব্য বা চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি কেমন স্বর্গীয় বস্তু—কেমন মহিমাময়! তাই বলি, যদি শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর ভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উপকারী হয়, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেনই বা মহিমাশূন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব বা ধর্ম্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন

---

* তত্বজ্ঞান বলিতেছি না। বুদ্ধিবৃত্তিমূলক জ্ঞানের কথা বলিতেছি।

বিষয়ে অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ঐশী শক্তি আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর প্রতিভা যদি তাহাই পারে—কাব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউক—প্রতিভা যদি তাহাই পারে, তবে কি জন্য আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিয়া না লইব—কি জন্য আমি আপনাকে সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, ঐশী শক্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না?

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্তু দ্বারা সকলেরই মূর্ত্তি গড়িতে পারি, ঈশ্বরের কেমন করিয়া গড়িব? ঈশ্বর চিন্ময়—বড়ই উত্তম, বড়ই পবিত্র; প্রতিমা জড়—বড়ই অধম, বড়ই অপবিত্র। ইহার প্রথম উত্তর—যেমন করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কর, মনে মনেই কর, আর পট প্রতিমা দেখিয়াই কর, তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না। আত্মাপ্রধান মহাযোগীরা যোগে তাঁহাকে মূর্ত্তিময় দেখেন।

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥ (রঘু, ১০ম সর্গ)

যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বারা চিত্ত সংযম করিয়া, হৃদয় মধ্যে তদীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া থাকেন।

অতএব যদি মূর্ত্তি গড়িতেই হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই

বা ন্যায্য কেন, জড়বস্তু দ্বারা গড়িলেই বা অন্যায্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের জড়মূর্ত্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাঁহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া অপকর্ম্ম করা হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আত্মায় এবং জড়ে যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ থাকার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় তবে জড়ের সাহায্যে আত্মা চিত্রিত করিলে কেমন করিয়া আত্মার অবমাননা করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি মুখে বল জড় অতি অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র। কিন্তু তোমার মন ত জড়ের আকাঙ্ক্ষা করে, জড়ে পরিণত হইয়া চরিতার্থ হয়। তোমার মনের কাছে জড় ত অপকৃষ্ট ও অপবিত্র নয়। তবে কেন জড়ের দ্বারা মন বা আত্মার মূর্ত্তি গঠিত হইবে না? আরো এক কথা। তুমি কেমন করিয়া বল যে জড় অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত যত্ন, কত শক্তি-সঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত যত্নে, কত শক্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে গাছের পাতাটাকে অপকৃষ্ট জড় বলিয়া ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর পদে অর্পণ করিতে ঘৃণা বোধ কর, তুমিই সেই রকম একটা গাছের পাতা গড় দেখি। আচ্ছা, পাতা ত বড় জিনিষ—একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ না, যে অনন্ত শক্তি হইতে আত্মা উদ্ভূত হয়, সে অনন্ত শক্তির কণামাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? যে জড়ের কণামাত্র নির্ম্মাণ করিতে অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে যে সেই জড়কে নিকৃষ্ট বা অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিব? তুমি আমি মানুষ। মানুষের

মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। বাল্মীকি, সেক্ষপীয়র, কালিদাস, দান্তে, হোমর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ—সকলেই নর-দেবতা। কিন্তু সকলেই আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ন সহকারে এবং প্রীতিভরে জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ প্রতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। যে জড় অধ্যয়নে নরদেবতাদিগের এত যত্ন, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্দ্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া নরদেবতাগণ এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়া তুমি সেই জড়কে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ঘৃণা বোধ কর? এ কথা স্বীকার করি যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তিটিকে পূজা করা কর্ত্তব্য নয়, সেই মূর্ত্তিতে যে ঐশী গুণ ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্ত্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাহাই বলে। বাইবেলে প্রকৃত পক্ষে মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে—মূর্ত্তিপূজকদিগের সহিত সংস্রব রাখিও না, কারণ তাহা হইলে "they will turn away thy sons from following thee, that they may serve *other* gods" (দিউতারনমি, ৭, ৪)। ঈশ্বর ভুলিয়া প্রতিমূর্ত্তিতে অন্য দেবতার পূজা করাই দোষ। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে পূজা করা দোষ নয়। ইস্রায়েলের ঈশ্বর আপনাকে *jealous* দেবতা বলিয়া (এক্সোদস্, ২০—৫) পরিচয় দিয়া ইস্রায়েলকে প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার ভয়ে

মূর্ত্তিপূজা নিষেধ করিয়াছিলেন। পাছে দুর্ব্বল-মতি ইসরায়েল সোণারূপার প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া সোণারূপায় মজিয়া সোণা-রূপাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে,সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্‌রায়েলকে সোণারূপার প্রতিমূর্ত্তি পোড়াইয়া ফেলিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সোণারূপায় না মজিলে, সোণারূপার মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর পূজা করিতে কোন দোষ নাই। যে দুর্ব্বল, সেই মূর্ত্তি-ব্যক্ত ভাবে না মজিয়া, মূর্ত্তিতে মজে। মূর্ত্তিপূজা দূষণীয় নয়।

জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্ত্তি আবশ্যক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বলিয়াছি যে প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের শক্তি ব্যাখ্যাত দেখিলে মন তাঁহার পূজায় উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমূর্ত্তির দুইটিমাত্র কার্য্য—শিক্ষা এবং উদ্বোধন। কিন্তু যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ প্রতিভাপ্রসূত উন্নতশিল্পসঙ্গত প্রতিমূর্ত্তি তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাহারা সুশিক্ষিত তাহারাই কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে এবং যাহারা শিল্পশাস্ত্রের সূক্ষ্ম নিয়মাদি পর্য্যন্ত অবগত তাহারাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। কলিকাতার মহামেলায় অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময় এবং কতকগুলি কার্য্যজ্ঞাপক। দেখিলাম অধিকাংশ লোকেই কার্য্যজ্ঞাপক ছবিগুলি দেখিতেছে, ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকে অন্তর্জ্জগৎ সহজে বুঝিতে পারে না, বাহ্যজগৎ সহজে বুঝিতে পারে।

উচ্চশিল্পসম্ভূত ভাবময় মূর্ত্তি সুশিক্ষিতের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতের জন্য নয়।

পাঠক এখন বলিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি উচ্চশিল্পের নিয়মানুসারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না—যে নিয়মে এবং যেরূপ শিল্পী দ্বারা এথেন্সবাসীর জগদ্বিখ্যাত জুপিতর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেই রূপ শিল্পী দ্বারা গঠিত হয় না। অতএব এ দেশের দেব দেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয় এবং সেই জন্য তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একটি কথা আছে। মনের ভাব দুই রকমে প্রকাশ করা যায়—মনের ছবি দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং বাহ্যবস্তুর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। আনন্দ কি বুঝাইতে হইলে হয় একটি আনন্দোৎফুল্ল মুখ আঁকিতে হয়, নয় সুস্নিগ্ধ স্বর্ণরঞ্জিত সান্ধ্যাকাশে দুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী আঁকিয়া দেখাইতে হয়। শোক কি বুঝাইতে হইলে হয় একটি মলিনতামাখা মুখ আঁকিতে হয়, নয় মৃত পতির শবের পার্শ্বে করকপোললগ্না পত্নীকে বসাইয়া দেখাইতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিকৃতি বাহ্য বস্তুতে আছে। সরল অকপট অন্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাচ, জল বা স্ফটিক; ক্রূর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতিকৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তুর তিক্তরস; রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি। ফল কথা, বাহ্য জগৎই অন্তর্জ্জগতের সকল ক্রিয়ার এবং সকল অবস্থার মূল। সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভূত কাব্যে এবং মনুষ্যের জীবন-কাব্যে অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতের এত ঘনিষ্ঠতা,

এবং সেই জন্য কি কবি কি কৃষক সকলেই বাহ্য বস্তুর নাম করিয়া মনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য বস্তু যেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা তেমন বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে মন অধ্যয়ন করে না—সেই জন্য মনের ছবিও ভাল বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে বাহ্য বস্তু দেখে এবং তাহার গুণাগুণ বুঝে—সেই জন্য বাহ্য বস্তুতে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে হয় সে ছবি সাধারণ লোকের জন্য নয়; চর্ম্মচক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকের জন্য। তাই কলিকাতাব মহা-মেলায় অধিকাংশ লোকে ভাবময় ছবিগুলি দেখে নাই, কার্য্য-জ্ঞাপক ছবিগুলিই দেখিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যা-ত্মিক বা অন্তর্মুখ (Subjective) প্রণালী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি মুনিঋষির জন্য নয়, মুনিঋষি সাধারণ লোকের জন্য দেবদেবীর মূর্ত্তির ব্যবস্থা করি-য়াছেন। অতএব যে রকম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে হিন্দু শাস্ত্রকার সেই রকম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাই। জগ-তের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য রূপ। তন্মধ্যে সুখ, সম্পদ এবং সৌভাগ্য একটি রূপ। বর্ষার নদীতে, শরতের আকাশে, বসন্তের বসুন্ধরায়, গৃহস্থের গৃহ-সৌন্দর্য্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ। জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্যরূপের যে ভাব ভক্তের মনে থাকে তাহা দুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখ (Subjective) প্রণালীতে যে মূর্ত্তি হইবে তাহা হয় ত

এমন একটি সরল, সুঠাম, নিরাভরণ, সদ্‌গুণজ্ঞাপক মূর্ত্তি হইবে যাহা দেখিলেই বোধ হইবে—আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য! হিন্দুর ঘরে অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়া থাকেন—আহা, মেয়েটি যেন লক্ষ্মী! কিন্তু মেয়েটির না আছে অলঙ্কার, না আছে বেশভূষা, আছে কেবল এক ধর্ম্মের-ছাঁচে—ঢালা মুখ, আর দেহের এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি। এই মেয়ের মূর্ত্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলেই বোধ হয় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, কত অন্তর্দর্শী হইলে এ ভরা মূর্ত্তি বুঝিতে পারা যায়—এ ভরা মূর্ত্তিতে বসন্তের স্ফূর্ত্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার আশা, শরতের শান্তি, হেমন্তের হেমময় শস্য, শীতের সোহাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা কি সকলের থাকে? কিন্তু বহির্ম্মুখ (Objective) প্রণালী অনুসারে সেই সৌভাগ্যমূর্ত্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্ত্তি গড়িতেছেন।—

> শ্রিয়ন্দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
> সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং॥
> পীনোন্নতস্তনতটাং মণিকুণ্ডলধারিণীং।
> সুমণ্ডলংমুখং তস্যাঃ শিরঃ সীমন্তভূষিতং॥
> কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয়োধরৌ।
> নাগহস্তোপমৌ বাহূ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলৌ॥
> পদ্মং হস্তে চ দাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে করে।
> মেখলাভরণাস্তদ্বত্তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভাং॥
> নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীং।

পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ ॥
পদ্মাসনোপবিষ্টাস্তু পদ্মসিংহাসনস্থিতাং।
করিভ্যাং স্নাপ্যমানা সা ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ॥
প্রতিপালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ।
স্তূয়মানা চ লোকেশৈস্তথা গন্ধর্ব্বগুহ্যকৈঃ॥
(মৎস্যপুরাণ)

লক্ষ্মী দেবীর কথা কহিতেছি ঃ—লক্ষ্মী দেবী নবযৌবন-শালিনী। তাঁহার গণ্ডস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রুযুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোন্নত। তাঁহার কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, মুখ সুগোল এবং শিরোদেশ সীমন্তে ভূষিত। তাঁহার স্তনদ্বয় কঞ্চুতে (কাঁচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাঁহার বাহুদ্বয় হস্তীশুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও সুঠাম এবং কেয়ূর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাঁহার বামহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাঁহার কটিদেশ মেখলায় অলঙ্কৃত এবং দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাঁহার অঙ্গে বিবিধ আভরণ ও পরিধেয় সুশোভন বসন। তাঁহার পার্শ্বে স্ত্রীগণ চঞ্চলকরে চামর বীজন করিতেছে। তিনি পদ্মময় সিংহাসনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা। দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতেছে এবং আর দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। লোকপালগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং গুহ্যকগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।

বল দেখি, যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতের গূঢ় তত্ত্ব বুঝে না, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু সুপ্রস্ফুটিত নয়' সেও কি এ দৃশ্য

দেখিয়া বলিবে না, এ মেয়ে সকল সুখ, সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের মেয়ে? মুখে ভাবের খেলা সে বুঝিতে পারে না, চিনিতে পারে না, কেন না তাহার মনশ্চক্ষু নাই। কিন্তু তাহার যে দুইটি শারীরিক চক্ষু আছে তদ্দ্বারা সে সুঠাম দেহ এবং দেহের তপ্তকাঞ্চন-তুল্য প্রভায় যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাভরণে ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায়, চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিশুণ্ডধৃত স্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে শান্তি এবং স্নিগ্ধতা দেখিতে পায়, পদ্মাসনে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধর্ব্ব গুহ্যক লোকপালের স্তুতিগানে সর্ব্বারাধ্যা আদ্যাশক্তি দেখিতে পায়। তখন তাহাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও সে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর প্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে থাকে। হিন্দু কবির এই অপূর্ব্ব প্রতিমা বড়ই সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (ideal)। প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্ত্তৃক এই প্রতিমা গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীশ্বরের মানসমূর্ত্তি দেখিতে পান। কিন্তু তেমন শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত না হইলেও, আজ কাল যে রকম অশিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয় সেই রকম শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রেই চর্ম্মচক্ষে যে সকল বস্তুতে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সকল বস্তুর অপূর্ব্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের অপরাপর মূর্ত্তিও এই প্রণালীতে ফুটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফুটান হইলে মানবশিরোমণিরাও সে সকল

মূর্ত্তিতে মজিতে পারেন; ভাল শিল্পী দ্বারা ফুটান না হইলে অন্ততঃ সাধারণ লোকে তাহাতে জগদীশ্বরকে দেখিতে ও চিনিতে পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তির ন্যায় কেবল মাত্র মূর্ত্তি নয়। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন; পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। গ্রীক কবির ঈশ্বরমূর্ত্তিতে কেবল মূর্ত্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরণ নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পশু নাই, পক্ষী নাই—বস্তু নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে মূর্ত্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, সবই আছে। অতএব জগৎ যদি জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব যে গ্রীক কবি জগদীশ্বরের শুধু মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মূর্ত্তি এবং প্রকৃত প্রতিমা দুইই গড়িয়াছেন। এবং কি গ্রীস্, কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে পারিবে যে হিন্দু বৈ পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িতে পারে নাই—আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্বরকে দেখায় নাই। জগৎই জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। পদ্মপুরাণের কবি বলিতেছেন যে জগদীশ্বরের প্রতিমা দুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা *। শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা যে প্রতিমা নির্ম্মিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা। আর যে কোন বস্তুতে—কাষ্ঠে বল, মৃত্তিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্ব্বতে বল, সমুদ্রে বল—যে কোন

* স্থাপনঞ্চ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।

বস্তুতে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা *। হিন্দু কবি জগদীশ্বরের সেই জগৎরূপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা দ্বারা জগদীশ্বরকে দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বৈ পৃথিবীতে জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা আর নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমায় জগৎরূপ জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু বৈ পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই জন্য হিন্দু বৈ আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাই, বুঝাইবার চেষ্টাও করে নাই,—সমস্ত জগৎকে জগৎ বলিয়া আদর করে নাই। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই লোকসাধারণের মানসিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে চিনিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। সর্ব্বত্রই শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন —লোকসাধারণকে অর্থাৎ জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই—লোকসাধারণের ভাবনা ভাবেন নাই—জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহা মনেও করেন নাই— বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে ক্ষুদ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনাও করেন নাই। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া, কেবল আপনার নিমিত্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর

* যস্মিংস্তু নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি। পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎস্মৃতং॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৩ অধ্যায়।

ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বে ব্যথিত না হইয়া এক একবার ক্ষুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন—আমার পথে চলিতে পারিস্ ত চল্, নয় অধঃপাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন—জগদীশ্বরের জগদ্রূপী স্বয়ং-ব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত প্রতিমা গড়িয়া সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিন্দুই জগৎ কি তাহা বুঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি জগৎ-গ্রাহী, দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগৎ-যোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের আদর্শে গঠিত—জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান এবং প্রকৃত সামাজিকতার প্রতিমা। সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া, সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞান সকলের মানসিক শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া এবং মনের কথা খুঁজিয়া দেখিয়া সকলের ভাবন ভাবেন বলিয়া, সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু শাস্ত্রকার তাঁহার জগৎ-রূপী প্রতিমা গড়িয়াছেন।

হিন্দুর এই সর্ব্বপ্রিয়তা এবং সর্ব্বগ্রাহিতা তাঁহার অনেক কাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তাঁহার সাহিত্য দেখ। বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া সে যুদ্ধের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে সৃষ্টির সূত্রপাত হয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত বি লিখিয়া যুদ্ধের অনেক পরে পাণ্ডবদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিয় তবে ক্ষান্ত হইলেন। বাল্মীকি রাম কর্ত্তৃক রাবণবধ বর্ণন

করিতে বসিয়া রাম এবং রাবণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকান্তরিত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির আগে হইতে কথা আরম্ভ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোমর ট্রয় ধ্বংসের কথা বলিতে বসিয়া সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথাই বলিলেন না, এবং ধ্বংসেরও সকল কথা বলিলেন না। মিল্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে বসিয়া বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না। ফেনেলন তেলিমেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপুরুষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজের বাল্যকালের কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবং ইউরোপীয় করির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে, হিন্দু কবি উপমেয় ও উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেছেন, ইউরোপীয় কবি তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয় ত সাদৃশ্য নয়, সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। এইরূপ দেখিবে, সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকদর্শী, ইউরোপ অংশদর্শী; হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী, ইউরোপ অংশগ্রাহী; হিন্দু সংযোজক, ইউরোপ বিয়োজক; হিন্দু মহাকাব্য, ইউরোপ খণ্ডকাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপ-বাসীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশতঃ হিন্দু—সমাজের উন্নত এবং অবনত, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞান—সকলের জন্যই ভাবেন। ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত, জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি আপনাকে একেশ্বর ভাবিয়া আপ-

নার মতে, আপনার পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চাহেন না। তিনি জানেন যে মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না এবং পারিবে না, কখনই কুটীর ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবং পারিবে না, কেহ তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান করিতে পারে না এবং পারিবে না। কাহারো শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাহারো ঈশ্বরোপাসনার জন্য চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা যায় এমন ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়া দিতে হয়। এই ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রতিমা গড়িয়াছেন—গ্রীকের ঈশ্বর-মূর্ত্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়াছেন। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে, গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজাসক্তির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে জগৎ-রূপী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমার কারণ—হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাজিক-ভাব (social spirit) ; হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ—হিন্দুর জগদ্ব্যাপী দৃষ্টি এবং জগৎ-গ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিক ভাব, এমন দৃষ্টি, এমন মন পৃথিবীতে আর কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের স্ফোট—হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা। সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, ইচ্ছা হয়—আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু

সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিমা ভাঙ্গিলে জানিব যে হিন্দু-সমাজও ভাঙ্গিল। কেননা হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদয় নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই। সেখানে যে সমাজ দেখিতে পাও তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, ঐহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের উপর স্থাপিত। সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কে জানিত যে তেমন আঁটাসাঁটা এথেন্স সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে না জানে যে সেই বিশাল অচল জাতিভেদ-পূর্ণ হিন্দুসমাজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগান্তেও অটল থাকিবে? অতএব হৃদয় মূলক প্রতিমাকে বড় সামান্য জিনিষ মনে করিও না।

পুরাণে প্রতিমা নির্ম্মাণের যে নিযম নির্দ্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন প্রায়ই প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। তাই দিগম্বরী কালী এবং অসুরনাশিনী কাত্যায়নীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা দেখি। ইহা অজ্ঞতা এবং কুরুচির ফল। পুরাণে প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক দ্রব্যের অর্থ আছে। পুরাণানুসারে প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে এখন যে সকল প্রতিমা অলঙ্কারে বিভূষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার থাকে না। কিন্তু যে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণও আছে। এখন ইংরাজি-শিক্ষিত সম্পদায়ভুক্ত অনেকে যে তাহাকে কেবল ছেলেখেলা বলিয়া থাকেন উহা তাহা নয়। দেবতা পরম বস্তু,

সৌন্দর্য্যময়—যেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে সুন্দরবস্তুর আবির্ভাব, মানুষ সেই খানেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া থাকে। শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি—

——————আচম্বিতে তথা
নানা রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুম জাল স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মর ধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয় কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততীরমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারিদিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে

বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল। *

আবার এক ভক্তের কথা শুন দেখি—

অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা চারু কলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি॥
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর॥
বিনান পাটের থোপ মুকুতার মালা।
বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবালা॥
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ॥

অগাধ সমুদ্রে অপরূপ সৌন্দর্য্যের খেলা! অতল জলে অপূর্ব্ব পুষ্প কানন। "গভীর দেখি যে জল, তাহে নানা উত-পল, মনোহর কমল উদ্যান।" প্রকৃত ভক্ত এইরূপই করিয়া থাকেন। তাই আজিকার বঙ্গের হিন্দু যেমন সৌন্দর্য্য বুঝেন সেই অনুসারে অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার দেবদেবীর প্রতিমার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করেন। তোমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান

* তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ।

তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় ভালই। তুমি তোমার প্রতিমা মনের মতন করিয়া সাজাও।

আরো একটি কথা। কিছু গূঢ় কথা। তুমি ইংরাজের কবিতা * আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য। যে নিজেই সুন্দর তাহাকে আবার অলঙ্কার দিয়া সুন্দর করিব কি? গ্রীক ভাস্কর তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তিকে কি সোণা রূপা দিয়া সাজাইতেন? আমি বলি, সুন্দরকে শুধু সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ সুন্দরকে সোণা রূপা দিয়া সাজায় না। সন্তানকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সন্তানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান না। প্রণয়িনীকে সুন্দর করিবার জন্য প্রণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্তা দিয়া সাজান না। হৃদয় আদরের জিনিষকে সোণা রূপা দেয়—হৃদয় দেওয়ায় বলিয়া দেয়—হৃদয় না দিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া দেয়—সুন্দর করিবার জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। তিনি কি জানেন না, যে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন কুৎসিত ছেলেকে সোণারূপায় মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে করিয়া মোড়েন? তাঁহার হৃদয় মোড়ায়। আবার শুধু তাহা নয়। আদরের জিনিষ যতই কেন সুন্দর হউক না, যে আদর করিতে জানে সে মনে করে, বুঝি সুন্দরকে সাজাইলে আরো সুন্দর হইবে। অতএব যেখানেই আদরের জিনিষ, যেখানেই প্রতিমা, সেইখানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, সেইখানেই হীরা মুক্তা, সেই খানেই খুঁটি নাটি।

*"Beauty unadorned is adorned the best."

প্রেমের বস্তুর, আদরের জিনিষের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া, তৃপ্তি হয় না, সুখ হয় না। রস্কিণ বলেন,love chiefly grows in giving *। জগদীশ্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। তথাপি হৃদয়ের পিপাসা মিটাইবার জন্য হিন্দু তাঁহাকে কত কি দিয়া সাজান। গ্রীক ভাস্কর শিল্পের নিয়মে তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই; দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—ঘরের ছেলে, হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়েন নাই। তাই তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তি বসনভূষণহীন। গ্রীস্‌বাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় ছিল না †। তিনি প্রধানতঃ চক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতেন,

*Modern Painters নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালমের ৮৮ পৃষ্ঠা।

† "*So far as the sight and knowledge af the human form*, of the purest race, exercised from infancy constantly, but not excessively, in all exercises of dignity, not in straining dexterities, but in natural exercises of running, casting, or riding; practised in endurance not of extraordinary hardship, for that hardens and degrades the body, but of natural hardship, vicissitudes, of winter and summer, and cold and heat, yet in a climate where none of these are severe; surrounded also by a certain degree of right luxury, so as to soften and refine the forms of strength: so far as the *sight* of all this could render the mental intelligence of what is noble in human form so acute as to be able to abstract and combine, from the best examples so produced that

হৃদয় দিয়া দেখিতেন না। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর ঘরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাই তিনি তাঁহার দেবতাকে আদর করেন, কোলে করেন, পূজা করেন, ধম্‌কান্‌, হীরা মুক্তা সোণা রূপা কড় শাঁখা ঘরে যা থাকে তাই দিয়া সাজান—শুধু সুন্দর করিবার নিমিত্ত সাজান না। হিন্দু জগদীশ্বরকে যে ভাবে দেখেন আর কেহ তাঁহাকে সে ভাবে দেখে না, দেখিতে জানে না, দেখিতে পারে না। তিনি জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। অনন্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। সে অনন্ত রূপ কেবল হিন্দুই দেখিতে জানে আর কেহ জানে না। তাই অনন্তজ্ঞ হিন্দু জগদীশ্বরকে অনন্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুদ্রও দেখেন। হিন্দুর মন অনন্ত-প্রসারিত, সর্ব্বগ্রাহী, ইউ-রোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সর্হদ্দ-মাপ-পরিমাণ-প্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনন্ত-প্রিয়, অনন্ত-বিহারী। হিন্দু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে সভয়ে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন,

which was most perfect in each, so far the Greek conceived and attained the ideal of humanity; and on the Greek modes of attaining it, chifly dwell those writers whose opinions on this subject I have collected; wholly losing sight of what seems to me the most important branch of the inquiry, namely, *the influence, for good or evil, of the mind upon the bodily shape, the wreck of the mind itself, and the modes by which we may conceive of its restoration.*" রস্কিণের *Modern Painters* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালমের ১০৯ ও ১১০ পৃষ্ঠা।

আবার কেনই বা সেই অনন্ত পুরুষকে কোলের ছেলে ভাবিয়া আদর করেন, ধম্‌কান্‌, ভয় দেখান, খোসামোদ করেন, সোণা রূপা দিয়া সাজান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার কেমন করিয়া জানিব? আর ফিট্-ফাট্, চাঁচা-ছোলা, কেয়ারি-করা, টাইম ধরা, রুলে-বাঁধা, লেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়া জানিবে? হিন্দু জগদীশ্বরের মহারণ্যরূপী luxuriance অসীম আবারিত সমৃদ্ধি; ইউরোপীয় মানুষের-তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানের ন্যায় trimness পারিপাট্য মাত্র। অতএব পবিত্র পিতৃপুরুষের প্রতিমা ভাঙ্গিও না। সে প্রতিমার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ-গ্রাহী ধৃতি, জগৎ-ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ-যোড়া হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর। আর যে জড়ে—যে ফুলে—যে বৃক্ষপত্রে—যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, যে জড় ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। তাহাকে অপবিত্র বা অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা না করিয়া সেই প্রতিমার নিকট ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডের হিতার্থ ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈশ্বরের ধূপ, ঈশ্বরের দীপ, অনন্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি,—আর ঐ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূপ, দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র, সমস্তই অঞ্জলি পূরিয়া উপহার দিয়া অনন্ত ঈশ্বরের ষোড়শোপচারে পূজা কর।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈবতেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

গীতা—৪, ২৪।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে উপাসক সেই মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বর মূর্ত্তিতে পূজিত হন। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝিয়াছি যে কেহই জগদীশ্বরের মূর্ত্তিকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই এইরূপ বুঝে যে মূর্ত্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব হয় মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের মন যখন বড়ই বিভোর হইয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তির প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেইখানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে। ওথেলো-দিস্‌দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে ওথেলো দিস্‌দেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে থাকে না, সত্যসত্যই রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিয়া মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে হয়। ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি তেমনি ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া বিভোর মনে মূর্ত্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেই ত জানিব যে মূর্ত্তি গড়া সার্থক হইয়াছে। মূর্ত্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, ঈশ্বরভক্তিতে মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তুকে ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মূর্ত্তিকে পূজা করা ঈশ্বরকে পূজা করা বই আর কি হয়? তাহা হইলে মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়া বৈ আর কি হয়? কোল্‌রিজ্

এই যে একটা পর্ব্বতের সম্মুখে মাথা হেঁট করিলেন। তবেই কি পর্ব্বতটা ঈশ্বর হইয়া গেল? কিন্তু পর্ব্বতে আর গঠিত মূর্ত্তিতে প্রভেদ কি? দুইই ত ঈশ্বরের প্রতিমা। তবে পর্ব্বত স্বয়ং-ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত মূর্ত্তি স্থাপিত-প্রতিমা—প্রভেদ এইটুকু। অতএব কোল্‌রিজ্‌ পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া পর্ব্বতের সম্মুখে প্রণত হওয়ায় পর্ব্বতটা যদি ঈশ্বর না হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমি দরিদ্র হিন্দু একটি মূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইলে মূর্ত্তিটাই বা ঈশ্বর হইয়া যাইবে কেন? তুমি হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে করিতে হয় ত আমি নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিব। এ কথায় আমি এই বলিতে পারি যে আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে সহস্র বৎসর তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিলেও তাঁহাকে হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈসপের গল্পের ন্যায় গল্প, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (allegory) সাধারণ লোকে চিরকালই শুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিয়া এমন বুঝিয়াছে যে পাখী মানুষের মতন কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলা এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মতন বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় বা থিয়েটরে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত

নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, তাহাদের যে রকম শিক্ষা (culture) এবং মানসিক শক্তি (calibre) তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য মূর্ত্তি সামনে না রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেও তাহারা বোধ হয় ঈশ্বরকে হস্তপদ বিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার পূজা করে। তাহা যদি হয় তবে তাহাদিগকে কোন মূর্ত্তি না দিয়া এবং মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বরভক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া এবং ঈশ্বরভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারে তাহাদিগকে সেই পরিমাণে ধর্ম্মানুরাগী হইতে না দিয়া লাভ কি? ঈশ্বর কি জন্য? শুধু কি প্রকৃষ্ট উপলব্ধির জন্য, না ধর্ম্মোন্নতির জন্য? যে 'নিরাকার' উপলব্ধি করিতে পারে না এবং নিরাকার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরানুরাগে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মপথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রণালীর খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল, না মনকে ঈশ্বরানুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটি মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে দেওয়া ভাল? আমরা শুধু উন্নত পদ্ধতি চাই না; সকলে উন্নত পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ প্রত্যাশাও আমরা করি না। কিন্তু আমরা ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগ চাই; আমরা চাই যে সকলেরই মন যে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়া তুলিতে অক্ষম এবং সেই জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে

নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকার-পদ্ধতি না দিলে শাস্ত্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধর্ম্মভীরু হিন্দু শাস্ত্রকার লোকসাধারণের জন্য বহির্ম্মুখ প্রণালীতে জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মেও যে রাজনৈতিকতা statesmanship চাই। ধর্ম্মে রাজনৈতিকতা কেবল হিন্দু শাস্ত্রকার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখান নাই।

জগদীশ্বরকে যে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই তাঁহাকে সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি একেবারেই অসম্ভব? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না? ইতিহাসে এরূপ অবনতি, এরূপ বিকৃতি দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের কেবল ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মানুষের সকল বিষয়েই অবনতি এবং বিকৃতি (general decline) হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরজ্ঞানেরও অবনতি এবং বিকৃতি হইয়াছে। সকল বিষয়ে বিকৃতি এবং অবনতি ঘটিলে চিরকাল যদি শুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত হইয়া যায়। আবার যদি বল যে সাধারণ অবনতি না হইলেও শুধু মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে, তবে আমি বলিব যে মূর্ত্তি যখন এতই উপকারী এতই আবশ্যক দেখা যাইতেছে, তখন, তুমি

পণ্ডিত এবং সমাজ-নেতা, তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি লোক সাধারণকে সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক কর যে তাঁহারা মূর্ত্তি দেখিয়া যেন নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনে না করে। এইরূপ কার্য্য করিবার জন্য সকল দেশে ধর্ম্মযাজক থাকে। যে দেশে নিরাকার উপাসনা সেখানেও এইরূপ কার্য্যের জন্য ধর্ম্মযাজক থাকে। মানুষকে সকল বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্চে সর্মান, মস্‌জীদে খোৎবা পঠিত হইতেছে। মানুষ সকল উত্তম জিনেষেরই অপব্যবহার করিতে পারে। তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিষ দিব না। তবে অপরাপর উত্তম জিনিষের অপব্যবহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, মূর্ত্তি পূজার অপব্যবহার নিবারণার্থও তেমনি উপদেষ্টা থাকা চাই। যেখানেই মানুষের ধনভাণ্ডার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারাই প্রতিমার প্রকৃত প্রহরী। তাঁহারা যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হন, তবে তাঁহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ করা উচিত—তাঁহারা প্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী।

সাকার পূজার বিরুদ্ধে একটা বিষম কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কোলাহল কেন হয় বুঝিতে পারা যায় না। অথচ এ কোলাহলটা এখন এদেশেও উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। কোলাহলকারিরা বলেন যে ভগবানের মূর্ত্তি গড়িলে অনন্তকে সান্ত করা হয়। ইহার এক উত্তর, হইলই বা। অনন্তকে সান্ত করিলে অনন্তের ত অবমাননা হয় না। অনন্ত জানেন, আমরা সান্ত মনুষ্য, অতি ক্ষুদ্র, আমরা কেমন

করিয়া অনন্তের কল্পনা করিবে? অতএব তাঁহাকে সান্ত মনে করিলে তিনি কখনই অপমানিত বোধ করিতে পারেন না। আর আমাদের পক্ষ হইতে এই কথা বলি, আমরা যখন অনন্তের কল্পনায় অসমর্থ হইয়া অনন্তকে সান্ত রূপে পূজা করি তখন আমাদের মনে ত অনন্তকে অপমান করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নাই। এবং অপমান করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের অভাবে অপমান কল্পনা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। আর এক উত্তর, ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অনন্তের কল্পনা বা ধারণা একেবারেই অসম্ভব। দেহ অনন্ত নয়, সান্ত, এবং সান্তের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ অপরিহার্য্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। অতএব যতদিন ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন দেহের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ততদিন তাহার জগদীশ্বরের কল্পনা যতই প্রশস্ত হউক কিছুতেই সীমাশূন্য অনন্তের কল্পনা হইতে পারে না। মনুষ্যের দেহ ও আত্মা এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র আত্মাই অনন্ত। অতএব অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা করা একমাত্র আত্মার পক্ষেই সম্ভব, একমাত্র আত্মারই আয়ত্ত। এবং আত্মা যত দিন সান্তে আবদ্ধ, সান্ত দেহ দ্বারা বেষ্টিত বা উপহিত, তত দিন অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা করা আত্মার পক্ষেও অসম্ভব, আত্মারও অনায়ত্ত। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ দ্বারা আত্মাকে দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট না হইলে আত্মা কিছুতেই অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা বা উপলব্ধি করিতে পারে না। দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেই অনন্ত আত্মার অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে উপলব্ধি করিবার সমস্ত বাধা বিঘ্ন ঘুচিয়া যায়,

তখন অনন্তত্বের নিয়মানুসারে অনন্ত পুরুষও অনায়াসে অনন্ত আত্মায় অনন্তরূপে প্রস্ফুটিত ও উপলব্ধ হয়েন। অনন্তের উপলব্ধির ইহাই এক মাত্র নিয়ম, একমাত্র পদ্ধতি। অন্য নিয়মও নাই, অন্য পদ্ধতিও নাই। অন্য নিয়মও অসম্ভব, অন্য পদ্ধতিও অসম্ভব। বহু আয়াস দ্বারা দেহ দমন করিয়া যে মহাপুরুষ যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া দেহ হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লিষ্ট করেন জগতে কেবল তিনিই আপন বন্ধনমুক্ত অনন্ত আত্মাতে অনন্তপুরুষকে অনন্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, আর কেহই পারেন না। এবং অনন্তের উপলব্ধি কাহাকে বলে তাহাও কেবল তিনিই জানেন, আর কেহই জানেন না, আর কাহারো জানিবার সাধ্য নাই। আর কেহ যদি বলেন, আমি অনন্তের উপলব্ধি করিয়াছি বা করিতে পারি, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তিনি যার পর নাই ভ্রান্ত—তিনি যাহা অনন্ত মনে করেন তাহা অনন্ত নয়—তিনি যাহার উপলব্ধি করেন তাহা যতই প্রশস্ত, যতই বিস্তৃত, যতই প্রসারিত, যতই ব্যাপক হউক, তাহা অনন্ত নয়, সান্ত। কিন্তু ভগবানের মূর্ত্তি গড়িলে বা কল্পনা করিলে অনন্তকে সান্ত করা হয় বলিয়া যাঁহারা কোলাহল করিয়া থাকেন তাঁহারা স্বদেশীয়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন, তাঁহারা যে ভারতের যোগীর লক্ষণাক্রান্ত নহেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ২ কে ২ দিয়া গুণ করিলে ৪ হয় এ কথা যে প্রকার দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি ঠিক সেই প্রকার দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, তাঁহাদের এই কোলাহল করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কারণ তাঁহাদের মনে ভগ-

বানের যে ধারণা তাহা যতই ব্যাপক যতই প্রশস্ত হউক, তাহা অনন্তের ধারণা নয়, সান্তের ধারণা। আর অনন্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম নিরাকারের উপলব্ধি সম্বন্ধেও যখন ঠিক সেই কথা খাটে, অর্থাৎ, অনন্তের ন্যায় নিরাকারের ধ্যান ধারণা উপলব্ধিও যখন দেহবন্ধনমুক্ত নিরাকার আত্মা ভিন্ন আর কিছুতেই সম্ভব নয়, তখন ঠিক সেই প্রকার দৃঢ়তা সহকারে একথাও বলিতে পারি, তাঁহারা যাহাকে নিরাকারের উপলব্ধি মনে করেন তাহা প্রকৃত নিরাকারের উপলব্ধি নয়, তাহাও সাকারের উপলব্ধি; সম্মুখে একটা প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি থাকে না বলিয়া আত্ম-প্রতারিতের ন্যায় তাঁহারা মনে করেন, আমরা নিরাকারের উপলব্ধি করিয়াছি। কি অনন্তের উপলব্ধি কি নিরাকারের উপলব্ধি, একমাত্র হিন্দুযোগী ভিন্ন আর কাহাতেই কোনটা সম্ভব নয়, কোনটাই আর কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়, সাধ্যায়ত্ত হইবার নয়। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে এবং আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের এই দেশেও একটা মিথ্যা ও বিষম ভ্রমাত্মক নিরাকারবাদ ও অনন্তবাদের কথা শুনা যাইতেছে। আর যাঁহারা এই মিথ্যা ভ্রমাত্মক কথা কহিতেছেন তাঁহারাই আমাদের মূর্ত্তিপূজাকে সান্ত ও সাকারের পূজা বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। যেন তাঁহারা সান্ত ও সাকার চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন! তাঁহারা বুঝেন না যে প্রকৃত অনন্ত ও প্রকৃত নিরাকারের উপলব্ধি একমাত্র হিন্দুযোগী ভিন্ন আর কাহাতেই সম্ভব নয়। তাঁহারা বুঝেন না যে, তাঁহাদের মনে ভগবানের যে উপলব্ধি তাহা

যতই সূক্ষ্ম, যতই ব্যাপক হউক, তাঁহা অনন্তের উপলব্ধিও নয়, নিরাকারের উপলব্ধিও নয়। তাঁহারাও সাকার উপাসক। নিরাকার অনন্তের উপলব্ধি কত কঠিন এবং কি প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সে উপলব্ধিতে উপস্থিত হইতে পারা যায় তাঁহাদের সে জ্ঞানই নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাভের জন্য যত্নশীল হয়। আর ঐ সমস্ত যত্নশীল সিদ্ধদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে যথার্থতঃ জানিতে পারে।

কিন্তু কোলাহলকারিদিগের কথাবার্ত্তায়, বক্তৃতায়, কি গ্রন্থাদিতে এই কঠিনতার কি এই পদ্ধতির বিশেষ কোন কথাই শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহারা মনে করেন যে চক্ষু বুজিয়া একটা ফুল অথবা ফলের উপলব্ধি করা যেমন সহজ, চক্ষু বুজিয়া মনে নিরাকার অনন্তের উপলব্ধি করা প্রায় তেমনি সহজ। এবং সেই জন্যই কি ইউরোপে কি ভারতে তাঁহারা সকলেই—জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই—দম্ভ করিয়া বলিয়া থাকেন, পূজা ত নিরাকার, সাকারপূজা পূজাই নয়, আর ব্রহ্মদর্শন ত মনে করিলেই হয়, অতি অল্পায়াসে জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটীআপামর সাধারণ সকলেরই আয়ত্ত। ইহাতেও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে কি ইউরোপে কি ভারতে কোথাও কোলাহলকারী নিরাকারবাদিদিগের মধ্যে প্রকৃত নিরাকারবাদ নাই, নিরাকার অনন্তের প্রকৃত উপলব্ধি কি তাহার কিছু মাত্র

জ্ঞান নাই। তাঁহাদের নিরাকার অনন্তের উপলব্ধি এবং সেই প্রকৃত উপলব্ধি এই দুই উপলব্ধির মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ব্যবধান যে বিরাট এ জ্ঞান একেবারেই নাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই—পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আপামর সাধারণ সকলেই—অবলীলাক্রমে নিরাকার অনন্তের উপলব্ধির দম্ভ করিতেছেন। বড়ই ভ্রমে পড়িয়া সান্ত ও সাকারের উপাসক সান্ত ও সাকারের উপাসককে সান্ত ও সাকারের উপাসক বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিতেছেন!

এই স্থানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের ঈশ্বর অনন্ত ও নিরাকার এবং তাঁহারা সেই অনন্ত ও নিরাকার ঈশ্বরের সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এ কথার অর্থ বুঝা বড় কঠিন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের ঈশ্বর সগুণ। কিন্তু সগুণ ঈশ্বর ত অনন্ত ও নিরাকার হইতে পারেন না। গুণ আরোপ করিলেই সীমা ও আকার আরোপ করা হয়। এক একটী গুণের এক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি বা লক্ষণ আছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি বা লক্ষণের অর্থ সীমা ও আকার। অতএব দয়ালু ঈশ্বর সসীম বা সান্ত ও সাকার; ন্যায়বান ঈশ্বর সসীম বা সান্ত ও সাকার। আর গুণের অর্থ যখন সীমা ও আকার, তখন গুণসমষ্টির অর্থও সীমা ও আকার। অতএব সগুণ ঈশ্বর সসীম বা সান্ত ও সাকার। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঈশ্বর 'সগুণ,' অতএব সান্ত ও সাকার। তাঁহারা যে তাঁহাদের ঈশ্বরকে অনন্ত ও নিরাকার বলিয়া থাকেন সেটা তাঁহাদের ভ্রম। আর

সেই ভ্রম বশতই তাঁহারা সান্ত ও সাকার ঈশ্বরের উপলব্ধিকে অনন্তও নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এবং সান্ত ও সাকারের উপলব্ধি সহজ বলিয়া তাঁহারা সেই ভ্রমবশে অনন্ত ও নিরাকারের উপলব্ধিও সহজ বলিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত মূর্খ বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই অনন্তও নিরাকারের উপলব্ধির দম্ভ করিয়া থাকেন। একমাত্র নির্গুণ ঈশ্বরই প্রকৃত পক্ষে অনন্ত ও নিরাকার, এ জ্ঞান যদি তাঁহাদের থাকিত তাহা হইলে অনন্ত ও নিরাকারের নামে তাঁহারা শিহরিয়া উঠিতেন এবং অনন্ত ও নিরাকারের উপলব্ধির দম্ভ করা দূরে থাকুক, উহার কথাটী মাত্র শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, অনন্ত ও নিরাকার ঈশ্বর কি জিনিষ এবং অনন্ত ও নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধি কি বিষম, কি বিরাট ব্যাপার এক মাত্র হিন্দু ভিন্ন এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, পৃথিবীর আর কোথাও কেহ জানে না। এই সমস্ত বিষম ব্যাপারে পৃথিবীর অপর সকলেই বালকবৎ।

কোলাহলকারিরা বলিয়া থাকেন যে মূর্ত্তি পূজা করিলে জাতীয় অবনতি ও নৈতিক অবনতি উভয়বিধ অবনতি ঘটিয়া থাকে। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে হিন্দুরা যত দিন মূর্ত্তি পূজা করে নাই তত দিন খুব উন্নত অবস্থায় ছিল, মূর্ত্তি পূজা আরম্ভ করা অবধি অবনত হইতে লাগিল। কিপ্রকারে অথবা কোন্ কোন্ বিষয়ে অবনত হইয়াছিল তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। কিন্তু অবনত হইয়াছিল এ কথা

স্বীকার করিলেও মূর্ত্তিপূজা যে সেই অবনতির কারণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন হেতু ত দেখা যায় না। বরং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত না করিবার হেতুই প্রবল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন গ্রীক রোমক ও মিশরবাসীরা অসাধারণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্ত্তি পূজা করিত। অতএব মূর্ত্তিপূজার সহিত জাতীয় অবনতির যে একটা নিত্য বা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এরূপ বিবেচনা করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। আর মূর্ত্তিপূজায় নৈতিক অবনতি হয়, এ কথারও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। দেবতাকে যদি দেবতার গুণ ও শক্তি আরোপ করা যায় তবে দেবতার মূর্ত্তিপূজায় কি জন্য দুর্নীতি শিক্ষা হইবে বুঝিতে পারা যায় না। দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী নারায়ণী ভাবিয়া আমরা তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করি। তাঁহার মূর্ত্তি পূজায় কি আমাদের দুর্নীতি শিক্ষা হয় না নৈতিক অবনতি হয়? আমাদের দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া দেখিও, বুঝিতে পারিবে, আমরা সকল দেবদেবীকেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা নারায়ণ বা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী নারায়ণী ভাবিয়া তাঁহাদের মূর্ত্তি পূজা করি। বুঝাইয়া দেও দেখি, তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজায় কি প্রকারে আমাদের দুর্নীতি শিক্ষা বা নৈতিক অবনতি হইবে? দেবতাকে অপদেবতা ভাবিয়া, ক্রোধপরায়ণ, হিংস্রস্বভাব, ভোগাসক্ত, অনিষ্টকারী ভাবিয়া পূজা করিলে নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তেমন পূজা যে কেহ করে না তাহা নয়। ডাকাত কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যায়। দুষ্টলোকে পরের অমঙ্গল কামনায় দেবদেবীর পূজা করে। এরূপ অপদেবতার পূজা সকল

দেশেই আছে—যে দেশে মূর্ত্তিপূজা আছে সে দেশেও আছে, যে দেশে মূর্ত্তিপূজা নাই সে দেশেও আছে। এরূপ পূজায় দেবমূর্ত্তির দোষ বা অপকারিতা সূচিত হয় না, মানব প্রকৃতির হীনতাই সূচিত হয়। সে হীনতার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—অপধর্ম্মেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাণপণ করিয়া অপধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু দেবমূর্ত্তির নিন্দা করিও না। আমরা যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করি, তাঁহাদের নিকট আমরা কি প্রার্থনা করি? আমরা কি পরের ঐশ্বর্য্য নিজস্ব করিবার প্রার্থনা করি, পরের সর্ব্বনাশ প্রার্থনা করি, কাম ক্রোধাদি রিপু সকলের উত্তেজনা প্রার্থনা করি, দুর্ম্মতি দুষ্প্রবৃত্তি প্রার্থনা করি? আমরা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নিকট যে প্রর্থনা করিয়া থাকি যাঁহারা নিরাকার উপাসক বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চ বা উৎকৃষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আমাদের দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া দেখিও, জানিতে পারিবে, আমরা সকল দেবদেবীর নিকটেই অতি উৎকৃষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকি, আর আমরা সকল দেবদেবীকেই সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকি। তবে কি প্রকারে আমাদের দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা দুর্নীতি শিক্ষা ও নৈতিক অবনতির কারণ হইবে? সাহেবরা বলেন বলিয়া আমরাও কি ঐ কথা বলিব ও বিশ্বাস করিব? আর সাহেবদিগকে এবং সাহেবদের মতে যাঁহাদের মত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান দেখি, তাঁহারা ত মূর্ত্তি পূজা করেন না, তাঁহারা ত নিরাকার উপাসক বলিয়া আপনাদিগের গৌরব কীর্ত্তণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের

নিরাকার উপাসনার ফলে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ দুষ্কর্ম্ম, কোন্ মহাপাতক, কোন্ হীনতা তিরোহিত হইয়াছে? আর সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় না কি যে, যে সকল সভ্য সমাজে মূর্ত্তিপূজা নাই তথায় সকল দুষ্কর্ম্ম, সমস্ত মহাপাতক, সর্ব্বপ্রকার হীনতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে? তবে আর তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা ও দুর্নীতির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুর মূর্ত্তি পূজার নিন্দা করেন কেন? মূর্ত্তি পূজা নিন্দনীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহা একটা cant বা ধূয়া মাত্র। আর তেমনি ভ্রমে পড়িয়া এ দেশেও কেহ কেহ সেই ধূয়া ধরিয়াছেন।

মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু শাস্ত্রকার ধর্ম্মে যে অধিকার-দর্শিতাও রাজনৈতিকতার পরিচয় দিয়াছেন আর কোন শাস্ত্র-কার সে পরিচয় দেন নাই। অতএব, ধর্ম্মে অধিকারদর্শিতা ও রাজনৈতিকতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দু-ত্বের লক্ষণ। এই অধিকারদর্শিতা ও রাজনৈতিকতার অর্থ—জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্খ উচ্চ নীচ সকলেরই প্রতি দৃষ্টি, সক-লেরই জন্য ব্যবস্থা—ধর্ম্মের ব্যবস্থায় জ্ঞানী বল অজ্ঞান বল পণ্ডিত বল মূর্খ বল উচ্চ বল নীচ বল কাহাকেই উপেক্ষা না করা, ছাড়িয়া না দেওয়া। অতএব সোঽহং, লয়, কড়া ক্রান্তি, বিবাহ প্রভৃতিতে হিন্দুর সমগ্রদর্শিতা ও সমগ্রগ্রাহিতা রূপ যে মানসিক প্রকৃতি দেখিয়াছি, ধর্ম্মে অধিকারদর্শিতা ও রাজনৈতিকতায়ও সেই মানসিক প্রকৃতি দেখিলাম।

মৈত্রী

—ঃ*ঃ—

[বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা

—ফল—

সর্ব্বভূতে অনুরাগ]

১

পৃথিবীতে প্রীতি বা সদ্ভাবের ন্যায় পদার্থ আর নাই। দয়া বল, করুণা বল, স্নেহ বল, ভক্তি বল, সকলই প্রীতি-মূলক। প্রীতি বা সদ্ভাব আছে বলিয়াই পৃথিবীতে সুখ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, সম্পদ আছে, উন্নতি আছে। স্বার্থবৃত্তি পরিচালনা দ্বারাও সুখসমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য ব্যবসায় স্বার্থ-বৃত্তি মূলক এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় হইতে সুখসমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে সুখসমৃদ্ধি নিকৃষ্ট রকমের। সে সুখসমৃদ্ধি প্রাকৃতিক মনুষ্যের, উচ্চ মনুষ্যের নয়; দেহের, মনের নয়। আবার সে সুখ সমৃদ্ধি যাহার তাহারই, আর কাহারও নয়। তোমার বাণিজ্যব্যবসায় সুখ সমৃদ্ধি হয়, সে সুখ তোমারই, আর কেহ সে সুখে সুখী বা সে সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী হয় না। আবার সে সুখ-সমৃদ্ধির অপচয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে। আবার সে সুখ সমৃদ্ধি হইতে অহঙ্কার অসূয়া প্রভৃতি অসদ্ভাব উৎপন্ন হয়। অসদ্ভাব হইতে ঘোর অনর্থপাত হয়। অনর্থ-

পাত হইলেই অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু সে অমঙ্গল শুধু তোমার নয়, তোমার এবং অপরের অর্থাৎ সমাজের। অতএব স্বার্থ-বৃত্তি সুখ সমৃদ্ধির কারণ হইলেও পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সৌন্দর্য্য এবং উন্নতির কারণ নয়। পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি এবং উন্নতির কারণ স্বার্থ-সংহার-মূলক প্রীতি বা সদ্ভাব। প্রীতি বাড়িলেই সুখ বাড়ে, সৌন্দর্য্য বাড়ে, শোভা বাড়ে।

এখন জিজ্ঞাস্য—পৃথিবীতে প্রীতি বাড়ে কেমন করিয়া? মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে প্রেম-প্রবৃত্তি আছে, তাহা মনুষ্যের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় কিয়ং পরিমাণে আপনাআপনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সে স্ফূর্ত্তি পরিমাণে বড় বেশী নয়। স্বার্থ মূলক না হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমের পরিমাণ বা পরিসর প্রায়ই স্বার্থের পরিমাণ বা পরিসরের অনুযায়ী হইয়া থাকে। পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে যাহারা তোমার আপনার, অর্থাৎ, তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী শ্যালক শ্বশুর বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম প্রায় তাহাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাহার প্রথম ফল এই হয় যে প্রেম পৃথিবীর যত মঙ্গল সাধিতে সমর্থ, তত মঙ্গল সাধিতে সক্ষম হয় না, কেননা উহা স্বল্প সংখ্যক প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় ফল এই হয় যে প্রেম সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের পাত্র কাহাকেও সম্যক রূপে মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। যাহার সহিত আমি পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে গাঁথা, তাহার সহিত আমার প্রেম যতই গাঢ় হউক না, সে প্রেম নিশ্চয়ই কতক

পরিমাণে স্বার্থমূলক স্বার্থসংযুক্ত বা স্বার্থদূষিত। অতএব স্বার্থবিযুক্ত হইলে প্রেম প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র যত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, স্বার্থসংযুক্ত হইয়া প্রেম এবং প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র তত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম প্রায়ই সঙ্কীর্ণায়তন এবং সঙ্কুচিতস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কীর্ণায়তন সঙ্কীর্ণস্বভাব এবং সঙ্কুচিতস্বরূপ যে প্রেম, তাহা পৃথিবীতে পূর্ণ সুখ, পূর্ণ মহত্ব এবং পূর্ণ পবিত্রতার সৃষ্টি করিতে পারে না এবং সেই জন্য মানুষকে পূর্ণানন্দ পরমেশ্বরের পূর্ণ অধিকারী করিতে অসমর্থ হয়। এই জন্য মানব-শিরোমণিরা শুধু স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম লইয়া সন্তুষ্ট হন না, শিক্ষা দ্বারা প্রেমের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং প্রেমের প্রকৃতি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। সে শিক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বড়ই শ্লাঘার বিষয় যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সে শিক্ষার যেমন পূর্ণতা এবং গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, আর কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্রে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেম বা প্রীতি অপরিমিত না হইলে পৃথিবীর অপরিসীম উন্নতি হয় না এবং স্বার্থবিযুক্ত না হইলে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রেমকে অপরিমিত করিবার প্রধান উপায় উহাকে স্বার্থবিযুক্ত করা। যতক্ষণ তুমি কেবল তোমার আপনার লোকগুলিকে ভালবাস, ততক্ষণ তোমার প্রেম পরিমিত। যখনই তুমি তোমার আপনার লোক নয় এমন একটি লোককে ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যাহাকে অপরিমিত প্রেম বলে, সেই অপরিমিত প্রেমের

স্বভাব বা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই আশ্চর্য্য এবং অপরিমিত পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে, তখন তুমি তোমার-আপনার-লোক বলিয়া লোক মধ্যে ইতর বিশেষ করিবার যে একটা মাপ-কাটি ব্যবহার করিতে সেটা ফেলিয়া দিয়াছ। তখন তুমি আর তোমার-আপনার-লোক এবং তোমার-আপনার-লোক-নয় লোক মধ্যে এরূপ কোন প্রভেদ কর না। অর্থাৎ যাহারা তোমার আপনার লোক এবং যাহারা তোমার আপনার লোক নয় তখন তাহারা সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও লোকে তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমান নয় এবং সমান প্রেমের পাত্র নয়। কারণ আপনার লোক বলিয়া লোক মধ্যে ইতরবিশেষ করিবার যেমন একটা মাপকাটি আছে; বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল সুরসিক সুরুচিসম্পন্ন ইত্যাদি বলিয়া লোক মধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তেমনি অনেকগুলি মাপকাটি আছে। সেই সমস্ত মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি সমস্ত লোককে সম্পূর্ণরূপে সমান জ্ঞান কর ততক্ষণ তোমার মানবপ্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত হয় না। আবার মানব এবং মানব নয়, এই বলিয়া জীবমধ্যে ইতর-বিশেষ করিবার তোমার যে মাপকাটি আছে, সেই মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি যাহারা মানব এবং যাহারা মানব নয় তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, ততক্ষণ তোমার প্রেম মানব-সম্বদ্ধ থাকে, অর্থাৎ, প্রকৃতরূপে পরিমাণ শূন্য হয় না। কিন্তু সে মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যখন তুমি সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে থাক, তখনও তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেন না জীব

ও জীব-নয় বলিয়া পদার্থ মধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে আর একটি মাপকাটি আছে সেটি তুমি তখনও ফেলিয়া দেও নাই। অতএব সে মাপকাটিটিও ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে আরম্ভ কর, ততক্ষণ তোমার প্রেমের সীমা ও পরিমাণ আছে, ততক্ষণ তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ নয়।

এ সকল কথার অর্থ এই যে সমদর্শিতা—প্রেম বৃদ্ধি ও প্রেম বিস্তারের প্রধান হেতু। যতক্ষণ সকল লোককে, সকল জীবকে এবং সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল জীবের প্রতি এবং সকল পদার্থের প্রতি প্রেমও হয় না। এই জন্য পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রেমবর্দ্ধনার্থ প্রভেদ দর্শন নিষেধ এবং সমদর্শিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। (৬অ—২৯)

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ। (৬অ—৩২)

হে অর্জ্জুন! যে যোগী আত্ম দৃষ্টান্তে সকল ভূতে সুখ বা দুঃখই হউক সমানরূপে দেখেন তিনিই পরম যোগী।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমনিয়োঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। (১২অ—১৮)

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শত্রু মিত্রেতে সমদর্শী হয় এবং মান অপমান তুল্য বিবেচনা করে, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ সমস্তই যাহার চক্ষে এক (সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়)।

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। (১৪অ-২৪,

যে ব্যক্তির সুখ দুঃখ উভয়ই সমান এবং যে ব্যক্তি আপনাতেই আছে, লোষ্ট্র অশ্ম ও কাঞ্চন যাহার চক্ষে সমান, প্রিয় অপ্রিয় যাহার পক্ষে সমান, নিন্দা ও স্তুতি যাহার পক্ষে তুল্য (সেই ব্যক্তিই গুণাতীত)।

সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিবার উপদেশ ভগবদ্গীতায় অনেক আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেনঃ—

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত

সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য। (প্রথম অংশ, ১৭—৯০)

হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান কর। সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা।

আর এক স্থলে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে কহিতেছেন;—

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগন্ময়ে।

পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ?॥

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।

যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক কুতঃ?॥

(প্রথম অংশ, ১৯—৩৭ ও ৩৮)

পিতঃ যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মাতে অবস্থান করি-করিতেছেন, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? যখন ভগবান বিষ্ণু আপনাতে আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে?

গ্রন্থ বিশেষ হইতে আর এরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমদর্শিতার উপদেশে পরিপূর্ণ। সে শাস্ত্রে সমদর্শিতার কথাই প্রধান কথা। তাই হিন্দুমাত্রেই সমদর্শিতার কথা অবগত—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি রাজা, কি প্রজা, সকল হিন্দুই ঐ কথা জানে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, সমদর্শিতা হইলেই কি প্রেমের বিস্তার হইবে? আমি সকল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে সমান দেখি বলিয়া যে সকল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে ভালবাসিব এমন কি কথা আছে? কেন ভাল বাসিব? সমদর্শিতা আমার, সমদর্শী বলিয়া আমি না হয় সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্তু ভাল বাসিব কেন? দুইটি বস্তুকে সমান বলিয়া বুঝিলে দুইটিকে যে ভালবাসিতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবাসিতে হইলে সকলকে সমান দেখিতে হইবে একথা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাসি-তেই হইবে। এ প্রশ্নের উত্তরে খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা হয় ত বলিবেন, ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র, অতএব ঈশ্বরসৃষ্ট সকলকেই আমাদের ভালবাসা উচিত। প্রত্যুত্তরে

বলি, ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট সকল লোককেই যে ভালবাসিতে হইবে এমন কি কথা আছে? আমার পিতা আমার প্রেমভক্তির পাত্র। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমাকে তাঁহার সব সন্তানগুলিকে ভালবাসিতে হইবে এমন কি কথা আছে? এতটুকু স্বীকার করিতে পারি যে আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে আমি যদি ঘৃণা করি তাহা হইলে আমার দোষ হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে আমার প্রেমের পাত্রের অবমাননা করা হয়। কিন্তু আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে যদি আমি ঘৃণাও না করি এবং ভালও না বাসি, অর্থাৎ, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নিরনুরাগ (indifferent বা impassive) হই, তাহা হইলে ত আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রকমে অপরাধী হই না এবং আমার প্রেমের পাত্রকে আমার অবমাননা করাও হয় না। তবে কেমন করিয়া স্বীকার করি যে ঈশ্বর সকল লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অথবা সকল লোক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাকে সকল লোককে ভালবাসিতে হইবে? সকল লোকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সকল লোককে সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পারি, কিন্তু সকল লোককেই যে ভালবাসিব, এমন ত কোন কথা নাই। ফল কথা, সকল লোককে ভালবাসিতে হইলে ভালবাসিতে পারা যায় এমন কোন পদার্থ সকল লোকেই থাকা চাই, নহিলে মানসিক নিয়মানুসারে মনে প্রেমের বা ভালবাসার সঞ্চার হইবে কেন? হিন্দু ভিন্ন আর কাহারো ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে না যে ভালবাসিতে পারা যায় এমন কোন পদার্থ সকল

লোকেই আছে। পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই বলেন যে সকল লোকেই এমন একটি পদার্থ আছে যাহা ভাল বাসিতে পারা যায়, যাহা ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না, যাহা ভাল বাসিবার পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণে মহামতি প্রহ্লাদ দৈত্যদিগকে কহিতেছেন ;—

সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ॥

(প্রথম অংশ ১৭অ, ৭৯)

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবান বিষ্ণুতে তোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত হউক্। ভূতমাত্রই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সুতরাং সর্ব্বভূতের প্রতি তোমাদের বন্ধুবৎ ব্যবহার হউক্। তোমাদের রাগদ্বেষাদি-কৃত সমুদয় ক্লেশ দূর হউক।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ)

সেই পরম পদার্থ সেই পূর্ণ পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই আছেন, অতএব সকলকেই ভালবাসিবে। ইহার উপর আর কথা নাই। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর যে বড়ই প্রিয় পদার্থ তাহা কি আর বলিতে হয়? সেই পরম প্রিয় পদার্থ যাহাতে আছে, সেই পরম প্রিয় পদার্থে যে গঠিত, সেও কি তবে প্রিয় পদার্থ নয়? হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ব্রহ্মবিদ্বেষী না হইলে কেমন করিয়া বলিব, সেও পরম প্রিয় পদার্থ নয়? এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া সকল লোক সকল লোকের প্রিয় পদার্থ—একথা না বলিলে বুঝিতে পারি না, কেন লোকে সকল লোককে ভালবাসিবে। যিনি সোঽহংবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন কেবল তিনিই বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন, কেন সকল

লোককেই ভালবাসিতে হইবে। কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাহা বুঝেন না এবং বুঝাইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল জোর করিয়া বলেন যে সকল লোককেই ভালবাসা উচিত এবং তাই তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থশূন্য ভালবাসাও বড় কম।

প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমদর্শিতা ব্যতীত সর্ব্বব্যাপী প্রেম হয় না। কিন্তু সমদর্শিতার কারণ অথবা সমত্ববাদের মূল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই না। * এক ঈশ্বরের সৃষ্টি হইলেই যে সকল জিনিষ সমান হয় এমন কোন কথা নাই। এক বাপের সব ছেলেই যে রূপে গুণে ধনে মানে সুখে দুঃখে সমান তাহা নয়। ঈশ্বরেরও সব ছেলে সমান নয়। খৃষ্টান বলেন বটে, ঈশ্বর maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust। কিন্তু পৃথিবীর এক দেশের লোক যত রৌদ্র ও যত বৃষ্টি পায় আর এক দেশের লোক তত রৌদ্র ও তত বৃষ্টি পায় না। আবার বায়ু বৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা ধর, দেখিবে বায়ু বৃষ্টি যেমন ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে লোক মধ্যে বিতরিত, সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতি তেমন বিতরিত নয়। তবে কেমন করিয়া বলিব

* ধর্ম্মতত্ত্বে পূজনীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছেনঃ—অন্য ধর্ম্মেও সর্ব্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মের এই জাগতিক প্রীতি জগৎতত্ত্বে দৃঢ় বদ্ধ মূল। ২৫ অধ্যায় ২৯৪ পৃ।

যে সকল লোক সমান? আবার গুণাগুণ সম্বন্ধেও সকল লোক সমান নয়। কেহ শিষ্ট, কেহ অশিষ্ট, কেহ হিংস্রক, কেহ নম্র, কেহ গর্ব্বিত, ইত্যাদি। তবে কেমন করিয়া বলি যে সকল লোক সমান? এবং কেমন করিয়াই বা সকল লোককে সমান ভাবিয়া শত্রু মিত্র সকলকে সমান ভালবাসি? কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহই একথার উত্তর দিতে পারেন না। কাহারো ধর্ম্মশাস্ত্রে সমত্ব-বাদের মূল বা হেতু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিবাদ সংস্থাপনার্থ প্রকৃত বৈষম্যকে জোর করিয়া সমত্ব বলিয়া মনে করেন, জোর করিয়া সমত্ববাদ প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু জোর করিয়া বৈষম্যকে সমত্ব বলিলে কত ক্ষণ সমত্ববাদে প্রকৃত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে? বেশী ক্ষণ থাকে না বলিয়াই ইউরোপ সমত্ববাদ লইয়া এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশাপেক্ষা বেশী বৈষম্যময়। প্রকৃত সমত্ববাদের মূল একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য লোভ মোহ মাৎসর্য্য ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল বস্তু লোক মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া উভয় মধ্যে সমত্ব বিনাশ করে হিন্দু শাস্ত্র মতে সে সকল বস্তু বস্তুই নয়, স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল অবস্থার অর্থাৎ স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল এবং ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র। একথা যে সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহা সোঽহং নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শীর বিবেচনায় যাহা দ্বারা লোক মধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, তাহা নাই বলিলেই হয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা কেবল সেই নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ ; সে পদার্থ সকল লোকেই সমান, সকল

অবস্থাতেই সমান। সেই ব্রহ্ম পদার্থ সকল লোকে আছে বলিয়াই সকল লোক সমান। অর্থাৎ লোকের অসার অস্থায়ী ক্ষণিক-উপলব্ধি স্বরূপ সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য রূপ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয় এবং লোক মধ্যে তজ্জনিত যে বৈষম্য বা পার্থক্য হয় তাঁহাও কিছুই নয়। অতএব সকল লোকে যে এক বৈষম্য-শূন্য ব্রহ্ম পদার্থ আছে তাহাই তাহাদের প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকৃত পদার্থ সকল লোকে এক বলিয়াই সকল লোক সমান। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার শত্রু মিত্র ভেদ কল্পনা নিষেধ করিয়া থাকেন। গুরুগৃহে রাজনীতি শিক্ষা করিয়া প্রহ্লাদ যখন আপন পিতার নিকট আসিলেন এবং পিতা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া সাম দান ভেদাদি উপায় চতুষ্টয় দ্বারা শত্রু জয় করিতে হয়, তখন তিনি উত্তর করিলেন;—

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম॥

* * * *

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ?॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৯ অধ্যায়, ৩৪, ৩৭ ও ৩৮)

পিতঃ আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব তৎসমুদায় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মতে

ঐ নীতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে না। পিতঃ যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতেরই অন্তরাত্মাতে অবস্থিত, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? যখন ভগবান বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র এই আমার শত্রু, এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে।

তাই বলিতেছি প্রকৃত সমত্ববাদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত মূল হেতু এবং অর্থ একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাই। খৃষ্টীয় কি অপর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমত্ববাদ আছে তাহা প্রকৃত সমত্ববাদ নয় এবং তাহার প্রকৃত মূল, হেতু এবং অর্থও নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রীতিবাদের মূলে যে সমত্ববাদ থাকা চাই, তাহা একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাই। অপরাপর শাস্ত্রকারেরা এরূপ বুঝিয়া থাকেন যে প্রীতিবাদের জন্য সমত্ববাদ আবশ্যক, কিন্তু প্রকৃত সমত্ব কি তাহা তাঁহারা বুঝেন না বলিয়া তাঁহাদের সমত্ববাদ কেবল মুখের কথা বৈ আর কিছুই হয় না। তাই বলি, যদি প্রকৃত সমদর্শী হইয়া সকল লোককে ভালবাসা উচিত বোধ হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলিবে না, হিন্দুশাস্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না।

ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়েন না, কেবল ইংরেজের শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা হয়ত রাগান্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও প্রীতিবাদ লইয়া এত যে গর্ব্ব করিতেছ, বল দেখি খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রে যীশু খৃষ্টকে যেরূপ আপন শত্রুদিগকে ভাল বাসিতে

দেখিতে পাই, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী শত্রুদিগকে (Father ! forgive them !) পিতঃ ! ইহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন বলিয়া প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, হিন্দু-শাস্ত্রে তেমন কিছু দেখিবার আছে ? যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, আছে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদকে সংহার করণার্থ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাত দ্বারা, সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, বৃহদ্দন্ত হস্তী দ্বারা আক্রান্ত করিয়া, বিষম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া এবং পাচক-গণের দ্বারা বিষ ভক্ষণ করাইয়াও সংহার করিতে অসমর্থ হইয়া—শেষে আপন পুরোহিতগণকে অভিচার দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতে অনুমতি করিলেন। পুরোহিতগণ অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু অভিচার ক্রিয়া ভীষণ অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করিয়া নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে পরিত্যাগ করিয়া পুরো-হিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পুরোহিতগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ আকুলপ্রাণে তাহাদিগের নিকট বেগে গমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

সর্ব্বব্যাপিন্ ! জগদ্রূপ ! জগৎস্রষ্টর্ জনার্দ্দন ! ।
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্-মন্ত্রপাবকাৎ ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি, জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।

যৈর্দ্দিগ্‌গজৈর্‌-অহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৮অ, ৩৬—৪০)

সর্ব্বব্যাপিন! জগৎ স্বরূপ! জগৎ সৃষ্টিকারক! জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু বিষ্ণু যদি সর্ব্বজীবে থাকেন তাহা হইলে এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। আমি সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক যেমন অগ্নিকে শত্রু বলিয়া গণনা করি নাই, সেই রূপ এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। পূর্ব্বে যাহারা আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ প্রদান করে, যাহারা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে সকল দিগ্‌গজ আমাকে দন্তাঘাত করিয়াছিল, যে সকল ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করে, আমি তাহাদের সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সমদৃষ্টি রহিয়াছে। আমি কখন কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে এই অসুর-যাজকগণ জীবন প্রাপ্ত হউন।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

এ বড় কম দৃশ্য নয়। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুকালের যে দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা ইহা কম দৃশ্য নয। ইহা তদপেক্ষা বড় দৃশ্য। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুকালীন দৃশ্যে নিকৃষ্টের প্রতি কৃপা-করুণা দেখিতে পাই; প্রহ্লাদ চরিতের এ দৃশ্যে ব্রহ্মাত্মকের মিত্রতার গাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাই। যীশু খৃষ্টের করুণা

অতীব মনোহর, কিন্তু উহা তাঁহার নিজের অতীব মনোহর হৃদয়ের একটি ভাব মাত্র, ভাগ্যবলে তেমন হৃদয় না পাইলে, তেমন ভাবও কেহ অনুভব করে না। প্রহ্লাদের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকৃত সমত্ববাদী সর্ব্বপ্রেমিকের প্রেম—যে কেহ হউক না কেন, সে সমত্ববাদ সম্যক্‌রূপে এবং প্রকৃতার্থে বুঝিলে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রেমিক হইয়া সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেম প্রদর্শন করিতে পারে। ভারতের সমত্ববাদ যুক্তি মূলক বলিয়া উপলব্ধি করিবার জিনিষ এবং সেই জন্য সেই সমত্ববাদ-মূলক সর্ব্বব্যাপী প্রীতিও শিখিয়া অধিকার করিবার জিনিষ। খৃষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের সমত্ববাদ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন এবং ঘটনাক্রমে প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী না হইলে প্রায় কেহই সে সমত্ববাদ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষা দ্বারা অধিকার করিতে পারে না। খৃষ্ট ধর্ম্মে যে সমত্ববাদ আছে তাহার অসারতা ও অযৌক্তিকতা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহা কেবল ভারতের সমত্ববাদের কথা শুনিয়া কথিত এবং সে ধর্ম্মে যে প্রীতিবাদ আছে, তাহা ভারতের প্রীতিবাদের ন্যায় সমত্ববাদমূলক নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টের পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং বাসনা মাত্র।

খৃষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রে যে প্রকৃত সমত্ববাদ ও প্রীতিবাদ নাই, তাহার আর একটি উত্তম প্রমাণ আছে। খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে সকল মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া সমান। কিন্তু শুধু মানুষই ত ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকা সকলই ত ঈশ্বরের সৃষ্ট। তবে শুধু মানুষই মানুষের সমান এবং মানুষের প্রীতির পাত্র কেন? পশু

পক্ষী গাছ পালা প্রস্তর পর্ব্বতও মানুষের সমান ও প্রীতির পাত্র নয় কেন? সমদর্শী এবং সর্ব্বপ্রেমিক হিন্দু ত মানুষকে পশু পক্ষী গাছ পালা প্রস্তর প্রভৃতি হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না—মানুষ পশু পক্ষী গাছ পালা প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাসেন। প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুগণকে উপদেশ দিতেছেন ঃ—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৯অ, ৪৭—৪৮)

দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ, ইহারা অনন্তদেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। যিনি এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত আছেন তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বে যত কিছু আছে, মানুষ বল, পক্ষী বল, সরীসৃপ বল, গাছ বল, লতা বল, প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্ম্মিত এবং সেই এক ব্রহ্মের রূপ মাত্র। অতএব শুধু সকল মানুষই যে সমান তাহা নয়, জগতে যত কিছু আছে সবই মানুষের সমানও প্রীতির পাত্র। তাই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল মানুষকে, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে, ভালবাসিবার উপদেশ নাই, শত্রু মিত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নির্ব্বিশেষে, মানুষ পশু পক্ষী জল স্থল বৃক্ষ লতা প্রস্তর মৃত্তিকা সকল

পদার্থকেই সমান ভালবাসিবার উপদেশ আছে। সে উপদেশের নাম—মৈত্রী-বাদ। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই সে উপদেশ আছে। কি খৃষ্টীয় কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত সমত্ববাদ আর কোথাও নাই বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ উপদেশও আর কোথাও নাই। মানবশাস্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় মহৎ উপদেশ আর নাই। এবং মানবশাস্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্রে সে মহত্তম উপদেশ আছে *।

২

সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ ভারতের জিনিষ। কিন্তু সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ কি ভারতের কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে, ভারতবাসীর জীবনে কি তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই? ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং ইংরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন অনেক বাঙ্গালি বলিয়া থাকেন "ভারত বৈষম্যময়, সাম্য বা সমত্বের

* সামাজিক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন—জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ। (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ (৪) সগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিলে তবে, (৬) স্বজাতি বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমিয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্যায় ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটির মতানুসারীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানব মাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরল মনা শিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌ মনসোগোচরে, আত্মনিমর্জ্জন করিতে চাহেন। ৩১৭।৩১৮ পৃ।

চিহ্ন মাত্র তথায় নাই।” এবং মৈত্রীবাদ সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন যে ওটা কেবল কথার কথা, সর্ব্বব্যাপী অনুরাগ বা মৈত্রী মনুষ্য মধ্যে অসম্ভব। দুইটি মতই ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

যাঁহারা বলেন যে হিন্দু সমাজে সাম্য বা সমত্ব নাই, তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপ প্রধানতঃ জাতি বা বর্ণভেদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, “যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রের মধ্যে এত প্রভেদ সেখানে লোকের সমত্ব-বোধ কোথায়?” কিন্তু এই বর্ণভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে না, এবং ইউ-রোপবাসীর অপেক্ষা হিন্দুর সমত্ব-বোধ যে অনেক বেশী, তাহাও পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে। বর্ণভেদ প্রথার একটি ফল এই যে তদ্দ্বারা লোকমধ্যে পদ, মর্য্যাদা, সম্মান প্রভৃতি লইয়া ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ, কাহারো পদ শ্রেষ্ঠ হয়, কাহারো পদ নিকৃষ্ট হয়, কাহারো সম্মান বেশী হয়, কাহারো সম্মান কম হয়, ইত্যাদি। এইরূপ হইলে সকল লোক আর সমান হয় না, লোকমধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ বৈষম্য অনিবার্য্য। যে ইউরোপকে অনেকে সাম্যের পীঠ স্থান বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেই ইউরোপেও এ প্রকার বৈষম্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। ইউরোপে হর্বার্ট স্পেন্সরের ন্যায় একজন দার্শনিকের যে সম্মান, একজন সামান্য মুদির তাহার একশতাংশ সম্মানও নাই। ফরাসি রিপব্লিকের অধিনায়ক মুসো কার্ণোর যে পদ ও মর্য্যাদা, একজন ফরাসি পাহারাওয়ালার তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট পদ ও মর্য্যাদা।

অতএব পদ, মর্য্যাদা ইত্যাদি লইয়া লোকমধ্যে সকল দেশেই ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এবং তদ্রূপ ইতর বিশেষ হওয়াও উচিত। মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিতের সম্মান যদি বেশী না হয়, তবে পণ্ডিতের প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু সাম্য সংস্থাপনার্থ যদি অবিচার করিতে হয়, তবে সাম্য আর সাম্য হয় না, বিষম বৈষম্য হইয়া পড়ে। আসল কথা এই যে লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে তাহাদের কর্ম্মও বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের পদও বিভিন্ন এবং সমাজে সম্মান ইত্যাদির কম বেশী হইয়া থাকে। কর্ম্ম, পদ এবং সম্মান ইত্যাদির এই প্রকার বিভিন্নতাই প্রকৃত সাম্য। এক পক্ষে লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি এবং পরিমাণের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকলকে যদি একই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তবে সমাজের ক্ষতি বা অনিষ্টের সীমা থাকে না, এবং অপর পক্ষে ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে যদি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াও সকলের জন্য সমান পদ ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তবে অবিচারের সীমা থাকে না। অতএব ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম এবং পদ ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট করাই প্রকৃত সাম্যপ্রতিষ্ঠা, এবং তদ্বিপরীত কার্য্যই অবিচার। ক্ষুধায় একটি অষ্টবিংশতি বর্ষীয় যুবককে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দিবে, একটী অষ্টমবর্ষীয় শিশুকেও যদি সেই পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দেও, তবে কেবল অবিচার এবং অপচয় করা হয় মাত্র, উভয়কে সমান ব্যবহার করা হয় না। অষ্টবিংশতি বর্ষীয় যুবক যে পরিমাণ অন্ন

ভোজন করিতে পারে তাহাকে যদি সেই পরিমাণ অন্ন দেও, তদপেক্ষা কম বা বেশী না দেও, এবং অষ্টমবর্ষীয় শিশু যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে তাহাকে যদি সেই পরিমাণ অন্ন দেও, তদপেক্ষা কম বা বেশী না দেও, তবেই তাহাদের দুই জনের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়। ন্যায় ছাড়া সাম্য নাই। সাম্যকে যদি ন্যায় ছাড়া করিতে চাও—ইউরোপীয় সোসিয়ালিষ্ট (Socialists) এবং কমুনিষ্ট (Communists) দিগের ন্যায় যদি সাম্যকে ন্যায় ছাড়া করিতে চাও—তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমাজ কাহাকে বলে তাহা তুমি ভাল জান না, এবং তুমি সমাজের মিত্র নও শত্রু। ন্যায় ছাড়িলে সমাজ টিকে না বলিয়া, যে ইউরোপ তোমার মতে সাম্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-স্থান, সেই ইউরোপে কর্ম্মানুসারে লোক মধ্যে পদের এবং মর্য্যাদা ইত্যাদির এতই প্রভেদ। ভারতের বর্ণভেদ প্রণালীতেও তাহাই ঘটিয়াছে। সমাজ রক্ষার্থ বিবিধ কর্ম্মের প্রয়োজন। শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণানুসারে হিন্দুগণ বিবিধ ছোট বড় কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং ছোট বড় কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পদ ও মর্য্যাদা বেশী, বৈশ্যের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পদ ও মর্য্যাদা বেশী, শূদ্রের অপেক্ষা বৈশ্যের পদ ও মর্য্যাদা বেশী। শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিভিন্ন, পদ ছোট বড়, এবং মর্য্যাদা ইত্যাদি কম বেশী হইলে আরো অনেক বিষয়ে লোকমধ্যে বিভিন্নতা জন্মিয়া থাকে। একই অপরাধে একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং উৎকৃষ্ট ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে যতটুকু এবং যে প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক, একজন অশিক্ষিত মর্য্যাদাহীন

নিকৃষ্ট ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে তদপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়। ইউ-রোপে এই প্রণালীতে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। যে একজন ডিউক বা আর্লের অপবাদ ঘোষণা করে তাহার যে পরিমাণ জেল বা জরিমানা হয়, যে একজন মুদির অপবাদ ঘোষণা করে তাহার তদপেক্ষা অনেক কম জেল ও জরিমানা হয়। একজন শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তি চুরি করিলে তাহার যদি ছয় মাস কারাবাস হয়, একজন মূর্খ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক চুরি করিলে তাহার ছয় বৎসর কারাবাস বা নির্ব্বাসন হয়। একজন ডিউক একটা মুটেকে ঘুষা মারিলে হয় ত 'আর এরূপ করিবে না' কেবল এই রকম উপদেশ পাইয়াই অব্যাহতি পায়; কিন্তু একটা মুটে একজন ডিউকের গায় শুধু হাত দেওয়া অপরাধে হয় ত ছয় মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করে। এরূপ বিভিন্ন ব্যবহার যে অন্যায় তাহা নয়। লোকের শিক্ষা, শক্তি এবং পদমর্য্যাদার বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের মান, অপমান, লজ্জা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান এবং অভিমান কমবেশী হইয়া থাকে, এবং সেইজন্য দণ্ডনীয় কার্য্য করিলে তাহাদিগের মনে চৈতন্য এবং অনুতাপ উৎপাদনার্থ তাহা-দিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে দণ্ড দিলে লোকমধ্যে প্রকৃত সাম্য সংস্থাপিত হয়, নচেৎ ঘোর অবিচার এবং বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়। মনু প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকারগণও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ভেদে এইরূপ দণ্ডের বিভিন্নতা ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে ব্যব-স্থার মূলে শাস্ত্রকারগণের নিজের বর্ণাভিমান একেবারেই যে

নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সংসারে থাকিয়া একেবারেই আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা, কি এ দেশে কি ইউরোপে, কোথাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। বোধ হয় সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদিগের দণ্ডবিধি আইনে শ্রেণী বা সম্প্রদায় উল্লেখে দণ্ড ব্যবস্থিত হয় না বলিয়া কাহারো কাহারো এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে যে ইউরোপে লোকের শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা অনুসারে দণ্ডের বিভিন্নতা নাই, অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্বন্ধে সকল লোকই সমান। কিন্তু সকলেই জানেন যে বিচারকালে সকল লোক সমান থাকে না, প্রভূত পরিমাণে ছোট বড় উত্তম অধম হইয়া যায়। তাই ইউরোপীয়দিগের বিচারালয়ের রিপোর্ট গ্রন্থ পড়িবার সময় মনে হয় যে সে সব গ্রন্থ মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা হইতে বড় একটা বিভিন্ন নয়। কিন্তু সে সব গ্রন্থ ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইনের অংশ স্বরূপ। সে গ্রন্থ ছাড়িলে ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণ হয় না। অতএব এইরূপ বুঝা উচিত যে ইউরোপীয় দণ্ডবিধি আইন মনুর দণ্ডবিধি আইন হইতে বড় একটা বিভিন্ন নয়। ইউরোপীয়েরা একটা জিনিষকে আর একটা জিনিষের সঙ্গে গাঁথিয়া না রাখিয়া একটু তফাতে রাখেন বলিয়া ইউরোপে সে জিনিষটা নাই এরূপ মনে করা বড়ই ভুল।

মনুষ্যের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের বিভিন্নতা বশতঃ লোকমধ্যে পদ মর্য্যাদা ইত্যাদি লইয়া যেমন ইতর বিশেষ করা হয়, সেইরূপ পদ মর্য্যাদা ইত্যাদির বিভিন্নতা বশতঃ আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে লোক মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ করা হইয়া

থাকে। ইউরোপেও উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত একত্র আহার করে না এবং বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হয় না। এমন কি আহারের স্থানে যদি কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ শ্রেণীর লোকের খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করে, তবে অনেক সময়ে সেই উচ্চ শ্রেণীর লোক সে খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করে না। ইহা ভাল কি না এস্থানে তাহার মীমাংসা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা যে কেবল আমাদের দেশের বর্ণভেদ প্রথা হইতে উদ্ভূত হয় এরকম মনে করা অন্যায়।

এইরূপ দেখিবে, যে সকল আচার ব্যবহারাদি এদেশে বর্ণভেদ প্রথার সহিত সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়, প্রায় সে সমস্তই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এদেশের বর্ণভেদ প্রথার দুইটী লক্ষণ আছে, তাহা ইউরোপীয় সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম লক্ষণ এই যে বর্ণভেদ অনুসারে পদ মর্য্যাদা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির যে বিভিন্নতা হইয়া থাকে তাহা এদেশে কৌলিক, ইউরোপে নয়। এদেশে যে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, সে চিরকালই ক্ষত্রিয় রহিল, কখন এবং কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ হইতে পারিল না। যে সূত্রধর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিল, সে চিরকালই সূত্রধর রহিল, কখনই স্বর্ণকার বা বণিক বা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইতে পারিল না। ইউরোপে এরূপ হয় না। ইউরোপে মুচির সন্তান পুরোহিত হইতেছে এবং পুরোহিতের সন্তান মুচি হইতেছে। এই প্রভেদ দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং এ দেশীয় ইংরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন লোকে বলিয়া

থাকেন যে ইউরোপীয় সমাজ প্রণালীতে ন্যায় ও সাম্য আছে, এদেশের সমাজ প্রণালীতে নাই। তাঁহারা বলেন যে পুরোহিতের সন্তানের পৌরোহিত্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহাকে যদি পুরোহিত হইতে দেওয়া হয়, আর পৌরোহিত্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যদি মুচির সন্তানকে পুরোহিত হইতে দেওয়া না হয়, তবে আর সকল লোককে সমান ব্যবহার এবং সকলের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় কৈ? হিন্দু সমাজে মুচির ছেলেকে পুরোহিত হইবার অধিকার দেওয়া হয় না বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে সে সমাজের বর্ণভেদ প্রথায় ন্যায় এবং সাম্য নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারের পক্ষ হইতে বিচার করিতে গেলে অবশ্যই বলিতে হয় যে একথা ভ্রান্তিমূলক। তুমি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় বৃত্তি সম্বন্ধে যে প্রকার নিয়ম আছে, তাঁহা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সাম্যমূলক। প্রথম কথা এই যে সমাজের আদিম অবস্থায় যখন প্রথম ব্যবসায় ভেদ হয় তখন এখনকার মতন লোকের বহুল পরিমাণ এবং বিবিধ প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যা থাকে না, এবং সেই জন্য তখন এক ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করা সহজও নয় এবং লোকের সচরাচর সেরূপ আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহাও হয় না। পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে এরূপ নিয়ম না থাকিলেও আধুনিক ইউরোপের প্রারম্ভ কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে তথায় সকল শ্রেণীর লোকেই পুরুষানুক্রমে আপন আপন পৈত্রিক ব্যবসায় বৃত্তিতে নিযুক্ত হইত। এখনও যে

ইউরোপে সে প্রথার বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা নয়। পুরুষানুক্রমে কোন একটি কার্য্য করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর দক্ষতা এবং ক্রমে ক্রমে তৎপ্রতি অধিকতর আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অতএব পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসা অবলম্বন করা শুধু যে সমাজের পার্থিব উন্নতির অনুকুল তাহা নয়, লোকের পক্ষে সহজ, প্রীতিকর এবং অনেক স্থলে অনিবার্য্যও বটে। তাই ইউরোপে, আগেও যেমন এখনও তেমনি, অধিকাংশ লোক পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করে। তবে কতকগুলি লোক সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করে বলিয়া সেই নিয়মভঙ্গ কার্য্যটি অধিক পরিমাণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং আমাদের মনে হয় যে নূতন নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করাই বুঝি ইউরোপীয় সমাজের প্রধান নিয়ম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। হউক আর নাই হউক, একথা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে জ্ঞান ও বিদ্যার স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যাভাব বশতঃ সহজে পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না, এবং সেই জন্য পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেই হইবে, এরূপ কোন রাজাজ্ঞা বা অবশ্য পালনীয় বিধি তখন না থাকিলেও, লোকে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবসায় কৌলিক হইয়া পড়ে। আবার সমাজের আদিম অবস্থায় যখন লোকের জ্ঞান বুদ্ধি এবং মানসিক শক্তি কম থাকে এবং প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যুঝিবার ক্ষমতা এবং উপায়ও অল্প থাকে, তখন স্বভাবতই লোকের আত্মরক্ষার জন্য বেশী চেষ্টা

হয়, এবং সেইজন্য সাবধানে এবং নিরাপদে পৈত্রিক ব্যবসায় পালন করিবার দিকে লোকের তখন যত ঝোঁক হয়, অসম-সাহসিক হইয়া নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার দিকে তত ঝোঁক হইতে পারে না। একারণেও সমাজের প্রথম অবস্থায় লোকে পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। তাই প্রায় সকল দেশেই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যবসায় কৌলিক আকার ধারণ করে। এবং তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে এদেশে শাস্ত্রকারেরা বর্ণ সকলের ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার আগেই ব্যবসায় সকল কৌলিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্যবসায় কৌলিক আকার ধারণ করিলে পর শাস্ত্রকারেরা যখন তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা করিলেন তখন তাঁহারা সম্ভবতঃ দুইটি কারণে ব্যবসায়গুলিকে কৌলিক এবং বর্ণ-ভেদ অনুসারে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সমাজের প্রথমাবস্থায় লোককে পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায় পালন করিতে দেখিলে সমাজনেতাদিগের এরূপ মনে হইয়া থাকে যে মানুষ স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, সে প্রকৃতি অতিক্রম করিতে মানুষ অক্ষম, এবং সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো মানুষকে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, ও লৌহ প্রকৃতির বলিয়া চারিটি স্বাভাবিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন, এবং সেই সেই প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন*।

* *Grote's Plato* নামক গ্রন্থ দেখ। হিন্দুশাস্ত্রকারের মতেও সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ শুভ্রবর্ণ, রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, রজ এবং তমো গুণ মিশ্রিত বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং তমোগুণ প্রধান শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ।

হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতেও স্বভাবের স্বতন্ত্রতা বশতই বর্ণ এবং ব্যবসায় ভেদ। মানুষ স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য, আদিম কালে অথবা সমাজের প্রথম অবস্থায় সকল দেশেই এরূপ অনুমিতি হওয়া যে নিতান্তই সম্ভবপর তাহা বোধ হয় বুঝা গেল। অতএব এখন একথা বলা যাইতে পারে যে এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণও বর্ণ এবং ব্যবসায় ভেদকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বভাবের ফল বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে পর বর্ণ ও ব্যবসায় ভেদ প্রণালী অবলম্বন ও বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে এদেশে আরো একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মায় সে যে আজীবন ব্রাহ্মণই থাকিবে, যে শূদ্রকুলে জন্মায় সে যে আজীবন শূদ্রই থাকিবে, এরূপ বিবেচনা ও ব্যবস্থা করিবার এদেশে আরো একটি কারণ ঘটিয়াছিল। এদেশের তত্ত্ববিদ্যানুসারে জীবের অবস্থা তাহার কর্ম্মের ফল মাত্র। এক জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার ফলস্বরূপ পর জন্মে তাহার সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। জন্মান্তরবাদ মানিলে এ কথাও যে মানিতে হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সকলেই দেখিয়াছেন যে ইহজীবনে যে চুরি করে, তাহার ভাগ্যে কারাবাস হয়, এবং যে সকলের সহিত ন্যায় ব্যবহার করে তাহার অবস্থা নিরঙ্কুশ হয়। অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার অবস্থা তদনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব যদি জন্মান্তর থাকে তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে এক জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করে পর জন্মে তাহার সেইরূপ অবস্থা হয়। হিন্দু

শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফল এবং জন্মান্তর দুইই মানিতেন। তাই তাঁহারা বর্ণ ও ব্যবসাভেদ প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে গোড়ায় সকল মনুষ্যই এক—সেই এক ব্রহ্ম পদার্থ। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে কর্ম্মগুণে মনুষ্যের স্বভাব বিভিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বভাব বিভিন্ন হইলে মনুষ্যের অবস্থার বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানান্ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেন না সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ সকল মানুষ গোড়ায় এক, কেবল কর্ম্মগুণে বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তরে বিভিন্ন অবস্থা ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এক জন্মের কর্ম্মের গুণে যাহার যেরূপ স্বভাব হয়, পর জন্মে সে সেই স্বভাবোপযোগী অবস্থা এবং কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন ঃ—

> ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
> কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ। (১৮অ—৪১)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির স্বস্ব স্বভাব সম্ভূত গুণে কর্ম্ম সকল চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

কর্ম্মগুণে স্বভাব, স্বভাবের উপযোগী পদ, অবস্থা এবং ব্যবস্থা—ইহাই ত প্রকৃত ন্যায়, প্রকৃত বিচার, প্রকৃত সাম্য,

প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা। যাঁহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা হয়ত এই খানে হিন্দুশাস্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা করিবেন—তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতেই বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?—বৈশ্য কিছুতেই ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না? হিন্দু শাস্ত্রকার বোধ হয় এ কথার উত্তরে বলিবেন, পারিবে—কিন্তু এজন্মে নয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে যেমন বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ জন্মে তেমনি আপন বর্ণধর্ম্ম পালন করিয়া এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে পর জন্মে-উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। গৌতম বলিয়াছেন—বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ঠদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্ত-বিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে (সংহিতা ১১শ অধ্যায়)। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের লোক সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানন্তর স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মফল অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু শ্রুত বৃত্ত বিত্ত সুখ ও মেধা লাভ করত জন্ম গ্রহণ করে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে এজন্মে যে উত্তম কর্ম্ম করে পরজন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্তি—উত্তম ধর্ম্মচর্য্যার ফল। একথার অর্থ এই যে পার্থিব জীবনে বর্ণভেদ প্রণালীর কার্য্যকারিতা থাকিলেও সে প্রণালী প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক প্রণালী। অর্থাৎ সে প্রণালী মানুষের ধর্ম্মবিষয়ক ক্রমোন্নতির সোপান। জীবজগতে ক্রমো-ন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত জীবশ্রেণী ও যা, হিন্দুশাস্ত্র-

কারের মতে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত বর্ণশ্রেণীও তাই। অতএব জীবজগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ জীবশ্রেণী আছে তাহাতে যদি অবিচার এবং বৈষম্য না থাকে, তবে হিন্দুর ধর্ম্ম জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ বর্ণশ্রেণী আছে তাহাতেও অবিচার এবং বৈষম্য নাই। হিন্দুশাস্ত্রকারের এই কথা। অতএব হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে বর্ণভেদ প্রণালীতেও পার্থিব অবস্থা ও মর্য্যাদা ইত্যাদির উন্নতি আছে। তবে ইউরোপে যে প্রণালীতে সে উন্নতি হয়, ভারতের তদ্বিষয়ক প্রণালী তাহা হইতে দুইটি বিষয়ে ভিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি পার্থিব চেষ্টার ফল, ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মচর্য্যার ফল। ইউরোপে বাহ্য সম্পদের জন্য চেষ্টা করিয়া যে যত কৃতকার্য্য হয় লোক মধ্যে তাহার তত সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ভারতে যে যত ধর্ম্মচর্য্যা করে সমাজে তাহার তত সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে পার্থিব উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির ফল মাত্র এবং ধর্ম্মোন্নতির একান্ত অনুযায়ী।* দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি ইহজন্মে হইয়া থাকে, ভারতে পার্থিব উন্নতি জন্মান্তরেও হয়। অর্থাৎ ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবনেই শেষ হইয়া যায়, ভারতে ইহজীবন ইহজীবনে শেষ হয় না, বহু জীবনের সহিত সম্বদ্ধ; ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবন লইয়াই সম্পূর্ণ, ভারতে ইহ-

* ধ্রুব, ৯০ পৃষ্ঠা।

জীবন অনন্ত জীবনের একটি অংশ মাত্র। ইউরোপে একটি জীবন লইয়াই একটি জীবন, ভারতে অসংখ্য জীবন লইয়া একটি জীবন। ইউরোপে ইহজীবন ছাড়া আর কাল নাই, ভারতে ইহ জীবন অনন্তকালের একটি অণু মাত্র। ইউরোপে অংশ—সমষ্টি হইতে পৃথক, ভারতে অংশ—সমষ্টির সহিত সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। ইউরোপ অংশদর্শী, ভারত সমগ্রদর্শী। ভারতের অংশ ইউরোপের সম্পূর্ণতা, ইউরোপের সম্পূর্ণতা ভারতের অংশ। তাই ইউরোপে ইহজীবন লইয়াই পার্থিব উন্নতি, ভারতে অনন্তজীবন লইয়া পার্থিব উন্নতি। হিন্দুশাস্ত্রের এই মর্ম্ম। এ বিষয়ে আমাদের নিজের কি মত তাহা ব্যক্ত করা যদি আবশ্যক বোধ হয় স্থানান্তরে করিব। এখানে কেবল হিন্দুশাস্ত্রকারের পক্ষ হইতে এই কথা বলিব যে হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীতে হিন্দুর সোঽহং-বাদ মূলক সমত্ববাদ এবং মৈত্রী-বাদের কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ নাই, সম্পূর্ণ অনুকূল প্রমাণই আছে।

৩

হিন্দু বর্ণভেদ প্রণালীর আর একটি লক্ষণ আছে। সে লক্ষণটি ইউরোপীর সমাজে দৃষ্ট হয় না। সেই লক্ষণটির কথা এখন বলিব।

হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীতে সমত্ব আছে কি না বুঝিতে হইলে হিন্দু কাহাকে সমত্ব বলেন, অথবা হিন্দুর বিবেচনায় প্রকৃত সমত্ব কি, বা প্রকৃত সমত্ব কিসে হয়, অগ্রে তাহাই বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। তুমি আমি যাহাতে সমত্ব দেখি, হিন্দু শাস্ত্রকার হয় ত তাহাতে বৈষম্য দেখিয়াছিলেন। অতএব হিন্দুশাস্ত্র-কার কিসে সমত্ব দেখিতেন, অগ্রে তাহা ঠিক করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে হিন্দু পার্থিব পদার্থ এবং পার্থিব আসক্তিতে সমত্ব দেখেন না, বৈষম্যই দেখেন। হিন্দুর মতে এক ব্রহ্ম বৈ আর কিছুতেই সমত্ব নাই, ব্রহ্ম পদার্থ যেখানেই থাকুক আর যাহাতেই থাকুক তাহা এক এবং সমান। ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রক্ষিপ্ত, জগৎ বল, সৃষ্টি বল, পৃথিবী বল, পার্থিবতা বল, যাহাই বল, ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রক্ষিপ্ত তাহাই বহু এবং বহু বলিয়া বৈষম্য বিশিষ্ট। তাই হিন্দুরমতে পার্থিব পদার্থ এবং অধিকারে সমত্ব নাই এবং থাকিতে পারে না, কেবল মাত্র বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পার্থিব পদার্থ এইং অধিকারের অপলাপে বা পরিত্যা-গেই প্রকৃত সমত্ব হইয়া থাকে। পার্থিবতা এবং পার্থিব অধি-কার বহু জিনিষ লইয়া। অতএব লোকমধ্যে পার্থিবতা এবং পর্থিব অধিকার যত বৃদ্ধি হয়, তাহাদের মধ্যে বৈষম্যও তত বৃদ্ধি হয়। শুধু তাহাও নয়, পার্থিবতা বাড়িলে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সমত্ব কমিয়া বৈষম্য বাড়ে। অর্থাৎ সমস্ত মানসিক শক্তি, হৃদয়ের প্রবৃত্তি ইত্যাদির মধ্যে যেটির যতটুকু ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব থাকিলে ব্যক্তিগত সমত্ব বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তাহার কমবেশী হইয়া পড়ে। এবং কমবেশী হইয়া পড়িলেই প্রত্যেক ব্যক্তি বৈষম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বৈষম্যে পূর্ণ হইয়া উঠিলে মানুষ যেন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই ইতস্তত করিতে থাকে, কি চিন্তায়, কি কার্য্যে কিছুতেই স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারে না। ইউরোপে পার্থিবতা এত প্রবল বলিয়া সেখানকার লোক—কি বড়; কি ছোট—সকলেই এত অস্থির, এত চঞ্চল, এত পরিবর্ত্তনপ্রিয়। ইউরোপের অস্থিরতা, চঞ্চলতা এবং পরিবর্ত্তনপ্রিয়তাকে উন্নত প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া মনে করা বড়

ভুল। উহা প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট প্রকৃতিরই লক্ষণ। ইউরোপে আত্মসমত্ব নাই বলিয়াই তথায় ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পার্থিবতা বৃদ্ধি হইলে যখন আত্মসমত্বই নষ্ট হইয়া যায়, আপনাকেই যখন বৈষম্যময় হইয়া উঠিতে হয়, তখন সামাজিক সমত্ব কেমন করিয়া বাড়িবে এবং সামাজিক বৈষম্য কেমন করিয়া কমিবে? ফলতঃ পার্থিবতা যেখানে প্রবল, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিও যেমন বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্য সমস্ত সমাজও তেমনি বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্য। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা পার্থিবতার উল্টা জিনিষ। আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মমুখী এবং পার্থিবতা হইতে বিমুখ। এক সমত্বময় ব্রহ্মপদার্থ লইয়া আধ্যাত্মিকতা। অতএব যেখানে পার্থিবতার পরিহার এবং আধ্যাত্মিকতার আদর, সেখানে কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত সকল প্রকার সমত্বের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বিনাশ। পার্থিব পদার্থ এবং অধিকার পরিত্যাগে এবং আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধিতে প্রকৃত সাম্য বা সমত্ব, এ কথা না বুঝিলে হিন্দু বর্ণভেদ প্রণালীতে যে প্রকৃত সমত্ব আছে তাহাও বুঝা যাইবে না। সংসার কার্য্যে পার্থিব পদার্থ এবং অধিকারের সংস্রব এককালে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই বর্ণভেদ প্রণালীতে ক্ষত্রিয়ে রাজকার্য্য এবং রাজ্যরক্ষার ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বৈশ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শূদ্রে সমাজের সেবার ভার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মন্বাদি ঋষিদিগের প্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ বিবেচনার সহিত অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে পার্থিব পদার্থ সম্পদ বা অধিকার দেওয়া বর্ণভেদ প্রণালীর উদ্দেশ্য নয়, পরিত্যাগ করানই উদ্দেশ্য। সমাজ রক্ষার্থ

সে প্রণালীতে যে বর্ণের যতটুকু পার্থিব সংস্রব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকু মাত্র সংস্রব রাখিবার ব্যবস্থা আছে, অবশিষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা পার্থিব সংস্রব আসক্তি এবং অধিকার পরিত্যাগপক্ষে। ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই; শয়ন ভোজন ভিন্ন তাঁহার অন্য পার্থিব অধিকার নাই বলিলেই হয়। অধ্যয়ন অধ্যাপনা যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা এই সকল লইয়াই ব্রাহ্মণের জীবন। ধনোপার্জ্জন তাঁহার কার্য্য নয়। ভোগবিলাস তাঁহার দিক্ দিয়াও যাইতে পায় না। ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্যেশ্বর বটে, কিন্তু তিনি পার্থিব ভোগের অধিকারী নন। প্রকৃত রাজা হইতে হইলে তাঁহাকে নানা বিদ্যাসম্পন্ন নানা গুণালঙ্কৃত জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত বিলাস-বিদ্বেষী সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল মহাপুরুষ হইতে হয়।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়োহি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥
দশ কাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ॥

মনুসংহিতা, ৭ অ—৪৩ হইতে ৪৫।

ত্রিবেদী হইতে রাজা বেদ শিক্ষা করিবেন, এবং দণ্ডনীতি তর্কবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা এবং বার্ত্তারম্ভ শাস্ত্র যথাসম্ভব লোকের নিকট শিক্ষা করিবেন। দিবারাত্রি ইন্দ্রিয় জয় করিবেন। জিতেন্দ্রিয় রাজা প্রজাগণকে বশীভূত করিতে পারেন। কামজ দশটি এবং ক্রোধজ আটটি ব্যসন যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

আবার ঃ—

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে॥
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥
তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ॥

মনু, ৭ অ—৩৭ হইতে ৩৯।

রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ত্রিবেদজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিবেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞাধীন থাকিবেন। বেদবিৎ শুদ্ধস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিত্য সেবা করিবেন। যে সতত বৃদ্ধসেবা করে, রাক্ষসেরা—হিংস্রকেরাও তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। রাজা বিনীত হইলেও ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট বিনয় শিক্ষা করিবেন। বিনীত রাজা কখনই বিনষ্ট হয়েন না।

রাজার চিন্তার মধ্যে দুইটী—ধর্ম্মের চিন্তা এবং রাজ্যের চিন্তা। এবং কাজের মধ্যে দুইটি—আত্মার কাজ এবং রাজ্যের কাজ। এই দুইটি চিন্তায় এবং এই দুইটি কাজে তিনি দিবা রাত্রি নিযুক্ত। কেবল দিবসে দুই চারি দণ্ডের জন্য একবার ভোজন ও বিশ্রাম এবং রাত্রিতে দুই চারি দণ্ডের জন্য একবার ভোজন ও নিদ্রা। হিন্দু রাজা অতুল পদ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কিন্তু ধর্ম্মই তাঁহার প্রকৃত অধিকার। জনক যুধিষ্ঠিরের ন্যায় হিন্দুরাজা মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট মহাযোগীমাত্র। সকল হিন্দুরাজাই যে মহাযোগী ছিলেন তাহা নয়।

কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র এত উন্নত এবং রাজধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও নীতি এত উচ্চ ও পবিত্র, সে দেশে অনেক রাজা যে জনক যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। বর্ণভেদ প্রণালীতে পৃথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্য ধন সম্পত্তি বৈশ্যের বটে। কিন্তু সে ধন বৈশ্যের নিজের ভোগের নিমিত্ত নয়, সে ধন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ সদাব্রত সদনুষ্ঠান সমাজসেবা এবং রাজভাণ্ডার পোষণার্থ। একথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আবশ্যক নাই। ধন যে সৎকর্ম্মের জন্য এবং পাঁচজনের উপকারে জন্য, একথা এদেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমান প্রচলিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কথা ভাল জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি বা বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে সে সব দেশে একথা এদেশের ন্যায় প্রচলিত নাই। এদেশে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতেও দুই চারি টাকার সঙ্গতি হইলে, সেই শ্রেণীর লোকে প্রত্যাশা করিয়া থাকে যে সে তাহা সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবে এবং কার্য্যতঃ সে তাহাই করিয়া থাকে, প্রায়ই নিজের ভোগে বা ব্যবহারে ব্যয় করে না। এবং ধনের অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি ক্রিয়াকলাপ বা পাঁচজনকে প্রতিপালন না করে, এদেশে সে যেমন সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়, বোধ হয় আর কোন দেশে তেমন হয় না। এদেশে ধন ভোগের জন্য নয়—ধর্ম্মচর্য্যার জন্য। সেই জন্য বর্ণভেদ প্রণালীতে ধনোপার্জ্জন পার্থিব বাসনা পূরাইবার জন্য নয়। মূর্খ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ। কিন্তু তাহাকেও মুক্তি চিন্তা করিতে হইবে, ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত বারব্রত করিতে হইবে, এবং

ব্রাহ্মণের মুখে পুরাণ কথা শুনিতে হইবে। সকলেই জানেন যে স্ত্রী এবং শূদ্রের নিমিত্তই পুরাণের সৃষ্টি।

দেখা যাইতেছে যে এ দেশের বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় ভেদ হইলেও ব্যবসায়ার্জ্জিত বিষয়ভোগের জন্য বর্ণভেদ নয়। এ দেশের বর্ণভেদ প্রণালীতে বর্ণ যে পরিমাণে উচ্চ পার্থিব সম্পদ ও অধিকার সে পরিমাণে বেশি নয়, পার্থিব সম্পদ ও অধিকারের পরিহার সেই পরিমাণে বেশি। এদেশের বর্ণভেদ প্রণালীতে পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণের পক্ষেই ব্যবস্থিত, এবং সেই পার্থিবতা পরিহারে সকল বর্ণের অপূর্ব্ব সমত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু পার্থিবতা পরিহারই যদি বর্ণভেদ প্রণালীর প্রকৃত সমত্ব হয়, তবে আর একটা কথা না মানিয়া থাকা যায় না। সে কথাটা এই যে, বর্ণভেদ অনুসারে যে পার্থিব অধিকারভেদ আছে, তাহাকে কিছুতেই বর্ণমধ্যে বৈষম্যের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সে সকল অধিকার বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ সমৃদ্ধি এবং ভোগের নিমিত্ত দেওয়া হয় নাই, কেননা পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণেরই সমান উদ্দেশ্য। অতএব সম্ভব এই যে, সমস্ত সমাজের রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে পার্থিব বলিয়া বৈষম্যের কারণ, এরূপ বিবেচ্য হইলেও সে সকল বিশেষ বিশেষ পার্থিব অধিকার বর্ণ সকলের মধ্যে বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না। কেননা সে সকল অধিকার বর্ণ বিশেষের উদ্দেশে প্রদত্ত হয় নাই, সমস্ত সমাজের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা সকল লোকের উদ্দেশে দেওয়া হয় তাহা লোক বিশেষের অযথা অভিমান বা

অহঙ্কারের কারণ হইতে পারে না। হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালী আধ্যাত্মিকতা বা ত্যাগমূলক বলিয়া উহাতে যে পার্থিব অংশটুকু আছে, তাহাও বর্ণ সকলের মধ্যে সমত্বের বিরোধী হইতে পারে নাই। সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি করিলে এতই লাভ হয়, সমাজ এতই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে।

এখন এ কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে ইউরোপের ন্যায় এদেশে পার্থিব ভোগাধিকার লইয়া বর্ণভেদ হয় নাই। ইউরোপের ন্যায় এদেশে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ-ভেদে পার্থিব ভোগাধিকার নয়, এদেশে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণভেদে পার্থিবতা ত্যাগ এবং ধর্ম্মচর্য্যা। এই কথা বিবেচনা করিয়াই মার্কিণ পণ্ডিত জন্সন্ বলিয়াছেন:—"As the basis of Brahminical speculation is that self is nothing and that of their ethics that selfishness is hell, so the substance of their jurisprudence is a discipline of entire self renunciation. The theoretic aim of the Manavasastra is the utter suppression of selfish desire." আর এক স্থলে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের আত্মসংযম এবং পরার্থপরতা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া সেই পণ্ডিত বলিয়াছেন:—"We see the same endeavour in the stern disciplines laid upon servants, priests and kings, a deeper democracy of renunciation beneath the tyrannies of caste.*"

* *Oriental Religions* নামক গ্রন্থের ভারত সম্বন্ধীয় খণ্ডের ৩য় অধ্যায় দেখ।

পার্থিবতায় হিন্দু সমত্ব দেখেন না, বৈষম্য দেখেন, হিন্দুর সমত্ব পার্থিবতা ত্যাগে। তাই হিন্দুর বর্ণভেদে অর্থাৎ শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে পার্থিবতা পরিত্যাগের পরিমাণভেদ। "The demands of asceticism rose in proportion to one's elevation in caste life." *, যে পার্থিবতায় বৈষম্য এবং বৈষম্যের মূল সেই পার্থিবতা পরিত্যাগের ব্যবস্থাতেই হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীর অপূর্ব্ব সাম্য বা সমত্ব রহিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজপ্রণালী দেখিয়া যাঁহাদের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে পার্থিব অধিকারের সমান বিভাগ লইয়াই সামাজিক সাম্য, তাঁহারা হিন্দুসমাজ-শরীরে যে অপূর্ব্ব সমত্ব আছে, তাহা বুঝিতে একেবারেই অসমর্থ, এবং তাই তাঁহারা শূদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে বিবাহ করিতে পারে না কেন, বৈশ্য যুদ্ধ করিতে পারে না কেন, এইরূপ নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করিয়া বিষম গণ্ডগোল করেন, এবং লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে হিন্দু সমাজে সাম্যের চিহ্নমাত্র নাই, হিন্দু সমাজ সাম্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

হিন্দু-বর্ণভেদ প্রণালীর মূলে যে সমত্ব আছে, তাহার যে অর্থ করিলাম হিন্দুসমাজ দৃষ্টে তাহা বড় একটা ভুল বলিয়া মনে হয় না। এখন হিন্দু সমাজে বর্ণ লইয়াই মানুষ মানুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। আর কিছু লইয়া মানুষকে মানুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবার রীতি নাই। একটি একটি বর্ণ লইয়া বিচার

* *Oriental Religions* ৭ম অধ্যায়।

করিলে একথা ঠিক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু কায়স্থের মধ্যে সকল কায়স্থই সমান, কেহ কোন রকমে কাহারো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। কায়স্থ সমাজের মধ্যে যিনি ক্রোরপতি তিনিও যেমন এক জন, যিনি উদারান্নের জন্য লালায়িত তিনিও তেমনি এক জন; যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তিনিও যেমন এক জন যিনি মূর্খ এবং নিরক্ষর তিনিও তেমনি এক জন। ক্রোরপতি কায়স্থ কাঙ্গাল কায়স্থের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন, কাঙ্গাল কায়স্থের ঘরে কন্যাদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না। আমার বাল্য-কালের একটি কথা মনে পড়ে। পল্লীগ্রামস্থ এক কায়স্থের বাড়ীতে স্বজাতীয়দিগের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে, আহারাদি প্রস্তুত, চণ্ডীমণ্ডপ আটচালা নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে পণ্ডিতও আছেন, ধনাঢ্যও আছেন। সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া আছেন--ভোজন আরম্ভ হইতেছে না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানি অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, একখানি অতি মলিন উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া একটি লোক আগমন করিলেন। অমনি সমস্ত নিমন্ত্রিত মণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন—'এই যে মিত্রজ মহাশয় আসিয়াছেন এইবার তবে ভোজনের উদ্যোগ হইতে পারে'। যিনি আসিলেন তিনি কাঙ্গাল কিন্তু কায়স্থ। তাই পণ্ডিত মূর্খ ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষ উপস্থিত সমস্ত কায়স্থ সেই কাঙ্গালের অপেক্ষায় ভোজন হইতে বিরত থাকিয়া বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন।

এদেশে এক বর্ণভেদ আছে মাত্র, নহিলে সকল লোকই সমান। এদেশে বর্ণের ভিতরে ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্র পান ভোজন ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইউরোপে তাহা হয় না। সেখানে বর্ণভেদ নাই বটে। কিন্তু অবস্থা সম্পদ সম্পত্তি বিদ্যা যশ প্রভৃতি বহুতর জিনিষ লইয়া পান ভোজন বিবাহাদির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে লোকমধ্যে প্রকৃত সাম্য এদেশে যত আছে ইউরোপে তত নাই। অতএব বলিতে পারা যায় যে হিন্দুর সোঽহং মূলক সমত্ববাদ শুধু শাস্ত্রের বচন নয়। হিন্দুর সমাজে সে সমত্ব বহুল পরিমাণে আছে।

হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালী সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে বলিতে হইবে। সে কথা এই যে, বর্ণভেদ প্রণালী অনুসারে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের যে পদ অপরাপর বর্ণের পদ তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ অপরাপর বর্ণের কথা বিস্মৃত নহেন। এত বড় হইয়া ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুদ্র অতি অধমের ভাবনাও ভাবিয়াছেন। সমাজের যে যেখানে আছে এবং যে যেমন হউক তিনি সকলকেই জানেন, সকলেরই তত্ত্ব লয়েন, সকলেরই পরকালের ভাবনা ভাবেন, সকলেরই উদরান্নের জন্য চিন্তা করেন। মনু বলিনেছেন—

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তোজীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥

(১০অ—৯৯)

শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবায় অপারগ হইলে যদি তাহার স্ত্রী পুত্র অন্নাভাবে মারা যায়, তবে সে কারুকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এইরূপ দেখিবে, হিন্দুশাস্ত্রকার অতি অধমের ভাবনাও ভাবিয়া থাকেন—সমাজের ছোট বড় সকলের নিমিত্তই বিধি ব্যবস্থা করেন। হিন্দুশাস্ত্রকারের কাছে শূদ্র অধম বটে, চণ্ডাল অস্পৃশ্য বটে। কিন্তু যেখানে জঠরানলের কথা, সেখানে হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্রাহ্মণের জন্য ও যেমন ভাবনা,অধম শূদ্র এবং অস্পৃশ্য চণ্ডালের জন্যও তেমনি ভাবনা। ছোট বড় উত্তম অধম সকলের প্রতি স্নেহ না থাকিলে এরূপ হয় না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসে যাঁহারা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন তাঁহারা সমাজের ক্ষুদ্র ও দরিদ্রের ভাবনা ভাবিতেন না, বরং ক্ষুদ্র এবং দরিদ্রকে ইচ্ছা করিয়া ক্লেশ দিতেন। তাই প্রাচীন রোম ও গ্রীসে উদরান্নের কথা লইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত নিম্ন শ্রেণীর লোকের সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। আজিকার দিনেও কোন কোন উন্নতচেতা এবং সহৃদয় ইংরাজের মুখে শুনা যায় যে, ইংরাজ সমাজে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা আপনাদের ভাবনাই ভাবিয়া থাকেন, দুঃখী শ্রমজীবী ইংরাজের ভাবনা বড় একটা ভাবেন না।

৪

হিন্দুর আতিথেয়তা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। হিন্দুর মতে অথিতি সৎকার অতি উচ্চ অতি পবিত্র অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। হিন্দুর গৃহে যখনি অতিথি আসিবেন তখনি তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন। যে গৃহস্থ উপস্থিত অতিথিকে ভোজন না

করাইয়া আপনি ভোজন করেন তাঁহার বড়ই অধোগতি হইয়া থাকে।

স্ববাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিনীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্॥
অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ॥

মনু, ৩অ—১১৪ ও ১১৫।

কিন্তু নব পরিণীতা বধূ, দুহিতা, বালক, রোগী ও গর্ভবতী ইহাদের বিষয় কিছু বিচার না করিয়া অতিথি ভোজনের পূর্ব্বেই ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি হইতে দাস পর্য্যন্ত লোকদিগকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করে সে জানেনা যে মরিলে তাহার দেহ শকুনি ও কুকুরেরা ভোজন করিবে।

এই অতিথিসেবারূপ ধর্ম্মচর্য্যা বোধ হয় প্রাচীন ভারতে বড়ই প্রবল এবং প্রীতিকর ছিল। গৃহস্থের ত কথাই নাই, তাঁহারা অতিথি পাইলে যেন চরিতার্থ হইতেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেন বৈকুণ্ঠের পবিত্র আনন্দ উথলিয়া উঠিত। গৃহস্থ, গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, মাতৃষসা, পিতৃষসা, পিতামহী, বালক, বালিকা, দাস, দাসী সকলেই সেই অতিথিকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন; গৃহস্থের গৃহ যেন বৈকুণ্ঠপতির আনন্দোৎফুল্ল বৈকুণ্ঠধাম হইয়া উঠিত। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া বনে বাস করিতেন তাঁহারাও মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অতিথি সেবা করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান

করিতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আতিথ্য, ভরদ্বাজের আতিথ্য, কণ্বের আতিথ্য, আরো কত মহামুনির আতিথ্যের কথা সংস্কৃত কাব্যে ও পুরাণে দেখিতে পাই। হিন্দুর সে সব দিন গিয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব আর নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এত যে অধম, এত যে অধঃপতিত, এত যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দু তাহারও যে অতিথিসেবা দেখিয়াছি তাহা আজিকাল আর দেখিতে পাই না। আমারা শৈশবে পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থ হিন্দুর ঘরে অতিথি-সেবায় যে উৎসাহ, উল্লাস ও উন্মত্ততা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। যাঁহাদের অতিথিসেবা দেখিয়াছিলাম তাঁহারা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখন ইংরাজি শিখিয়া সভ্য ও উন্নত হইয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন সেবা শুশ্রূষা লইয়াই উন্মত্ত! এই যে আতিথেয়তার কথা বলিতেছি ইহা প্রীতি বা মৈত্রীর ফল। আপন পর নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব বা মৈত্রী না থাকিলে অতিথি সেবায় লোকের এত আনন্দ, উৎসাহ এবং আগ্রহ হয় না। হিন্দুধর্ম্মচ্যুত নব্য হিন্দু মুখে যাহাই বলুন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা আপন পর নির্ব্বেশেষে সকল মনুষ্যের প্রতি মৈত্রী ও সদ্ভাব বিশিষ্ট নন বলিয়া আজিকার হিন্দুসমাজে অতিথির প্রতি এত বিরাগ এবং হিন্দুর গৃহে অতিথির এত অভাব। হিন্দুশাস্ত্রকারের সোঽহংবাদ মূলক মৈত্রীবাদ ভুলিয়া হিন্দুর জীবন পশুবৎ হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়। হিন্দুর জীবন এবং সমাজ নিয়মাক মহামন্ত্র। আমরা শৈশবে ও বাল্যকালে অনেক হিন্দুর গৃহে একটি অন্নদান প্রথা দেখিয়াছিলাম। সে প্রথা

পারিবারিক প্রণালীর ফল নয়। অনেক হিন্দুর গৃহে এমন অনেক লোক প্রতিপালিত হইত যাহারা গৃহস্থের জ্ঞাতি কি কুটুম্ব নয়, দরিদ্র বলিয়া প্রতিপালিত, গৃহস্থের সহিত কোন সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, হয়ত গৃহস্থ যে জাতীয় সে জাতীয়ই নয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে গৃহকর্ত্তার বড়ই আনন্দ, বড়ই উৎসাহ, বড়ই আগ্রহ। তাহাদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে যদি ফকির হইতে হয়, গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণী তাহাতেও স্বীকৃত। তাহারা পর বটে, কিন্তু গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণীর কাছে তাহারা আপনার হইতেও আপনার। গৃহকর্ত্তার ও গৃহিণীর আপনার পুত্র কন্যা যেমন খাইবে পরিবে তাহারাও তেমনি খাইবে পরিবে। যদি ইতর বিশেষ করিতেই হয় তবে আপনাদের পুত্র কন্যা বরং খারাপ খাইবে তবু তাহারা খারাপ খাইবে না। তাহাদিগকে পুত্র কন্যা অপেক্ষাও প্রিয়বৎ প্রতিপালন করিতে গৃহকর্ত্তার শক্তি যদি কমিয়া যায়, সাবিত্রীসমা সহধর্ম্মিণী পরের জন্য স্বামীর ন্যায় সমান কাতর হইয়া প্রফুল্লচিত্তে এবং আগ্রহ সহকারে আপন অঙ্গ হইতে এক এক খানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার মোচন করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পন করিবেন *। আপন

* যে পতিপত্নীর জীবন প্রবাহ এইরূপে একটি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হয় তাহাদের বিবাহ বা মিলনকেই আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে। এরূপ পতি-পত্নী এখন আর এদেশে বড় নাই, কিন্তু বাল্যকালে বুড়োদের মধ্যে অনেক দেখিয়াছি। অতএব নিশ্চয় বলিতে পারি যে প্রাচীন ভারতে যখন হিন্দুর অধঃপতন হয় নাই তখন এরূপ এবং ইহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পতিপত্নী বিস্তর ছিল। হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক মিলন বলিলে যে সকল কৃতবিদ্য বাঙ্গালি উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা কেমন করিয়া সমাজ দেখেন ও শাস্ত্র বুঝেন বলিতে পারি না।

পর নির্ব্বিশেষে মনুষ্যের প্রতি কত অনুরাগ হইলে তবে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের এমন ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু হিন্দু জাতির এবং হিন্দু ধর্ম্মের এই অধোগতির দিনেও হিন্দু সমাজে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের এরূপ ব্যবহার যেরূপ বহুল পরিমাণে দেখিয়াছি তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় প্রাচীন ভারতে যখন হিন্দু জাতির এবং হিন্দু ধর্ম্মের অধোগতি হয় নাই তখন হিন্দু সমাজে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহারে প্রীতি বা মৈত্রী প্রকৃত পক্ষে অপরিমেয় ও অপরিসীম ছিল। সেই জন্যই বলি যে হিন্দু শাস্ত্রকারের মৈত্রী শুধু মুখের কথা নয়, হিন্দুর সংসারক্ষেত্রে একটি অতি প্রবল কার্য্যকারী শক্তি।

বাস্তবিক হিন্দুর পরিহিতেচ্ছা এবং পরের প্রতি মৈত্রী বা সদ্ভাব এমনি প্রবল যে কিছুতেই তাহার বাধাবিঘ্ন ঘটাইতে অথবা তাহার বেগ বা পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে না। হিন্দুর কাছে দরিদ্র ভিক্ষুক যে প্রকার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাতে এই কথার প্রচুর এবং পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুর কাছে কি হিন্দু ভিখারী কি মুসলমান ফকির কি বিলাতি বেগর (Beggar) সকলেই সমান। হিন্দুর কাছে হিন্দু ভিখারীর যে ভিক্ষামুষ্টি, মুসলমান ফকিরেরও সেই ভিক্ষামুষ্টি, বিলাতি বেগরেরও সেই ভিক্ষামুষ্টি। হিন্দু অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুর কাছে শাক্ত ভিখারীরও যে আদর, শৈব ভিখারীরও সেই আদর। সকল দেশে এমন হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের কথা বলি শুন। বৃদ্ধভিখারী অদি অচিলট্রী আর্ল অব গ্লেনালন নামক রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ধনাঢ্যের প্রাসাদে

গমন করিয়া দেখিল প্রাসাদের সম্মুখে তিনদল ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া আছে। পরিচ্ছদ দৃষ্টে বোধ হইল যে প্রথম ভিক্ষুক দল রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। সেই দলে প্রবেশ করিলে পর তাহারা তাহাকে Triple man (তিন গুণ ভিক্ষা পাইবার যোগ্য) নয় বলিয়া মহা আস্ফালন করিয়া তাড়াইয়া দিল। অদি অচিলত্রী তখন দ্বিতীয় দলে গমন করিল। তাহারা Episcopal সম্প্রদায়ের ভিখারী, to whom the noble donor allotted a double portion of his charity, তাহাদের জন্য দাতা দুই গুণ ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহারাও তাহাকে তাড়াইয়া দিল। তখন অদি ক্ষুদ্র তৃতীয় দলে প্রবেশ করিল। তাহারা Presbyterian সম্প্রদায়ের ভিখারী who had disdained to disguise their religious opinions for the sake of an augmented dole, তাহারা বেশি ভিক্ষার লোভে আপন আপন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত গোপন করে নাই। তাহার পর ভিক্ষাদান আরম্ভ হইল। প্রথম ভিক্ষুকদল দাতার আপন সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের ভিক্ষাদান কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ভিক্ষুকদল রাজার সম্প্রদায়ভুক্ত। দাতার দ্বাররক্ষক তাহাদের ভিক্ষাদান তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। তৃতীয় দল দাতার সম্প্রদায়ভুক্তও নয়, রাজার সম্প্রদায়ভুক্তও নয়। অতএব একজন সামান্য বৃদ্ধ ভৃত্য সেই দলের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল *। ভিক্ষুকের মধ্যে হিন্দু এমন ইতরবিশেষ

* সর ওয়াল্টর স্কটের Antiquary নামক উপন্যাসের সপ্তবিংশতি অধ্যায় দেখ।

করিতে পারেন না। তাঁহার কাছে সকল ভিক্ষুক সমান। সাম্প্রদায়িকতা লইয়া মানুষ নয়, ব্রহ্মপদার্থ লইয়া মানুষ। ভিক্ষুক হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, খৃষ্টানই হউক, শৈবই হউক, বৈষ্ণবই হউক, সকল ভিক্ষুকই ব্রহ্মপদার্থে নির্ম্মিত, অতএব সকল ভিক্ষুকই সমান। আবার ভিক্ষুক দুঃখী। জাতি বা সম্প্রদায়ভেদে দুঃখের প্রকৃতিভেদ হয় না। অতএব কি হিন্দু ভিক্ষুক, কি মুসলমান ভিক্ষুক, কি ইংরাজ ভিক্ষুক, কি খৃষ্টান ভিক্ষুক, কি শাক্ত ভিক্ষুক, কি বৈষ্ণব ভিক্ষুক সকল ভিক্ষুকই সমান। তাই সকল ভিক্ষুক হিন্দুর সমান দয়ার পাত্র। মৈত্রীবাদে ভেদাভেদের কথা নাই। তাই মৈত্রীবাদাবলম্বী হিন্দু সকল ভেদাভেদ তুচ্ছ করিয়া সকল দরিদ্রকে সমান দয়া করেন। আজিও সুসভ্য ইউরোপ সকল দরিদ্রকে সমান দয়া করিতে পারেন না। ভারতবাসীকে একথার প্রমাণ দিতে হইবে না। তাই বলি, হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদের গুণে হিন্দুর জীবন পৃথিবীর অপর সকলের জীবন অপেক্ষা অশেষ গুণে উন্নত পবিত্র ও প্রেমময় হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথা নয়।

আবার হিন্দুর মৈত্রী শুধু মনুষ্য মধ্যে সম্বদ্ধ নয়, সমস্ত প্রাণীতে প্রসারিত। হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটি যজ্ঞের নাম ভূতযজ্ঞ বা বলিকর্ম্ম।

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥

মনু, ৩অ—৮১।

'অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে এবং বলিকর্ম্মদ্বারা ভূতদিগকে যথাবিধি পূজা করিবে।

অর্থাৎ গৃহস্থকে প্রতিদিন প্রাণীদিগকে আহার দিতে হয়। সকল প্রাণীকেই আহার দিতে হয়।

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিনাং।
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি॥

মনু, ৩অ—৯২।

তৎপরে অপর অন্ন পাত্রে লইয়া কুকুর, কুকুরোপজীবী, কুষ্ঠরোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করিবে।

যে প্রতিদিন সকল প্রাণীকে আহার দেয় তাহার গতিও বড় উত্তম হয়।

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তি পথার্জ্জুনা॥

মনু, ৩অ—৯৩।

যিনি প্রত্যহ এইরূপে সকল প্রাণীকে বলি প্রদান করেন তিনি জ্যোতির্ম্ময় পথদ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

হিন্দু এখন যে প্রতিদিন শাস্ত্রোল্লিখিত পঞ্চযজ্ঞ করেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিবেচনা করিলে নিশ্চয় বোধ হয় যে এক সময়ে হিন্দু মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে প্রতি দিন পৃথিবীর সকল প্রকার জীবকে ক্ষুধায় অন্নদান করিতেন। আজিও প্রায় সকল হিন্দুমতাবলম্বী হিন্দু প্রতি দিন আহারান্তে এক মুষ্টি

করিয়া অন্ন বাটীর বাহিরে পশুপক্ষীদিগকে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। ভোজনপাত্রে শেষান্ন রাখিবার প্রথারও সেই অর্থ। পশুপক্ষী পিপীলিকা প্রভৃতি তাহা খাইয়া ক্ষুধার শান্তি করিবে। জগতের সর্ব্বজীবে দয়া সর্ব্বজীবের দুঃখে দুঃখ সর্ব্বজীবের সুখে সুখ হিন্দুর যেমন দেখিয়াছি আর কাহারো তেমন দেখি নাই। সমস্ত প্রাণীতে হিন্দুর মৈত্রী। তাই ভারতে মানুষ শুধু মানুষ লইয়া সম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত নয়। নিকৃষ্ট প্রাণী সকল মানুষের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। সে সকল প্রাণী মানুষের অংশস্বরূপ। মানুষ তাহাদিগকে লইয়া সম্পূর্ণ, তাহাদিগকে ছাড়িলে অসম্পূর্ণ। তাই ভারতের হিন্দুর কাছে নিকৃষ্ট প্রাণীর এত আদর ও সম্মান। তাই নিকৃষ্ট প্রাণী ভারতের হিন্দুর সমাজের ও পরিবারের অন্তর্গত। তাই হিন্দুর সাহিত্যে মানুষ এবং নিকৃষ্ট প্রাণী একত্রে জীবনলীলা অভিনয় করে এবং নিকৃষ্ট প্রাণী ব্যতিরেকে হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ হয় না। ভারতের হিন্দুর কাছে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও আদর দেখিয়াই জীববৎসল ফরাসি পণ্ডিত মিশালা (Michelet) বলিয়াছেন ঃ—
"Beneath human castes there lies an immense caste, the poor brute world, to be delivered, to be lifted up. This is the triumph of India, of Rama and the Ramayana. Hanuman is the Ulysses and Achilles of this epic war. More than any one else he delivers Sita. After the victory, Rama crowns and celebrates him. Between the two armies, before men and gods, *Rama and Hanuman embrace.* Talk

no more of castes. The lowest of men may say, Hanuman has freed me." * তাই বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথা বা শাস্ত্রের লিপি নয়।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারের মৈত্রীর অর্থ কেবল প্রাণীর প্রতি অনুরাগ নয়, গাছ পালা লতা পাতা ফুল ফল সরিৎ সরোবর পাহাড় পর্ব্বত জগতে যাহা কিছু আছে সকলেরই প্রতি অনুরাগ। হিন্দুর সাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব অনুরাগের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যাবাসীরা রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিতে না পারিয়া শোকোচ্ছ্বলিত অন্তঃকরণে বলিতেছে—

আপগা কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ বনে শুভাঃ।
যাসু পাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি ॥
বিচিত্র কুসুমাপীড়া মঞ্জরী মধুধারিণঃ।
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রস্থা রময়িষ্যন্তি রাঘবং ॥
অকালে হ্যপি মুখ্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্তি সানূনি গিরীণাং রামমাগতং ॥
কাননং বাপিশৈলং বা যং রামোঽভি গমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যতি নার্চ্চিতুং ॥

অযোধ্যা কাণ্ড, ৪৫ সর্গ॥

অরণ্য মধ্যে বিকশিত পঙ্কজ সমূহে সুশোভিত সেই সকল জলাশয় কতই বা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন করিয়া তাহাদিগের সুশীতল জলপান করিবেন। কানন বিভাগে পর্ব্বতের শিখরস্থিত পাদপেরাই

---

* Oriental Religions নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

সুজাত ও কৃতপুণ্য, যেহেতু তাহারা বিচিত্র কুসুম সমূহে সুশোভিত হইয়াও মঞ্জরি হস্তে মধুধারণ পূর্ব্বক রঘুনাথের মনোরঞ্জন করিবে। এক্ষণে পর্ব্বতসানু সকল শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাহারা অকালেও সুস্বাদু সমুচিত ফল ও মূল দর্শন করাইবেক। কাননেই হউক আর পর্ব্বতেই হউক, শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন সমাগত প্রিয়তম অতিথিজ্ঞানে কি তাহারা সমাদরে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে শক্ত হইবে না? অবশ্যই হইবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের অনুবাদ।

পর্ব্বত সরোবর বৃক্ষ লতা ফুল ফল—ইহারা মানুষের ন্যায় চৈতন্য বিশিষ্ট। মানুষের ন্যায় ইহাদের সুখ দুঃখ আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের পাপ পুণ্য আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের প্রীতি প্রণয় আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের ঘরকন্না আছে। মানুষের ন্যায় ইহাদের আতিথেয়তা প্রভৃতি গৃহধর্ম্ম আছে। ইহাদের এক একটি মানুষের ন্যায় এক এক জন। মানুষের সুখ সম্ভোগের বস্তু বলিয়া এক এক জন নয়; আপনারা সুখ সম্ভোগের অধিকারী বলিয়া এক এক জন। মানুষ যেমন ইহাদিগকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করে, ইহারাও তেমনি মানুষকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করে। মানুষের জীবন যেমন ইহাদের জীবনের অন্তর্গত, ইহাদের জীবনও তেমনি মানুষের জীবনের অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তজীবনে মানুষ এবং ইহারা সকলেই এক আকারে একভাবে এক তানে এক লয়ে মিশিয়া রহিয়াছে। তাই কাননে ফুল ফুটিলে মনুষ্যহৃদয়ে প্রেম ফুটিয়া

উঠে, স্রোতস্বতীতে স্রোত বহিলে মনুষ্যহৃদয়ে ভক্তিস্রোত উথলিয়া উঠে। হিন্দুর সাহিত্যে যে রকম পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লতা ফুল ফল জল স্থল দেখিতে পাই আর কোন সাহিত্যে সে রকম দেখিতে পাই না। অন্য সাহিত্যে বৃক্ষ লতা পাহাড় পর্ব্বত ফুল ফল সরিৎ সরোবর আছে, কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণে নাই। যাহা আছে তাহা মানুষের ভোগ সুখের উপকরণ বলিয়া আছে, মানুষের ন্যায় স্বয়ং ভোগসুখের অধিকারী বলিয়া নাই। হিন্দুর সাহিত্যে মানুষ যে অসীম প্রাণ সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে, ফুল ফল পাহাড় পর্ব্বত সরিৎ সরোবরও সেই অসীম প্রাণ সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। অন্য সাহিত্যে সমুদ্রে প্রাণ নাই। প্রাণ বলিয়া একটা ছোটখাট মাপা-জোঁকা ঘেরাঘোরা জিনিষ আছে। তাহা মানুষের এক-চেটিয়া, ফুল ফল বৃক্ষ লতা সরিৎ সরোবর পাহাড় পর্ব্বতের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। হিন্দু সাহিত্য এবং অপর সাহিত্যের মধ্যে জড় জগৎ লইয়া এই যে আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখিতে পাই, ইহা হিন্দুর সোঽহংবাদ মূলক মৈত্রীবাদের ফল। ব্রহ্মভক্ত হিন্দু সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মপদার্থে নির্ম্মিত জানিয়া জগতে যাহা কিছু আছে সকলকেই সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাসেন। তাই হিন্দুর প্রেম বা মৈত্রী মনুষ্য মধ্যে আবদ্ধ নয়, জীবমাত্রেই প্রসারিত। কিন্তু জীবে প্রসারিত বলিয়া জীব মধ্যেও আবদ্ধ নয়। জীবজগৎকে অতিক্রম করিয়া বৃক্ষ লতা ফুল ফল সরিৎ সরোবর পাহাড় পর্ব্বতপূর্ণ জড় জগতে প্রসারিত। এইজন্য হিন্দুর কাব্যে—বাল্মীকির রামায়ণে, ব্যাসের ভারতে,

কালিদাসের কুমারে মেঘদূতে শকুন্তলায় রঘুবংশে, ভবভূতির চরিতে, কিরাতার্জ্জুনীয়ে, ভাগবতে, পুরাণে—জড় জগতের সমাবেশ এত বেশী এবং মূর্ত্তি এত জীবন্ত, জড়তাশূন্য, চৈতন্যময়, ভাবময়, মনোহর। আবার হিন্দুর সাহিত্য ছাড়িয়া তাহার সংসারধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রীবাদ তাহার জীবন ও চরিত্রকে কতদূর গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুজাতি বৃক্ষলতা ফল ফুলের বড়ই অনুরাগী। সকল হিন্দুর বাড়ীতেই কতকগুলি করিয়া বৃক্ষলতা সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখা যায়। ইউরোপীয়েরাও বৃক্ষলতার অনুরাগী এবং তাঁহাদের বাড়ীতেও বৃক্ষলতা সযত্নে রক্ষিত হয়। কিন্তু দুইজাতির বৃক্ষলতার প্রতি যত্ন ও অনুরাগের কারণ এক নয়। ইউরোপীয়েরা বৃক্ষলতার শোভার জন্য বৃক্ষলতার অনুরাগী; হিন্দু বৃক্ষলতা পালনীয় এবং স্নেহের পদার্থ বলিয়া বৃক্ষলতার অনুরাগী। বৃক্ষলতা জল না পাইলে শোভাহীন ও পুষ্পহীন হইয়া গৃহ প্রাঙ্গনের শোভা এবং গৃহস্থের সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া ইউরোপীয়েরা বৃক্ষলতায় জল দেয়। জল বিনা বৃক্ষলতা পাছে তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং শুকাইয়া মরিয়া যায়, এই ভাবিয়া হিন্দু নরনারী বৃক্ষলতার মূলে জল দেয়।

পাতুম্ ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাম্ স্নেহেন যা পল্লবম্॥
আদ্যে বঃ কুসুম প্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতি গৃহম্ সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

তোমাদিগকে জলপান না করাইয়া যিনি অগ্রে জলপান করিতেন না, যিনি অলঙ্কারপ্রিয় হইলেও স্নেহ বশতঃ তোমা-

দেয় পল্লব গ্রহণ করিতেন না, তোমাদের প্রথম পুষ্পোদ্‌গম সময়ে যাঁহার নিরতিশয় আনন্দ হইত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিতেছেন, তোমরা অনুজ্ঞা প্রদান কর।

অতএব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত, জল, স্থল জগতে যাহা কিছু আছে, হিন্দুর কাছে সকলই সমান, সকলই প্রীতির পাত্র। এক ব্রহ্ম-পদার্থ এই সকলেতেই আছে, অতএব হিন্দুর মতে এ সমস্তই এক ও অভিন্ন। হিন্দুর মতে মানুষ বল, পশু বল, পক্ষী বল, জল বল, স্থল বল, কেহই কেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলেই সকলের সহিত মিশ্রিত, সকলে জড়াইয়া একটি জীবন। তাই জগতে যত কিছু আছে সকলের জীবনের সহিত হিন্দুর জীবন মিশ্রিত। হিন্দুর জীবনও জগদ্ব্যাপী হৃদয়ও জগদ্ব্যাপী। হিন্দুর মৈত্রী হিন্দুকে জগদ্ব্যাপী এবং জগৎরূপী করিয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা এবং সেই সমদর্শিতার ফল স্বরূপ সর্ব্বভূতে অনুরাগ এক মাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। এবং ইহা ও দেখা গেল যে হিন্দুর জীবনে ও সমাজে এই ব্যাপক অনুরাগের নিদর্শন আছে।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা ও সর্ব্ব ভূতে অনুরাগ সম্বন্ধে একটী অতি গুরুতর কথা আছে। অতি কঠিন অতি অসাধারণ সাধনা ব্যতীত বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা লাভ করা যায় না এবং সর্ব্ব ভূতে অনুরাগও জন্মে না। সকলই সমান, একথা মুখে বলিলেই বা যুক্তি দ্বারা বুঝিলেই সকলকে সমান বলিয়া

অনুভব বা উপলব্ধি করা যায় না। বুঝা এক জিনিষ, অনুভব বা উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কিন্তু সর্ব্বভূতকে সমান অনুভব করিতে পারিবার জন্য যে সাধনা আবশ্যক তাহা বড়ই কঠিন, বড়ই অসাধারণ। লয়ের নিমিত্ত এবং অনন্ত ঈশ্বরের অনন্তত্বের উপলব্ধির নিমিত্ত যে সাধনা আবশ্যক ইহার নিমিত্ত ও প্রায় সেই সাধনা আবশ্যক। যে সেইরূপ সাধনা করিয়াছে সেই সর্ব্ব ভূতকে সমান অনুভব করে, আর কেহই করে না ও করিতে পারে না। আর কেহ যদি বলেন, আমি করি বা করিতে পারি, তবে বুঝিতেই হইবে যে অনুভব করা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। এই জন্যই বোধ হয় যে আজি কালি যথায় তথায় যে সর্ব্বব্যাপী সাম্য ও প্রীতির কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল মুখের কথা। যে সাধনা না করিলে সর্ব্বব্যাপী সমদর্শিতা জন্মিতে পারে না যাঁহাদের মুখে সর্ব্বব্যাপী সাম্য ও প্রীতির কথা শুনা যায় তাঁহারা যে সেই সাধনা করিয়াছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারা যায় যে তাঁহাদের সর্ব্বব্যাপী সাম্য ও প্রীতির কথা মুখের কথা মাত্র, আজি কালি কি এদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই কথায় কাব্যে উপন্যাসে সমালোচনায় সংবাদ পত্রে যে একটা ফাঁপা ও ফাঁপান বাগাড়ম্বর বাড়িয়া উঠিতেছে এ কথা তাহারই লক্ষণ বা নিদর্শন বৈ আর কিছুই নয়। ঈশ্বর-পরায়ণতা বা ব্রহ্মপরায়ণতা ভিন্ন সমদর্শিতা বা সর্ব্বভূতে প্রীতি একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কি ইউরোপে কি এদেশে আজি কালি সর্ব্বত্রই ঈশ্বরপরায়ণতা কমিতেছে, পার্থিবতা বাড়িতেছে, ধর্ম্ম সাধনা কমিতেছে, ধন সাধনা বাড়িতেছে। তবে

কেমন করিয়া বলা যায় যে এই যে সব সমদর্শিতা ও প্রীতির কথা এখন শুনা যাইতেছে ইহা প্রকৃত কথা, অন্তরের কথা? ইউরোপের মধ্যকালে (Middle age-এ) লোকের যেরূপ ধর্ম্মপ্রিয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতা ছিল এখন সেরূপ নাই। কিন্তু এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যে সাম্য ও প্রেমের কথার যে রকম ছড়াছড়ি ও আড়ম্বর আস্ফালন দেখিতে পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের ইউরোপীয় সাহিত্যে সে রকম কিছুই নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এখনকার এই সব সাম্য ও প্রেমের কথা নিতান্তই ভূয়া কথা। যে বিরাট সাধনা ব্যতীত সর্ব্বভূতকে সমান অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব সে সাধনা যেখানে নাই সেখানে যদি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও অনুরাগের কথা শুনাযায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হয় যে সে কথা অন্তরাত্মার কথা নয়। কোন্ স্থানের কথা এস্থলে তাহার বিচার নিষ্প্রোয়জন।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাধারণ হিন্দুর জীবনে ও সমাজে বিশ্বব্যাপী অনুরাগ বা মৈত্রীর নিদর্শন আছে। কিন্তু যে সাধনায় সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি জন্মে সাধারণ হিন্দুর ত সে সাধনা নাই। তবে কেমন করিয়া সাধারণ হিন্দুর জীবনে ও সমাজে সর্ব্বভূতে অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায়? এ কথার উত্তর এই যে সাধারণ হিন্দুর সাধনাও এত অধিক নয় এবং চিত্তের শুদ্ধিও এত বেশী নয় যে আত্মপর ভেদ বিনষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও সমদৃষ্টি জনিত অনুরাগ হইতে পারে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বভূতে প্রীতিপরায়ণ শাস্ত্রকারেরা ইহা বুঝিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে সাধারণ বা

প্রাকৃত মনুষ্যকেও ক্রমে ক্রমে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অতএব তাহাকে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বব্যাপী সমদর্শিতা ও প্রীতি লাভ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যকে ঘর সংসার লইয়া থাকিতেই হইবে। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বব্যাপী সমদর্শিতা ও প্রীতিকে সাধারণ মনুষ্যের পালনীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্বরূপ করিয়া দিলেন। এই ভাবিয়া করিয়া দিলেন যে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে আচার পালন তত কঠিন নয়, কিন্তু নিত্য আচার পালন করিতে হইলে আচার পালনের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তাঁহার মনে সর্ব্বভূতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ সমদর্শিতা ও প্রীতি জন্মিবে। এই প্রণালীতে সর্ব্বভূতে যে পরিমাণ সমদর্শিতা ও প্রীতি জন্মিতে পারে তাহা খুব বেশী নয় সত্য। কিন্তু যেখানে এ প্রণালী নাই সেখানে সর্ব্বভূতে যে পরিমাণ সমদর্শিতা ও প্রীতি জন্মিতে পারে এ পরিমাণ যে তদপেক্ষা অনেক বেশী সে বিষয়েও কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আচারে অনাদর হইলে মানুষের যথার্থই এত অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রোড়পত্র।

[বিবাহ]

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। মুক্তিলাভের অর্থ মায়া মোহ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় ও আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন। সেই স্বরূপ দর্শনেই পর-মাত্মা দর্শন হয়। মানুষ যত দিন বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কাম-ক্রোধাদির বশবর্ত্তী থাকে এবং হৃদয়ে বিষয় বাসনা, ভোগবাসনা প্রভৃতি বাসনা ও কামনা পোষণ করে, তত দিন তাহার আত্মা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তত দিন তাহার আত্মার স্বাধীনতা থাকে না, তত দিন তাহার আত্মাকে সে দেখিতে পায় না। মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া, সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত সাংসারিক মায়া খণ্ডন করিয়া আত্মার মায়াময় আবরণ উন্মোচন করিলে পর তবে আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় এবং স্বরূপ আত্মায় পরমাত্মা দর্শন করিয়া মুক্তি লাভ করে। অতএব মানুষের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি, সেই মুক্তি লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক। আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করার অর্থ আত্মার যে মায়াময় আবরণ আছে তাহা বিনষ্ট করা। আত্মার এই যে মায়াময় আবরণ ইহার উৎপত্তি মানুষের জড় প্রকৃতিতে। মানুষ যে কামক্রোধাদি রিপু কর্ত্তৃক তাড়িত হয় এবং ভোগবাসনা প্রভৃতির বশীভূত হয় তাহার কারণ এই যে

মানুষ কেবল মাত্র চিন্ময় আত্মা নয়, মানুষে জড় প্রকৃতিও আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জড় দেহও আছে। অতএব মুক্তি-লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জড়প্রকৃতি দমন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্যের জড় প্রকৃতি বড়ই প্রবল। মনুষ্যের পার্থিব বাসনা বড়ই বেগবতী। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি বড়ই দুর্দ্দমনীয়। এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। প্রতিনিয়ত স্বার্থত্যাগ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং সংযম ব্যতীত এ হেন জড়প্রকৃতি জয় করা অসম্ভব। এক দিন দুই দিন কি এক মাস দুই মাস স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা সংযমে এ হেন জড়প্রকৃতি জয় করা যায় না। সমস্ত জীবন, হয় ত জন্ম জন্মান্তর, স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সংযম সাধন করিলে তবে এ হেন জড়প্রকৃতি জয় করিতে পারা যায়। এই জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হিন্দুকে প্রতিদিন সংযত হইয়া দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথিসেবা, ভূতপালন প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই যাগ যজ্ঞ ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, ভোগস্পৃহা পরিহার আবশ্যক। সংযমাদি ব্যতীত এই সকল কর্ম্ম করা যায় না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা বলিকর্ম্ম শেষ করিয়া যজ্ঞের যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সস্ত্রীক ভোজন করিবে। অর্থাৎ দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথি-সেবা, পশু, পক্ষী, কৃমী, কীট প্রভৃতির জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা ঐ সকলের বলি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহের সমস্ত ব্যক্তি এবং ভৃত্যাদিকে পর্য্যন্ত ভোজন

করাইয়া সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন সস্ত্রীক ভোজন করিবে। না করিলে সস্ত্রীক মহাপাপে লিপ্ত হইবে। হিন্দুর নিত্য কর্ম্মে স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ভোগস্পৃহা পরিহার এবং সংযম কত আবশ্যক, তাহা এই একটি মাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহাকে এইরূপ বিধানানুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাঁহার বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সুকোমল শয্যায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া চলে না, শয্যাত্যাগ করিয়া দুগ্ধ শর্করা-মিশ্রিত সুগন্ধ চার পিয়ালা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ পক্ষীডিম্ব উদরস্থ করা চলে না, সকলের অগ্রে স্বয়ং বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করা চলে না। এবং এই সকল নিত্য কর্ম্ম করিতে নিয়তই কত যে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার এই সকল নিত্য কর্ম্ম করিবার জন্য সংযমাদি যেমন আবশ্যক, এই সকল নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে সংযমাদি করিবার শক্তিও তেমনি বাড়িতে থাকে। কারণ অভ্যাসে সকল শক্তিই বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে। বিশেষ বিশেষ ব্রত, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ পূজা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অন্তর্গত। নিত্য কর্ম্মের ন্যায় নৈমিত্তিক কর্ম্মেও সংযমাদি আবশ্যক। অতএব নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রকার কর্ম্মের দ্বারাই সংযমাদি করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড়প্রকৃতি পরাস্ত হইয়া আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ মানুষ আপনার আত্মাকে চিনিতে পারে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বেদান্ত

সূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষড়বিংশ সূত্র—'সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ”—ইহার ভাষ্যে বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আশ্রম কর্ম্মের (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যে কর্ম্ম করা যায় সেই কর্ম্মের অপেক্ষা (অর্থাৎ আবশ্যকতা) আছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসায় স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন “উৎপন্নাহি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ অপেক্ষতে উৎপত্তিং প্রতি ত্বপেক্ষতে”, অর্থাৎ বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর ফলসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির প্রতি অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, কিন্তু নিজের উৎপত্তির প্রতি অপেক্ষা করে।:কি অপেক্ষা করে? না, যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম। “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইত্যাদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ-বচন দ্বারা বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যক তাহা প্রমাণ হয়। ইহার তাৎ-পর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যক তাহা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আর কিছুই আব-শ্যক হয় না। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি আইসে সেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পক্ষে দান, পূজা, যাগ, যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম আবশ্যক। অর্থাৎ আশ্রম কর্ম্ম না করিলে তত্ত্বজ্ঞান উৎ-পন্ন হয় না। সাংখ্যকারেরও এই মত। সাংখ্য প্রবচনের তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূত্র—

'নিয়তকারণত্বাৎ ন সমুচ্চয় বিকল্পৌ”

ইহার ভাষ্যে পরমজ্ঞানী বিজ্ঞানভিক্ষু কহিয়াছেন, “কর্ম্মণো ন সাক্ষাত মোক্ষ হেতুত্ব সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রুতিস্ত্বঙ্গাঙ্গিভাবাদি-

ভিরভ্যুপ পদ্যতে," অর্থাৎ কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু নয়, কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে কর্ম্ম যে মোক্ষের হেতু ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তদ্দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয় বটে কিন্তু মুক্তির পক্ষে অন্তরায় বা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু একটি কথা আছে। মানুষ যখন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তখন ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করে সত্য। কিন্তু কর্ম্মের জন্য যে সংযম স্বার্থত্যাগ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি আবশ্যক যত্ন ও একাগ্রতা সহকারে তাহা অভ্যাস করিতে থাকিলে, জড়প্রকৃতি হীনবল হইয়া আত্মা যত ফুটিতে থাকে কর্ম্মীর ফলকামনা তত কমিয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম অবশেষে নিষ্কাম হইয়া পড়ে। বালক যখন প্রথম পাঠারম্ভ করে তখন তাহাকে পুরস্কার ভাল কাপড় এবং মিষ্টান্নাদির লোভ দেখাইয়া পড়াইতে হয়। কিন্তু মিষ্টান্নাদির লোভে পড়িতে পড়িতে বালকের ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুরাগ জন্মে এবং তখন সে পুরস্কারাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র বিদ্যানুরাগ বলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকে। মানুষও সেইরূপ ফললোভে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্মের জন্য সংযমাদি সাধন করিয়া ক্রমে জড়প্রকৃতি পরাজয় করত কামনাশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকে। এবং কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে মুক্তিলাভ হয়। যোগ-সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ সূত্র—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা'—এই সূত্রে ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট উপাস্য দ্বারা অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারাও মুক্তি হয়।

অন্যান্য দর্শনেরও এই কথা। এক্ষণে বোধ হয় বলিতে পারি যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি, তাহা লাভ করিবার জন্য আশ্রম-কর্ম্ম অপরিহার্য্য, অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তিলাভ বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারার্থ যে আশ্রমকর্ম্ম এতই আবশ্যক সেই আশ্রমকর্ম্ম বিবাহ ব্যতীত অর্থাৎ সস্ত্রীক না হইয়া সম্পাদন করা যায় না। মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানাঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ (৩—৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

বৈবাহিক অগ্নি ভিন্ন গৃহস্থের দৈনিক হোমকার্য্য এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি হয় না বলিয়া মনু আর একস্থলে বলিয়াছেন—

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বমৃতা ভার্য্যার দাহকর্ম্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্ব্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নি গ্রহণ করিবেন।

হোম এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মার মঙ্গল, মানবের পারত্রিক সদগতি। অতএব রবীন্দ্র বাবু যে বলেন, ‘এখানে সংসার-ধর্ম্মের প্রতিই মনুর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে’ তাহা ঠিক নয়।

মহামুণি কশ্যপ বলেন *—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক ১৭২ পৃষ্ঠা।

'গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।

গোভিল গৃহ্যসূত্রের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ কাণ্ডের অষ্টাদশ সূত্র—"ইতি গৃহমেধি ব্রতম্"—ইহার ভাষ্যে কথিত হইয়াছে—"ইত্যেবমহরহঃ পঞ্চানাং মহাযজ্ঞানামনুষ্ঠানম্ গৃহমেধিব্রতম্, গৃহে যযোর্মেধো যজ্ঞোভবতি, তাবিমৌ গৃহমেধিনৌ দম্পতী—ইতি ক্রমঃ। তয়োগৃহমেধিনোর্দম্পত্যো ব্রতং শাস্ত্রবিহিতো-নিয়ম ইত্যর্থঃ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন দ্বারা মুক্তিলাভার্থ যে আশ্রমকর্ম্ম আবশ্যক সস্ত্রীক না হইয়া তাহা সম্পন্ন করা যায় না। অতএব এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক; সাংসারিক বা পার্থিব নয়। রবীন্দ্র বাবু বলেন যে "হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।" কিন্তু দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যও মুক্তিসাধন। অতএব রবীন্দ্র বাবু আধ্যাত্মিক শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থে হিন্দুবিবাহ এবং গৃহস্থাশ্রমও আধ্যাত্মিক। ফল কথা, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুর জীবন যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, সেই চারিটি আশ্রমই মুক্তির পথের চারিটি অগ্রপশ্চাৎ সোপান মাত্র। সেই চারিটি সোপান পরস্পর সংলগ্ন। তন্মধ্যে কোন-

টিকে অপর গুলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে হানি পড়িয়া যায়। জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্য হিন্দু পঠদ্দশায়ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচারী। অতএব হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকে হিন্দুর বানপ্রস্থ হইতে পৃথক করিবার যো নাই। অর্থাৎ হিন্দুর বানপ্রস্থকে যদি আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে তাহা হইলে হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকেও আধ্যাত্মিক বলিতে হয়*। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক আর কাহারো বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়। খৃষ্টানের বাইবেল বল, মুসলমানের কোরাণ বল, ব্রাহ্মের সহজ জ্ঞান বল, কিছুতেই এমন কথা বলে না যে সস্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার যো নাই। খৃষ্টান স্ত্রী লইয়া গির্জ্জায় এবং ব্রাহ্ম স্ত্রী লইয়া সমাজমন্দিরে যান বটে, কিন্তু সেটা তাঁহাদের স্বেচ্ছামাত্র। এ সকল ধর্ম্মকর্ম্ম সস্ত্রীক না করিলেও তাঁহাদের

---

* যাগযজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম দ্বারা মুক্তির পথে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় এ কথা অস্বীকার করিলেও ঐ কর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি ফললাভ হয় ইহা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু স্বর্গাদি ফল ইহলোকে লাভ হয় না, পরলোকে হয়। অতএব হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক কি না এ কথার তর্ক ছাড়িয়া দিলেও উহার উদ্দেশ্য যে পারলৌকিক বটে, সাংসারিক বা পার্থিব নয়, ইহাই উহার উদ্দেশ্যগত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ যথেষ্ট। কারণ হিন্দু ভিন্ন আর কেহ এমন কথাও বলেন না যে পারলৌকিক মঙ্গলার্থ স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সূত্রে মিলন অপরিহার্য্য। একমাত্র হিন্দুর এই মত ও বিশ্বাস বলিয়া ভারতমহিলা নামক গ্রন্থে হিন্দু বিবাহের কথায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। এরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই"।

ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাৎ বা হানি হয় না। কিন্তু সস্ত্রীক না হইয়া হিন্দুর ধর্ম্মচর্য্যা একেবারেই হয় না। এবং সেই জন্য সীতা যখন বনে তখন রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে সীতার স্বর্ণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল, নতুবা তাঁহার যজ্ঞ হইত না। এবং সেই জন্যই এখনো যেখানে হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে লোপ হয় নাই সেখানে পতিপত্নীকে একত্রে দীক্ষিত হইতে, একত্রে উপবাস করিতে, একত্রে বারব্রত করিতে, একত্রে যাগযজ্ঞ করিতে, একত্রে তীর্থ দর্শন করিতে দেখা যায়। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুর বিবাহ প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক, অপরে আপন আপন বিবাহ আধ্যাত্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহাদের বিবাহ কথায় আধ্যাত্মিক কাজে নয়। মানব জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি সেই মুক্তি লাভ সম্বন্ধে হিন্দু-পুরুষ এবং হিন্দুস্ত্রী দুই জনে এক জন—হিন্দু-পুরুষ ব্যতীত হিন্দু-স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই, অতএব কর্ম্মও নাই, পারত্রিক গতিও নাই, এবং হিন্দু-স্ত্রী ব্যতীত হিন্দু-পুরুষেরও ব্যক্তিত্ব নাই, অতএব কর্ম্মও নাই, পারত্রিক গতিও নাই। হিন্দু-পুরুষ ও হিন্দু-স্ত্রী পরস্পরের অংশ, পরস্পরের উপাদান, পরস্পরের ধর্ম্মশরীরের অঙ্গাঙ্গ, পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের জীবনী-শক্তি, পরস্পরের মুক্তির কারণ। দেহের জীবন সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডের সহিত শ্বাসযন্ত্রের এবং শ্বাসযন্ত্রের সহিত হৃৎপিণ্ডের যে রকম সম্বন্ধ, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হিন্দু-পুরুষের সহিত হিন্দু-স্ত্রীর এবং হিন্দু-স্ত্রীর সহিত হিন্দু পুরুষের সেই রকম সম্বন্ধ। ইংরাজ বল, ফরাসি বল, খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্ম বল, আর কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের

মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ এমনি অঙ্গাঙ্গভাবের অর্থাৎ organic, constitutional এবং functional রকমের নয়।

হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে এ রকম অঙ্গাঙ্গভাবের সম্বন্ধ নিরূপিত হইবার একটি মাত্র কারণ অতি সংক্ষেপে এ স্থলে নির্দ্দেশ করিব। সমস্ত জগৎ দুই ভাগে বিভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়—এক ভাগ পুরুষ আর এক ভাগ স্ত্রী। এই দুই ভাগ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়—পরস্পরের অধীন বা সাপেক্ষ। দুইয়ের সংযোগ ও সম্মিলন ব্যতিত কাহারই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। অতএব পুরুষ বল, স্ত্রী বল কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়—দুইয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণ অর্থাৎ পুরুষ নিজেও ১ নয়, স্ত্রী নিজেও ১ নয়, পুরুষ ও স্ত্রী সংযুক্ত হইয়া ১। এইজন্য পুংজগৎ ও স্ত্রী-জগৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে এমন কথা কোন দর্শনে, বিজ্ঞানে বা শাস্ত্রে বলে না। পুং-জগৎ এবং স্ত্রী-জগৎ দুইয়ে মিলিয়া একটি জগৎ এই কথাই সকলে বলে। এ কথা না বলিলেও চলে না। পুং-জগৎ এবং স্ত্রী-জগৎ দুই জগৎই সেই এক পরম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অতএব পুং-জগৎ ও স্ত্রী-জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ নয়, কারণ দুই একে থাকে না এবং এক হইতে যাহা যাহা উদ্ভূত হয় তাহা সেই একের অধিক হইতে পারে না—সমস্ত সেই একের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশ মাত্র। অতএব সকলে মিলিয়া এক। এই জন্য নরনারী সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বলে যে "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর সেই দুই শরীর আবার এক হইয়া যায়"। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ যদি একের পরস্পর সাপেক্ষ অংশ হইল, তবে সে

সাপেক্ষতাও আংশিক হইতে পারে না, উভয়ের যতদূর বিস্তার সে সাপেক্ষতাও ততদূর হইবে। উদ্ভিদের জনন ক্রিয়া পর্য্যন্ত আছে। অতএব জননক্রিয়া পর্য্যন্ত পুং উদ্ভিদ এবং স্ত্রী উদ্ভিদ পরস্পরের সাপেক্ষ দেখা যায়। পশু পক্ষীর জনন স্পৃহা ছাড়া অপত্য স্নেহ পর্য্যন্ত আছে। তাই পশু পক্ষীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যোগ বা সাপেক্ষতা কেবলমাত্র জনন ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত না হইয়া অনেকস্থলে অপত্যপালন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। মানুষের ধর্ম্মবৃত্তি পর্য্যন্ত আছে। অতএব পুং মানুষ ও স্ত্রী মানুষ ধর্ম্মচর্য্যা পর্য্যন্ত পরস্পরের সাপেক্ষ না হইলে চলিবে কেন? এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ দ্বারা এক না হইলে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যায় যে কথা বলে হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মে আচারঅনুষ্ঠানে সেই কথারই প্রয়োগ ও স্বার্থকতা থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় এবং আচার অনুষ্ঠানে এমন মিল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মিল হিন্দু এবং অপরাপর জাতির মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদের কারণ। এবং সেই জন্য অপরাপর জাতি হিন্দুকে বুঝিতে পারে না।

সস্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা হয় না হিন্দু শাস্ত্রের এই বিধানের মর্ম্ম এখন বোধ হয় কতক বুঝা গেল। ইহার মর্ম্ম এই যে মানব জীবনের এত বড় উদ্দেশ্য যে মুক্তি তাহা লাভ করিতে হইলে স্ত্রী ভিন্ন গতি নাই। অতএব এখন নির্ভয়ে বলিতে পারি যে পুরুষ সম্বন্ধে স্ত্রীর পদ হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যেমন সম্মানের ও গৌরবের কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কাহারো মধ্যে তেমন নয়। হিন্দু কেবল etiquette দুরস্ত নয়। তাই আজ স্ত্রীর জন্য হিন্দুকে এত কথা শুনিতে হইতেছে।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। প্রথম—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়—হিন্দু বিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন কিছু কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই কথা বলি যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হইলেও ঐ বিবাহের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না এরূপ অনুমান করা অন্যায়। মৃত মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তিনি বিদ্যা-লোচনা ভিন্ন আর কোন কাজই করেন নাই, আহারও করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই, সংসারধর্ম্মও করেন নাই। অথবা বিদ্যালোচনা ছাড়া তিনি আহার বিহার ও সংসারধর্ম্ম করিয়া ছিলেন বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে বিদ্যালাচনা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। অথচ সেই শাস্ত্রেই পতিপত্নীর পর-স্পরের মনোরঞ্জন করিবার এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা আছে। এরূপ ব্যবস্থার দোষ বা অসঙ্গতি কি বুঝিতে পারি না। উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যায় না, এ কথার কোন অর্থই নাই। তবে যেখানে উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য থাকে সেখানে যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হয় এমন করিয়া নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য

সাধন করা উচিত নয়। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীগমন সন্তানোৎপাদন বেশ ভূষা প্রভৃতি বিষয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই আছে। তবে আর হিন্দু বিবাহের অনাধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাবৃদ্ধি করণাদি বিষয়ক ব্যবস্থা ধরিয়া টানাটানি করা কেন?

আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন এই মাত্র দেখা আবশ্যক যে আমাদের বিবাহ-প্রক্রিয়া দ্বারা পতি পত্নীর একত্ব সম্পাদিত হয় কি না। আমাদের বিবাহের অনেক মন্ত্রের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর একত্ব-সাধন, এ কথা আমি পূর্ব্বে বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব এ স্থলে সে সকল মন্ত্রের পুনরুল্লেখ করিব না। কেবল একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিব :—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্—" প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে যোড়া লাগিয়া এক হউক। ইহা যদি একীকরণ না হয়, তবে জানি না কি করিয়া একীকরণ হইতে পারে। অতএব হিন্দু বিবাহ-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে পতিপত্নীর একীকরণ এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। তুমি বলিবে পতি-পত্নীর একীকরণই যদি হিন্দুবিবাহপ্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য হয়, তবে আবার হিন্দুর মধ্যে বহুবিবাহ হয় কেমন করিয়া? কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝা বড় কঠিন নয়। সর্ব্বপ্রথমে লোকাচার শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র বিধি-বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অনেক লোকাচার উৎপন্ন হয়। সে উৎপত্তির নানা কারণ থাকে। সেইরূপ কোন কারণে এ দেশে

পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই এক সময়ে বহুবিবাহ করিত। ক্রমে সমাজে ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে পর স্ত্রীর বহুবিবাহ বন্ধ হয়। পুরুষের বহুবিবাহ এখনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু পুরুষের বহু-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত নয়, পূজ্যপাদ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে পরিষ্কার প্রমাণ করি-য়াছেন। শাস্ত্রানুসারে কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণে পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" রবীন্দ্রবাবু কেবল এই কয়টি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করাই হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ কয়টি শব্দের পরেই "পুত্র পিণ্ড প্রয়ো-জনঃ" আরো এই যে কয়টি শব্দ আছে রবীন্দ্র বাবু তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। কান টানিলে মাথা আসে—চির কাল এই কথা শুনা আছে, এবং কথাটা সত্য কি না, কান টানিয়া দেখাও গিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু তিন চারি বার একটা শ্লোকের কান ধরিয়া টানিয়াছেন, কিন্তু একবারও শ্লোকের মাথাটা আসে নাই। মাথাটা আসিলেই জানা যাইত যে, পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ পুত্রোৎপাদনের জন্য পত্নী আবশ্যক। এবং সেই জন্য শাস্ত্রে প্রথম পুত্রকেই পুত্র বলে, অন্যান্য পুত্রকে কামজ পুত্র বলিয়া নিন্দা করে। অতএব পুত্রার্থে যে দারান্তরের ব্যবস্থা আছে তাহারও উদ্দেশ্য পার-লৌকিক, পার্থিব নয়। কিন্তু বোধ হয় যে, এ ব্যবস্থা সত্বেও অনেকে দারান্তর পরিগ্রহ না করিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের উপায় বিধান করিয়া থাকেন। এবং হিন্দুর রাজশক্তি বিনষ্ট না হইলে বোধ হয় কালে দত্তক গ্রহ-

ণের নিয়ম বেশী প্রচলিত হইয়া দারান্তর পরিগ্রহের প্রথা বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া যাইত। এরূপ বিবেচনা করিবার পক্ষে একটি প্রধান কারণ এই যে,কোন ব্যক্তি অপুত্রক মরিলে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তাহার বিধবা পত্নীর গর্ভে নিয়োগ ক্রমে অন্যের দ্বারা পুত্র সন্তান উৎপন্ন করিবার এক সময়ে যে বিধি ছিল তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে, এবং বিবাহের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ পূর্ব্বে যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন সমাজে অনেক রকম লোকাচার থাকে। সে সকল লোকাচারের মধ্যে সকলগুলিই যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা নয়। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সে গুলি শীঘ্র লোপ হয় না। এবং হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও বিশিষ্ট কারণে লোকাচারের প্রতি কিঞ্চিৎ আস্থাবান বলিয়া তাহা শীঘ্র রহিত করিতে ইচ্ছুক নহেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বহুবিবাহ ক্রমে যে পঞ্চীকরণ ষড়ীকরণ ঘটিয়া থাকে তদ্দ্বারা একীকরণ অপ্রমাণীকৃত হয় না।

হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব নয়, পারলৌকিকও বটে। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে বিবাহ দ্বারা পতি পত্নীর যে সংযোগ সম্পাদিত হয় তাহা পরলোকেও থাকে, ইহলোকে শেষ হয় না। রবীন্দ্র বাবু বলেন, এইটি শাস্ত্রকারদিগের ভুল। কেন না, তাঁহাদেরই কর্ম্মফলবাদের অর্থ এই যে, ইহলোকে যে যে রকম কর্ম্ম করিবে সেই কর্ম্মের ফল স্বরূপ পরলোকে সে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অতএব পতি পত্নী আপন আপন কর্ম্মের ফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া

দাম্পত্য-যোগ হইতে স্খলিত হইবারই কথা। তবেই কর্ম্মফল-বাদ মানিতে হইলে পতি পত্নীর যোগ পরলোকে থাকিতে পারে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে একীকরণ বিবাহের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর যদি যথার্থই সেই একীকরণ হয়, অর্থাৎ পতি পত্নীর যদি এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক রুচি, এক প্রবৃত্তি, এক কর্ম্ম, এক ধর্ম্ম হয় তবে ত কর্ম্মফলবাদানুসারেই তাহারা পরলোকে এক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সেই পতিপত্নী রূপেই থাকিবে। এবং সেই জন্যই ত মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে, যে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অনুগামিনী হন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সেই স্বামীলোকেই গমন করেন। কর্ম্মফলবাদ বিবাহের পারলৌকিকত্ব নাশ করে না, দৃঢ় করে। বিবাহের পারলৌকিকত্ব কর্ম্মফলবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল।

সীতা নাকি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—'পরলোকে যেন তোমারই মতন পতি পাই।' রবীন্দ্র বাবু বলেন যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকব্যাপী হইলে, সীতা 'তোমার মতন পতি পাই' এ কথা না বলিয়া 'তোমাকেই পতি পাই', এই কথা বলিতেন। অতএব হিন্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ যে পরলোকব্যাপী নয়, সীতার এই কথাটাও তাহার একটা প্রমাণ। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি সীতার কথা, এই হিসাবে বিবেচনা করিলে—'তোমার মতন পতি পাই'—এ কথার 'তোমাকেই পতি পাই' ইহা ভিন্ন আর কি অর্থ হইতে পারে? রামচন্দ্র ভিন্ন রামচন্দ্রের মতন আর কে হইতে পারে? সাধ্বী স্ত্রী মাত্রই আপন আপন পতিকে অতুল-নীয় মনে করেন। অতএব সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিকে বলেন যে পর

লোকে যেন তোমার মতন পতি পাই, তাহার অর্থই এই হয় যে, পরলোকে যেন তোমাকেই পতি পাই। আবার ভাবার্থ বিবেচনা করিলেও সীতার কথার সেই অর্থই হয়। তোমার মতন লোকের এ রকম কাজটা করা ভাল হয় নাই, এই কথা 'তোমার এ রকম কাজটা করা ভাল হয় নাই' ইহাই বুঝায়। সম্মানবর্দ্ধনার্থ শুধু 'তোমার' না বলিয়া 'তোমার মতন লোকের' বলা যায়। অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখ, সীতার কথার অর্থ এই যে হিন্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকব্যাপী, ইহলোক সম্বদ্ধ নয়।

আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দুবিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ। হিন্দুবিবাহপ্রক্রিয়া দ্বারা হিন্দু পত্নীকে অতি পবিত্র ও পূজ্য পদার্থ করা হয়, এ কথা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে, বঙ্গের স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যানুসারে আমাদের বিবাহ-প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে, সপ্তপদী গমন, বৈবাহিক হোম প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়ার গুণে হিন্দু স্ত্রী আহবনীয় ও যজ্ঞের যূপ কাষ্ঠের ন্যায় অলৌকিক পদার্থ হইয়া থাকেন। অলৌকিক শব্দের অর্থ মানবধর্ম্মাক্রান্ত নয়, মানবধর্ম্মের অতীত যে দেবধর্ম্ম সেই দেবধর্ম্মাক্রান্ত। অতএব হিন্দু পত্নী অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক পদার্থ বলিলে সাদা কথায় এই বুঝায় যে হিন্দুপত্নী দেবতা।

ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

গৃহে স্ত্রীতে ও শ্রীতে অর্থাৎ লক্ষ্মীতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই

সতী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—'যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেই খানে সেই খানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই,আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।' এবং পাপচারিণী ভিন্ন স্ত্রীলোক মাত্রেরই সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, 'হোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদগণ সর্ব্ব প্রকারে পবিত্র হইল।' সংস্কৃত পুরাণ স্মৃত্যাদির কত স্থানে যে এই রকম উক্তি আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ফল কথা, হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে হিন্দু স্ত্রী যথার্থই অতি পবিত্র দেবতা। এবং আমরা আজ এত যে হীন হইয়াছি, আমাদের মধ্যে এখনও সেই সংস্কার বর্ত্তমান আছে। কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে—শুধু আপন পত্নীকে নয়, যে কোন এবং যত অধম স্ত্রী হউক না কেন—তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিলে, অতি মূর্খ নিম্নজাতীয় হিন্দুও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করে—'আহা, কর কি, কর কি, স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলিতে নাই।' যে দেশে আজিও আপামর সাধারণের মুখে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় সে দেশের শাস্ত্রানুসারে এবং প্রকৃত জ্ঞানীগণের মতে স্ত্রী যথার্থই দেবতা এ কথা না মানিয়া কেমন করিয়া থাকা যায়? ফলতঃ যে দেশে সীতা স্বয়ং কমলাপতির কমলা বলিয়া পূজিতা, সাবিত্রী সৌভাগ্য-

রূপিণী ব্রতাধিষ্ঠিতা ব্রতফলদায়িনী দেবী বলিয়া অর্চ্চিতা, যে দেশে কুমারী-পূজা ব্যতীত দেব-পূজা ও দেব-দর্শন সিদ্ধ হয় না, যে দেশে মঙ্গল-ঘট কক্ষে লইয়া সতী স্ত্রী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মহাশক্তিকে আহ্বান না করিলে স্বয়ং মহাশক্তির গৃহ প্রবেশ হয় না, সে দেশে স্ত্রীলোক পবিত্র পূজনীয়া ও দেবী-পদারূঢ়া নন, জানিয়া শুনিয়া এ কথা বলিলে বোধ হয় অধর্ম্মের সঞ্চার হয়।

মোক্ষ সাধনরূপ জীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ দেখা দিয়াছে, তদ্দারাই বুঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রী বড়ই আদরের, বড়ই গৌরবের সামগ্রী। স্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ঘৃণা বা অবজ্ঞার জিনিষ হইলে তাঁহারা কখনই স্ত্রীকে পুরুষের মোক্ষসাধনের সহকারিণী করিতেন না—কখনই স্ত্রীকে অত উচ্চ পদে ও উচ্চ কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। স্ত্রীকে বাসন মাজা সকড়ি লওয়া প্রভৃতি দাস্য-বৃত্তির অধিক অধিকার দিতেন না। কিন্তু যে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের এত আদর ও গৌরব সেই শাস্ত্রে স্ত্রালোকের নিন্দাও ত আছে। থাকিবে না এমন কোন কথাই নাই। স্ত্রীলোকের রূপমোহে ও মাধুর্য্যকুহকে অনেক সংযমীর সংযম নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীলোকের যে সকল নিন্দাবাদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'ভারতমহিলা' নামক অতি সুন্দর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 'এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করি-

তেন।' স্ত্রী নিন্দার অন্য কারণও ছিল। স্ত্রী পূজনীয়া হইলেও স্ত্রীলোকের মধ্যে যে অনেক নীচ বা দুষ্ট স্বভাবসম্পন্না আছে তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ দোষান্বেষী নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বভাব তাহারা কোন জিনিষের ভাল ভাগটা দেখে না, মন্দ ভাগটা দেখিয়া জিনিষটা একেবারেই মন্দ বলিয়া বর্ণনা করে। এবং সে রকম লোকে দুই চারি জন দুষ্টা স্ত্রী দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে। প্রাচীন ভারতেও সে প্রকৃতির লোক ছিল। এবং তাহারাই স্ত্রীলোকের নিন্দা করিয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদের স্ত্রীনিন্দার উল্লেখ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা বোধ হয় বড় একটা ন্যায্য কাজ নয়। যাঁহারা বিলাতি সভ্যতার পক্ষপাতী তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ইংরাজদির মধ্যে স্ত্রীলোকের খুব বেশী সম্মান। কিন্তু কোন কোন ইংরাজকে এমন কথা বলিতে শুনিয়াছি যে ইউরোপীয় স্ত্রী সমাজে ব্যভিচার বড়ই প্রবল। ইংরাজদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মুখে অসম্মানের কথা কহিলে কোন দোষ হয় না, পুস্তকাদিতে লিখিলে বড়ই দোষ হয়। কিন্তু লিখিলে যদি দোষ না হইত তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইংরাজি সাহিত্যেও স্ত্রীজাতির বিষম নিন্দাবাদ দেখা যাইত। আবার ইংরাজি সাহিত্যে স্ত্রীজাতির নিন্দা যে একেবারেই দেখা যায় না তাহা নয়। পুরাতন ইংরাজি সাহিত্যে বিস্তর নিন্দা দেখা যায়। চূড়ান্ত উদাহরণ সেক্‌সপীয়রের Frailty, thy name is woman। স্ত্রীজাতির নিন্দা লেখা হইবে না বলিয়া ইদানীং ইংরাজদিগের মধ্যে প্রায় এক রকম ধর্ম্মঘট হই-

য়াছে। কিন্তু সে ধর্ম্মঘট সত্বেও এখনকার ইংরাজি সাহিত্যে স্ত্রীলোক নানা অনর্থের মূল এইরূপ অনেক স্ত্রীনিন্দা দেখা যায়। কিন্তু সে নিন্দা দেখিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ সম্মানের পদ নয়, এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীজাতির দুই চারিটি নিন্দাবাদ দেখিয়া হিন্দুর মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ নীতি অনুসারে ন্যায়সঙ্গত হয় তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি না।

পুরুষ স্বভাবতঃ স্ত্রী জাতির কিছু বশ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকে সতর্ক করিবার জন্যও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থলে স্ত্রীনিন্দা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।

ফল কথা, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অকপট সাহিত্যে সকল বিষয়ের সকল দিকই আলোচিত হইয়া থাকে—ভাল দিক, মন্দ দিক্, আধ্যাত্মিক দিক্, অনাধ্যাত্মিক দিক্, আদর্শের দিক্, আচার আচরণের দিক্, সকল দিক্ই আলোচিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ সাহিত্যের এক দিক ধরিয়া অপর দিকের অসত্যতা বা অসারতা অনুমান করা নিতান্তই ন্যায় যুক্তি ও সুনীতি বিরুদ্ধ। এরূপ সাহিত্যের সকল দিকের সামঞ্জস্য করাই ন্যায়বান্ ব্যক্তির প্রধান ও প্রকৃত কর্ত্তব্য। নহিলে বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা। কারণ তুমি যেমন স্ত্রীজাতির নিন্দাবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছ যে, শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের যে কথা আছে তাহা কোন কাজের নয়, তোমার প্রতিপক্ষও তেমনি স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারে যে, সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীজাতির যে নিন্দাবাদ

আছে তাহা কোন কাজের নয় এবং বলিলে তোমারও কথাটি কহিবার যো থাকে না।

ইংরাজের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্মানের সামগ্রী। তাই বলিয়া সকল ইংরাজই যে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করে তাহা নয়, এবং বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ এক শত কি এক সহস্র ইংরাজ স্ত্রীজাতিকে অসম্মান করিলেও ইংরাজ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি সম্মানিত এই মূল কথার বিপর্য্যয় ঘটে না। হিন্দুর মধ্যেও তেমনি যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করে, তবে তদ্দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি যে অতি পবিত্র ও পূজনীয়া এ কথার বিপর্য্যয় ঘটে না। অতএব যুক্তি শাস্ত্রানুসারে এক জন যুধিষ্ঠির একটি দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় বিক্রয় করিলেও শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে গৌরবের কথা আছে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে দ্রৌপদীকে দ্যূতে পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যখন শাস্ত্রদূষিত ধর্ম্মবিগর্হিত দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হন তখন ভারতের রাজবংশের উপর কালের কাল ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়ায় লুকাইয়া এক অতি ভীষণ নিয়তি কুরুবংশ ও পাণ্ডুবংশ এবং ভারতের অপর সমস্ত রাজন্যবর্গকে সেই করাল কুরুক্ষেত্রের দিকে টানিতেছে। নিয়তি সকল দেশে সকলকেই এক সময় না এক সময় এই রকম করিয়া টানিয়া থাকে। সেই কালের ছায়ায় ধর্ম্মপুত্রের মতিবুদ্ধি আচ্ছন্ন, সেই নিয়তির টানে ধর্ম্মপুত্র আত্মকর্তৃত্বহীন, আত্মহারা। উচ্ছন্নমতি বলিয়া, নিয়তির নিষ্ঠুর নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়া, তিনি আজ তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে দ্যূতে বিক্রয় করিতেছেন এবং আপনাকে

আপনি বিক্রয় করিতেছেন। উচ্ছন্নমতি না হইলে, নিয়তির নিতান্ত অধীন না হইলে,এ সংসারে কে আপনাকে আপনি বিক্রয় করিয়া থাকে ? মৃগ আবার কখনও সোণা রূপার হইয়া, থাকে ? কিন্তু আজ সেই ভীষণ রাক্ষস সমরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা দেবী পঞ্চবটী বনে সোণার মৃগের জন্য লালায়িত, আর স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ লইয়া সোণার মৃগ মারিতে উদ্যত। এ সকল জীবনের মহানাটকের কথা। এত বড় কবি হইয়া রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া মহাভারতের মহানাটকের এমন অর্থ করিলেন আমি ভাবিয়া পাই না। তবে কি তিনি এ কথাও বলিতে পারেন যে, নলরাজা নিতান্ত অপ্রেমিক ও স্ত্রী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলিয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে নিতান্ত করুণা-প্রার্থিনী কায়মনোবাক্যে একান্ত অনুগামিনী সেই অঙ্ক-শায়িতা নিদ্রাভিভূতা দময়ন্তীকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন! আর মহাভারতের যে স্থান ইচ্ছা সেই স্থান খুলিয়া দেখ—দেখিবে হয় ভীষ্ম, নয় বিদুর, নয় ধৃতরাষ্ট্র, নয় গান্ধারী,নয় পাণ্ডবগণ বলিতে-ছেন যে, কৌরবেরা দ্রৌপদীকে অপমান না করিলে এত তুমুল কাণ্ড হইত না।

দেখা গিয়াছে যে হিন্দুবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক এবং উহার যে সাংসারিক বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে তাহা ঐ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের অধীন। এই সিদ্ধান্তের বলে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কারণ হিন্দু বিবা-হের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাংসারিক এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রায় সমস্ত কথাই লিখিত। অতএব হিসাব মত এই স্থানেই এ প্রবন্ধ শেষ হয়। তথাপি আরও গুটিকতক

কথা বলিব। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার বন্ধন ইহলোকে ছিন্ন হয় না পরলোকেও থাকে। "এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে। যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যা-মিহলোকে পরত্র চ" (মহাভারত)। যে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইবার নয় সে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের চুক্তিমূলক হইতে পারে না। কারণ চুক্তির গোড়ায় নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়ম ভঙ্গ হইলে চুক্তিও ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব কোন কারণে ভঙ্গ হইবে না এমন চুক্তি হইতেই পারে না। আবার যাহারা চুক্তিতে বদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিবাহ হইলে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তাহারা দুই জনে মিলিয়া এক জন হয়। চুক্তিতে দুই জনে মিলিয়া কিছুতেই এক জন হইতে পারে না। অতএব হিন্দুর বিবাহে চুক্তির নিয়ম খাটে না। চুক্তির নিয়ম যদি না খাটিল, তবে বিবাহার্থ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে পছন্দ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। অতএব হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু পুরুষ উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হইতে পারে। হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না।

হিন্দু বিবাহ যদি অল্প বয়সে হইতে পারিল, তবে ঐ বয়স কি রকম হওয়া উচিত, এই কথাটা একটু বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার জন্য হিন্দু দার পরিগ্রহ করে। এ বড় সামান্য উদ্দেশ্য নয়। সামান্য কথায় যাহাকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা বলে, তদপেক্ষা এ উদ্দেশ্য যে কত উচ্চ তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যাহাকে লইয়া এত বড় উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে, তাহাকে নিজে গড়িয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি। কোন একটা বড়

কাজ করাইয়া লইতে বা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাইতে হইলে, সকলেই আপনার আপনার 'বনায়া' লোক দ্বারা তাহা করাইয়া থাকেন। সন্তান পিতার বংশের অনুযায়ী, পিতার ধর্ম্মক্রান্ত, পিতার রুচি প্রবৃত্তি ব্যবসায় বৃত্তির অনুগামী হইবে বলিয়া পিতা শৈশব হইতেই সন্তানকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়া থাকেন। সন্তান বড় হইয়া আপনিই পিতৃবৎ ও পিতৃবংশানুযায়ী হইয়া উঠিবে, এরূপ ভাবিয়া কোন পিতাই সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিতে সাহস করেন না। পরের ছেলেকে আপনার করিতে হইলে শৈশবেই পরের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করিতে হয়। শৈশব হইতে শিক্ষা পাইয়া ব্যাঘ্রকেও মনুষ্যের অনুগামী হইবার কথা শুনা গিয়াছে। অতএব পত্নীকে আপন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুগামিনী করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত শিক্ষা আপনার হাতে রাখা আবশ্যক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নিজের শিক্ষিতা নয় এমন বেশি বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্ব রকমে ও সকল অবস্থায় ও চিরকালের মতন নিজের অনুগামিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে একেবারেই পাওয়া যাইতে পারে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা বড় কম। কিন্তু সেরূপ স্ত্রীর প্রয়োজন সকলেরই, আর যে উদ্দেশ্যে সেরূপ স্ত্রী প্রয়োজন, তাহা যারপরনাই উচ্চ ও গুরুতর। এমত স্থলে সম্ভাবনার পথে না গিয়া নিশ্চয়তার পথে অথবা কম সম্ভাবনার পথ ছাড়িয়া বেশি সম্ভাবনার পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অন্যের শিক্ষিতা স্ত্রী না লইয়া নিজে স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়াই ভাল। অতএব স্ত্রী যৌবন প্রাপ্ত হইবার এবং শৈশবের সীমা অতিক্রম করিবার

পূর্ব্বে তাহারই পাণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিবাহপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য পতি পত্নীর যে একীকরণ তাহা সিদ্ধ হওয়ার পক্ষেও এইরূপ স্ত্রী গ্রহণ করা অধিকতর বিহিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দেহ মন হৃদয় আত্মা সব যখন শূন্য, কিছুই কোন রকমে অধিকৃত হয় নাই, তখন হইতে পতির শিক্ষাধীন হইলে তাহার সেই দেহ মন হৃদয় আত্মা সমস্তই তাহার পতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার যত সম্ভাবনা, কোন রকমে অধিকৃত হইবার পর পতির শিক্ষাধীন হইয়া পতিকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার তদপেক্ষা অনেক কম সম্ভাবনা। আমাদের সন্তানাদি যে আমাদের এত অনুরূপ হয় তাহার কারণই এই যে, শৈশব হইতে আমরা সন্তানদিগকে আমাদের মনোমত শিক্ষা দিই। এইরূপ শৈশব হইতে শিক্ষা দিয়া জেম্‌স্ মিল্ আপন সন্তান জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে দোষে গুণে কেমন আপনার মতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। অন্যকে আপনার মতন করিতে হইলে শৈশব হইতে অন্যকে শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এইরূপে গড়িয়া লইলে সদ্ভাব এবং প্রণয়ও খুব বেশি হয়। কারণ সদ্ভাব ও প্রণয় সর্ব্ব রকমে এক হইবারই ফল স্বরূপ। মানুষে মানুষে যত এক হইবে তাহাদের প্রণয়ও তত বাড়িবে। ইহা মানুষের প্রকৃতি গুণে হয়—বিধাতার নিয়ম গুণে হয়। ইহাকে জাঁতায়-পেষা প্রণয় বলে না। অথবা ইহাকে যদি জাঁতায়-পেষা প্রণয় বলা ঠিক হয়, তবে জগতে কি যে জাঁতায় পেষা নয় তাহা নির্ণয় করা যায় না— মানুষের বুদ্ধিও জাঁতায় পেষা, শিক্ষাও জাঁতায় পেষা, স্নেহও জাঁতায় পেষা, রুচি ও জাঁতায় পেষা, সবই জাঁতায় পেষা।

অতএব জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধিবার জন্য পতিপত্নীর যে একী-করণ আবশ্যক তাহা সম্পাদনার্থ বালিকা স্ত্রী বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বাবুও প্রকারান্তরে সেই কথা বলেন। তিনি বলেন যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বালিকা স্ত্রী, আবশ্যক, কারণ সে পরিবারে স্ত্রীকে অনেকের সহিত মিলিতে মিশিতে হয়। কিন্তু অন্যের সহিত মিলিবার মিশিবার জন্য স্ত্রীর যদি বালিকা হওয়া আবশ্যক হয় তবে পতির সহিত মিলি-বার মিশিবার জন্য বালিকা হওয়া আবশ্যক না হইবে কেন? বরং বেশি আবশ্যক হইবে। কারণ অন্যের অপেক্ষা পতির সহিত স্ত্রীর অনেক বেশি মিলিতে মিশিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু বলেন, যেখানে পরিবার একান্নবর্ত্তী নয়, সেখানে স্ত্রী বালিকা হইলে চলে না, কারণ বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণাদি করে কে? কাজেই সে রকম পরিবারে একেবারে ঘর কন্না করিতে পারে, এমন বড় মেয়ে বিবাহ করা আবশ্যক। আজ কাল এ দেশে অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিতেছে। কেন ভাঙ্গিতেছে, ভাঙ্গা উচিত কি না ও ভাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে কি না, এ স্থলে সে সব কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র দেখা আবশ্যক যে, যেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই, সেখানে মা বাপও কি নাই? মা বাপ থাকিলে, বালিকা স্ত্রী বিবাহ করিয়া ঘরে আনিবার আপত্তি কি? তবে যদি আজি কালিকার শিক্ষার গুণে মা বাপের সঙ্গে থাকিতেও কষ্ট হয়, তবে আপনি যেমন মা বাপের দ্বারা মানুষ হই-য়াছি, তেমনি স্ত্রীটিকেও তাঁহাদের সাহায্যে মানুষ করিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছ থেকে সরিয়া পড়ায় ক্ষতি কি?

ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হয়—উচিত নয় এমন কথা কে বলিবে?—তাহা হইলে খুব বেশি বয়স প্রাপ্ত হইয়া নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে, অতি অল্প সংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট নর নারী ছাড়া লোকে সাধারণতঃ আপন আপন সুখসচ্ছন্দকে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে শিখে। আমাদের মধ্যে যাহারা যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতী, তাহারা সেই জন্য এই বলিয়া বাল্যবিবাহের নিন্দা করে যে যে বিবাহের উপর লোকের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে * বাল্য বিবাহে সেই বিবাহ সম্বন্ধে লোকের নিজের মতামত চলে না। কিন্তু নিজের সুখসচ্ছন্দ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, এই সংস্কার প্রবল হইলে বিবাহের যে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে বা থাকা উচিত, এ সংস্কার লোকের মনে স্থান পায় না এবং পাইলেও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ বড় কম অনিষ্ট নয়। এরূপ ঘটিলে বিবাহ পশু পক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না, এবং বিবাহ যদি পশু পক্ষীর মিলন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তবে বিবাহ না হওয়াই ভাল। আবার নিজের সুখসচ্ছন্দের জন্য বিবাহ—এরূপ সংস্কার হইলে নিজেরই সুখসচ্ছন্দের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। নিজের সুখসচ্ছন্দ নিজের

---

* পিতা মাতাকে সন্তানের বিষয় সম্পত্তির উপর যখন অসংযত অধিকার দেওয়া হইতেছে না, তখন তাহার অধিকতর মূল্যবান সম্পত্তি—জীবনের সুখ দুঃখের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পিতা মাতাকে দেওয়া কি প্রকারে সঙ্গত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সঞ্জীবনী, ২৯শে শ্রাবণ ১২৯৪।

জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইলে সুখসচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িতে থাকে, সুখের পিপাসা কিছুতেই মিটে না, সুখসচ্ছন্দের পরিবর্ত্তে অসুখ ও অসন্তোষই বৃদ্ধি হয়। নিজের ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যাহা বেশি অন্বেষণ করে তাহাই মানুষ পায় না, তাহার সম্বন্ধেই বেশি বঞ্চিত ও আত্মপ্রতারিত হয়। এইজন্যই হিন্দু শাস্ত্রে বাসনা বিসর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা, খৃষ্টধর্ম্মের resignation বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের কথা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের স্বাত্বিক অংশে contentment বা তুষ্টিভাবের উপদেশ। অতএব বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইলে এবং বিবাহ করিয়া সাধারণতঃ সুখসন্তোষ লাভ করিতে হইলে, বেশি বয়সে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই উচিত। বয়স বেশি হইবার পূর্ব্বে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিলে, লোকের মনে স্বভাবতই এইরূপ সংস্কার জন্মে যে বিবাহ নিজের নিজের সুখসচ্ছন্দের জন্য নয়, বিবাহের অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। এই জন্য হিন্দুর মধ্যে পতি পত্নী পরস্পরের নিকট আপন আপন সুখসচ্ছন্দ অন্বেষণ করে না, পরস্পরে পরস্পরের ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায় না, পরস্পরে কেবল পরস্পরের জন্যই আছি, এইরূপ ভাবিয়া সংসার ধর্ম্ম করে না, উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া এবং সমস্ত পরিবারবর্গের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া অনায়াসে সুখ ও সন্তোষ লাভ করে। এই জন্য হিন্দু পতি পত্নীর রূপ খুঁজে না, বেশভূষা খুঁজে না, ঠসক্‌ঠমক্‌ খুঁজে না। এবং নিজের নিজের বেশি খোঁজা খুঁজি নাই বলিয়া তাহাদের নিজের নিজের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা

অসুখ অসন্তোষও বড় একটা নাই। এই জন্যই এত অধঃপতনের দিনে এবং প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার এত অভাবেও এ দেশে সাধারণতঃ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও স্ত্রী পুরুষের ভিতর যে পরিমাণ সুখ সন্তোষ ও সদ্ভাব আছে, ইংরাজাদি আজি কালিকার খুব সভ্য ও শিক্ষিতদিগের স্ত্রীপুরুষের ভিতর সে পরিমাণ নাই *। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার হিসাবে হিন্দু বিবাহ

* "The proportion of unhappy marriages is larger in England than in India, still larger in America After close observation during six years devoted especially to the study of social phenomena in the West I have come to the conclusion that the proportion of unhappy marriages in England and America is due to the very conception of marriage upon which the present reform agitation is based, namely, as an instrument of attaining personal happiness and not as a means of serving family and society, of making others happy besides the cunple themselves. Personal gratification is an utterly unsafe thing to be trusted, even in the accomplishiung of that which is its avowed object, namely, happiness. For being increased by cultivaticn it never succeds in gratifying itself, while it encroaches upon the rights of others, even of the object of its own love. Facts and phenomena in modern Europe are obtruding illustrations of this trurh, not only in the home, but also in the relations of the outside world."

Amrita Lal Ray.

The speeches of Eminent Indian Gentlemen, on "Hindu marriage customs" delivered at the meeting held on the 6th August, 1887, at the Sobhabazar Rajbati, Appendix B. H. 96.

প্রণালীর এ বড় কম উপকারিতা নয়। সে প্রণালী পরিত্যাগ করিলে হিন্দু দম্পতীরও যেমন অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে, হিন্দুসমাজেরও তেমনি অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে। অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও অস্থিরতা কি শারীরিক জীবন কি নৈতিক জীবন সকল প্রকার জীবনের প্রতিকূল, এবং হিন্দুজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সমস্ত বিঘটন হিন্দু প্রকৃতির কিছু বিশেষ রকম বিরোধী। অতএব হিন্দুর বিবাহ-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলে হিন্দুর শারীরিক জীবন ও ধর্ম্ম জীবন উভয় জীবনই ক্রমে হীন ও খর্ব্ব হইয়া শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, বিবাহের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল রাখিবার জন্য, পতিপত্নীর সুখ সন্তোষ ও সদ্ভাব পুষ্ট ও সহজ-লব্ধ করিবার জন্য, এবং পরিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ বেশি বয়সে নিজ নিজ পছন্দানুসারে না হইয়া অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের পছন্দানুসারে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য।

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বিবাহের যে প্রকার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহ স্বেচ্ছাধীন ও সখের কাজ নয়। বিবাহ মানবের একটি গুরুতর নির্ব্বন্ধ। তাই আমাদের বিবাহ-কার্য্য নিজের নিজের হাতে নাই এবং আমাদের বিবাহ-বন্ধনের ছেদও আমাদের স্বেচ্ছাধীন নয়। বিবাহের এই নির্ব্বন্ধরূপ ভাব এবং যাহাদের বিবাহ, বিবাহে তাহাদের

এই আত্মকর্তৃত্বহীনতা—এই দুইয়ের মধ্যে যে গূঢ় গুহ্য ও গভীর একতানতা আছে, তাহা জগৎপতির স্থাপিত জাগতিক নির্ব্বন্ধ ও জীবের জাগতিক নির্ব্বন্ধাধীনতা এই দুইয়ের মধ্যস্থিত গূঢ় গুহ্য ও গভীর একতানতার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এবং জগৎ ও জীবের নির্ব্বন্ধমূলক একতানতা যেমন জীব ও জগতের সদ্ভাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিজ্ঞেয় কারণ, বিবাহ ও বিবাহিতের নির্ব্বন্ধ মূলক একতানতাও তেমনি পতি পত্নীর সদ্ভাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিজ্ঞেয় কারণ। এই জন্যই হিন্দুর ভিতর এত বেশি দম্পতির মধ্যে এত বেশি প্রেম ও সদ্ভাব। হিন্দুর বিবাহ বাল্যবিবাহ বলিয়া যাহারা বলে যে হিন্দু দম্পতির মধ্যে প্রণয় হয় না তাহারা হয় হিন্দুদিগের কোন কথাই জানে না নয় জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা কয়। হিন্দুর বিবাহপ্রণালী জগৎপতির গূঢ় জাগতিক নির্ব্বন্ধপ্রণালীর অনুকরণে রচিত—মহানাটককারের মহানাটকের আভাসে অনুষ্ঠিত। আমরা হতভাগ্য, এ সকল মহাকথা এখন আর বুঝি না। বুঝিলে বিবাহের কথা লইয়া আজ এমন করিয়া মারামারি লাঠালাঠি করিতাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার যে অপর কোন উদ্দেশ্য নাই তাহা নয়। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা এমন মূর্খ ছিলেন না যে মনুষ্যের মধ্যে ভোগস্পৃহা রূপতৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান নাই। মনু বলেন ঃ—

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

(৩ অ—১০)

কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য বলিয়া উপভোগ করিলে মানুষ ভোগস্পৃহা ও জড় প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ে এবং তাহার নৈতিক উন্নতির পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। অতএব, শুদ্ধ শারীরিক রূপ দেখিয়া বিবাহ করিলে হিন্দুবিবাহের মহদুদ্দেশ্য বিফল হইবার কথা। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি বলিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হইবে। মনু বলেন:—

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতং।

(৩ অ—৪)

দ্বিজগণ সুলক্ষণাক্রান্ত সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

জ্ঞানীমাত্রেই এ ব্যবস্থার সারবত্তা স্বীকার করিবেন। আমাদের মধ্যে প্রায় সকল পিতা মাতারও সুন্দরী বউ করিবার সাধ। এবং জাতি কুল ঘর ও কন্যার সুলক্ষণাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত সুন্দরী বধূ পাওয়া যায়, প্রায় সকল পিতা মাতাই সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবল পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই বলিয়া এবং রূপ ছাড়া আর কিছুরই প্রতি শিক্ষিত যুবকদিগের লক্ষ্য নাই বলিয়া, আজ কাল অনেকে পিতা মাতার কন্যা-নির্ব্বাচনে অসন্তুষ্ট এবং নিজে নিজে পচ্ছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত। ইহা নৈতিক অবনতির লক্ষণ এবং নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে এই নৈতিক অবনতি ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। যাহাকে গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার শুধু রূপ দেখিলে চলিবে না। তাহার জাতি, কুল, ঘর ও সুলক্ষণাদিও বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

নিজে কন্যা নির্ব্বাচন করিলে এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না; অতএব সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলার্থ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক কন্যা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। এবং পিতা মাতা প্রভৃতির নির্ব্বাচনের কেহ বিরোধী না হয় এই জন্য পুত্র কন্যা উভয়েরই অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত এবং পিতা মাতার প্রতি যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, পুত্র কন্যা উভয়কেই সেই রকম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কম বয়সে বিবাহের ফলস্বরূপ শারীরিক অপকার হয় কি না, এখন সেই কথার আলোচনা আবশ্যক। যাঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে লোকের শরীর দুর্ব্বল হয় এবং উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই মত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, উত্তর পশ্চিমে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু সেখানকার লোক বেশ বলিষ্ঠ—বাহুবলে ইউ-রোপীয়দিগের সমকক্ষ। বিজ্ঞানের Inductive প্রণালী অনু-সারে এই একটি মাত্র ব্যতিক্রমে এই মতটি অসিদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি বল উত্তরপশ্চিমের জল হাওয়ার গুণে তথায় বাল্যবিবাহের দরুন শারীরিক অপকার ঘটিতে পারে না, প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, বাঙ্গালার জল হাওয়া উত্তর পশ্চিমের জল হাওয়া অপেক্ষা অনেক খারাপ, অতএব বাঙ্গা-লার জল হাওয়ার দোষে তথায় লোকের শরীর দুর্ব্বল হয়, বাল্যবিবাহের জন্য হয় না।

তৃতীয় কথা এই যে, বাঙ্গালার শুধু যে মানুষ দুর্ব্বল তাহা নয়, ছাগ, মেষ, গো মহিষাদিও দুর্ব্বল। ইহাতেই বোধ হয় যে, বাঙ্গালায় এমন একটা কিছু আছে, যাহা বাঙ্গালার শুধু মানুষকে নয় গো মেষাদিকেও দুর্ব্বল করে। সে জিনিষটা বাল্যবিবাহ নয়, কারণ গো মেষাদির বাল্যবিবাহ নাই। রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালার বাঘের দৃষ্টান্ত দিয়া এই যুক্তিটা কাটিয়া ফেলিতে চান। কিন্তু বাঙ্গালার জল হাওয়া বা বন জঙ্গল বাঘের স্বাস্থ্যকর বা উপযোগী হইতে পারে, মানুষের বা গোমেষাদির না হইতে পারে। এঁদো স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় মশা মাছি কৃমি কীট খুব বাড়ে, কিন্তু মানুষ ও গো মেষাদির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রবীন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে, বাঙ্গালী গোমেষাদি পালন করিতে জানে না বলিয়া বাঙ্গালায় গোমেষাদি দুর্ব্বল ও থর্ব্ব। কিন্তু উত্তরপশ্চিমের লোকও ত পশুপালন বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, অথচ উত্তরপশ্চিমের গোমেষাদি বিলক্ষণ বলবান্। আর বাঙ্গালী পশুপালনে অনভিজ্ঞ বলিয়াই যদি বাঙ্গালার গবাদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালী নিজের শরীর পালনে অনভিজ্ঞ বলিয়া বাঙ্গালার লোক দুর্ব্বল, এ কথা বলাই বা না চলিবে কেন?

চতুর্থ কথা এই যে, বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষে বাঙ্গালার লোক যে দুর্ব্বল হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এখনকার ন্যায় প্রবল ও ব্যাপক ম্যালেরিয়া ছিল না। তখন এই বাঙ্গালার লোকই এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণে বলিষ্ঠ সুস্থকায় কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল ছিল। আমি সে সময়ও দেখিয়াছি এবং সে সময়ের বাঙ্গালীও দেখিয়াছি। আর এই কয়েক বৎসরের

ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গালী কি হইয়া গিয়াছে, তাহাও দেখিতেছি। একটা জলপূর্ণ মশকের মুখ খুলিয়া দিলে তাহার জলটা যেমন হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং মশকটা দেখিতে দেখিতে চুপ্‌শে যায়, এই কয় বৎসরের ম্যালেরিয়াতে তেমনি বাঙ্গালীর শারীরিক বল যেন হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহার দেহটা দেখিতে দেখিতে যেন চুপ্‌শে গিয়াছে। জল হাওয়ার এমন সর্ব্বনেশে প্রতাপ চক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া বলি যে বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষ বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার অন্ততঃ একটা অতি প্রবল ও গুরুতর কারণ নয়? আর বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার এমন প্রবল কারণ চক্ষের উপর থাকিতে যাঁহারা ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালীকে বীর করিবার জন্য বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবার আশায় বসিয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিতান্তই কর্ত্তব্যপরাঙ্‌মুখ—এ কথাই বা না বলি কেমন করিয়া?

পঞ্চম কথা এই যে, বাঙ্গালার ট্যাঁস ফিরিঙ্গিরা বাল্যবিবাহ করে না—ইংরাজদের ন্যায় বেশি বয়সে বিবাহ করে। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বলবান নয়। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, বাঙ্গালার জল হাওয়ার কি অপর কোন দোষে বাঙ্গালার মানুষ দুর্ব্বল হয়, বাল্যবিবাহের জন্য হয় না।

ষষ্ঠ কথা এই—(১) বাঙ্গালীর আঁতুড় প্রণালীর দোষে বাঙ্গালায় অনেক শিশু মরে এবং বাঙ্গালীর শরীর প্রথম হইতেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। (২) বাঙ্গালী সন্তান পালন করিতে জানে না বলিয়া বাঙ্গালায় অনেক বালক বালিকা মরে এবং বাঙ্গালী প্রথম হইতেই দুর্ব্বল

ও রুগ্ন হয় এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। (৩) বাঙ্গালীর খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয়, এবং বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণ আহার পায় না বা করে না, এ কথা সকলেই জানেন। (৪) বাঙ্গালী ব্যায়াম অভ্যাস করে না এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে লাঠিয়ালদিগের ন্যায় যাহারা ব্যায়াম অভ্যাস করে তাহারা বেশ বলিষ্ঠ, এ কথা সকলেই জানেন ও বলিয়া থাকেন। (৫) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা হেতু বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর প্রণালীতে জীবন যাপন করে, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। (৬) এখনকার শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বাঙ্গালী রুগ্ন হইতেছে এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। (৭) বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হইবার আরও অনেক কারণ আছে। জড়বিজ্ঞানের inductive প্রণালীতে যদি বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ নিরূপণ করিতে হয়, তবে এই সমস্ত কারণগুলি হইতে কতটা দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া যদি দেখা যায় যে আরও দুর্ব্বলতা আছে, তখন সেই অবশিষ্ট দুর্ব্বলতা বাল্যবিবাহ ঘটিত কি না, বিচার করিতে হয়। এই সমস্ত কারণ হইতে কতটা দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, এই সমস্ত কারণ নষ্ট করিলেই নির্ণয় করিতে পারা যায়, নতুবা পারা যায় না। অতএব অগ্রে এই সকল কারণ নষ্ট করাই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

কোন কোন দেহবিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক প্রথম রজঃস্বলা হইবার পর কিছু দিন না গেলে গর্ভ-ধারণের উপযোগী হয় না এবং রজঃস্বলা হইবার পরেই গর্ভধারণ করিলে গর্ভজাত সন্তানও দুর্ব্বল হয় এবং তাহাদের নিজের ও

শারীরিক অনিষ্ট হয়। প্রথমে তাহাদের গর্ভধারণের উপযোগী হইবার এবং গর্ভজাত সন্তানের কথা বিবেচনা করা যাক্। প্রথম রজঃস্বলা হইবার পরই স্ত্রীলোক গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এই মতের পক্ষে সাজান কথার যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষার বা experiment-এর ফল প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তির সফলতা যে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা সকলেরই জানা আছে। তা ছাড়া অনেক বিষয়েই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের মতামতের স্থিরতা বা ঠিকানা নাই। মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, কি খাওয়া ভাল কি মন্দ, পশমী বস্ত্র ব্যবহার করা ভাল কি মন্দ, জ্বর হয় কেন, ম্যালেরিয়া কি, মাথা ধরে কেন, খোষ হয় কেন—এইরূপ ছোট কথা বল, বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথারই ত একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল কথাতেই ত theory, hypothesis, মতের মারামারি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি দেখিতে পাই। তবে এই বিবাহের বয়স ও গর্ভধারণের বয়স সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানে যাহা বলে, কেমন করিয়া তাহা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করি? আর এ বিষয়ে জড়-বিজ্ঞানের মতটা যে কি, তাহাও ত বুঝিতে পারা যায় না। কোন বিজ্ঞানবিদ্ চৌদ্দ বৎসরে স্ত্রীলোকের বিবাহের ব্যবস্থা দেন। তাহার অর্থ এই যে, চৌদ্দ পনর বৎসরে গর্ভধারণ করিলে অনিষ্ট হয় না। আবার কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে গর্ভধারণ বিষম অনিষ্টকর। অতএব কোন্ বিজ্ঞানবিদের মত অনুসরণ করিতে হইবে, তাহাও ঠিক করা যায় না এবং বিজ্ঞানবিদেরা কি প্রণালীতে আপন আপন মত স্থির করেন, তাহাও বুঝিতে পারা

যায় না। বিজ্ঞানের একটা যুক্তি এই যে, দাঁত বাহির হইলেই কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া বা খাইতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা দরিদ্রতা বশতঃ ছেলেকে দুধ খাইতে দিতে পারে না, তাহাদের ছেলেরা দাঁত বাহির হইলেই, অনেক স্থলে দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই, কঠিন দ্রব্য খাইতে থাকে। তবে যে বয়সে দাঁত বাহির হয় সে বয়সে কঠিন দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না বলিয়া, যাহারা দুধ কিনিতে পারে তাহারা দাঁত বাহির হইবামাত্র ছেলেকে কঠিন দ্রব্য খাইতে দেয় না। তা ছাড়া প্রথম যে দাঁত উঠে, আট নয় বৎসরে তাহা পড়িয়া গিয়া আবার নূতন দাঁত হয়। অতএব দাঁতের উপমা খাটাইতে হইলে বৈজ্ঞানিককে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে উনিশ কুড়ি বৎসরে স্ত্রীদিগেরও নূতন রকম একটা সংস্কার হয়। পশু পক্ষী ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে, এবং গর্ভধারণ বশতঃ তাহাদের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য সম্বন্ধে ভিন্ন নিয়ম, জড়বিজ্ঞানবিদ্ যদি এই কথা বলেন তবে তাঁহাকে এই ভিন্নতার কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইবে। বুঝাইলে তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইব, নচেৎ লইব না। ঐন্দ্রিয়িক-পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই যে সন্তান জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ঠিক এই রকম কথা বলি। এ রকম সন্তান দুর্ব্বল হইবে বলিয়া শুধু সাজান কথার যুক্তি দিলে চলিবে না, পরীক্ষার ফল দেখাইতে হইবে। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হইয়া থাকে ইহা পরীক্ষার ফল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হইবার অনেক কারণ পূর্ব্ব নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

অতএব বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হয় ইহা এরূপ গর্ভজাত সন্তানের দুর্ব্বলতার প্রমাণ বলিলে ন্যায়শাস্ত্রানুসারে সাধ্য-সম দোষ অর্থাৎ Begging the question যাহাকে বলে, সেই দোষ ঘটিবে। অপর দিকে গাভী প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে দেখা যায় যে ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর তাহারা প্রথম যে বৎস প্রসব করে, তাহা দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাক্, তাহাদের অপর সমস্ত বৎসাপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। মানুষের বেলা কেন অন্যরূপ হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না বুঝাইলে, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখন তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যাউক যে ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পরেই গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং গর্ভজাত সন্তানও দুর্ব্বল হয়। শুধু ইহাই নয়; এই প্রসঙ্গে আরো গুটিকতক কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন কলিকাতা অঞ্চলে স্ত্রীলোকের বিশ ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। কলিকাতার ন্যায় সহরে এখন স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা, বড়ই শ্রম-বিমুখ হইয়াছে। তাহারা রন্ধন, গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য করে না। যে সকল কার্য্য তাহাদের আপনাদের করা উচিত, তাহা দাস দাসী দ্বারা করাইয়া লয়। আপনারা শুইয়া বসিয়া বেশ-বিন্যাস করিয়া নাটক নবেল পড়িয়া গল্প গুজব করিয়া দশপঁচিশ খেলাইয়া দিন কাটায়। এজন্য তাহারা বড়ই রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অম্লরোগ, অজীর্ণ রোগ, অপস্মার রোগ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি রোগের জ্বালায় আমরা ব্যতিব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছি। আর তাহাদের স্তন্যপান করিয়া তাহাদের সন্তানাদিও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাদের এখন বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতেছে, সূতিকাগার হইতে বাহির হইতে না হইতে আবার সূতিকাগারে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

যে যথেচ্ছাচারী অসংযমী ধর্ম্মজ্ঞানহীন সে চল্লিশ বৎসর বয়সে ত্রিশবর্ষ বয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে আপনি বুড়া হইবে, স্ত্রীকে বুড়ী করিবে এবং পাঁচটা ছেলে মেয়েকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। স্ত্রীসঙ্গম অতি ভয়ানক কাজ। খুব সাবধানে, নানা দিক দেখিয়া, বিশেষ সংযমী না হইয়া স্ত্রী সঙ্গম করিলে, যে বয়সেই স্ত্রীসঙ্গম কর, স্ত্রীসঙ্গমের ফল অতি ভয়ানক হইবে। সেই জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীগমন সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম করিয়াছেন। আমরা নাকি ভারি সভ্য হইয়াছি তাই মন্বাদিকে বর্ব্বর বলিয়া উপহাস করি। মন্বাদির কথা পুরাতন কথা বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি। কিন্তু দেখিতেছি যে, "আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই, সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। পুরাতন কথা বার বার তুলিতেই হইবে—নাচার।"

বোধ হয় এখন বুঝা গেল যে, স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া শুধু শারীর বিজ্ঞানের নিয়মাধীন হইলে দোষশূন্য হয় না। শারীরিক ক্রিয়াসম্বন্ধে শারীর বিজ্ঞানের যে ব্যবস্থা তাহা সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ব্যবস্থার অধীন না হইলে কিছুমাত্র কার্য্যকর হয় না। অতএব স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া সর্ব্ব-

প্রকারে দোষশূন্য করিবার জন্য নীতিশিক্ষা ও কঠোর নৈতিক শাসন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে তাহা ছিল। পূর্ব্বে শৈশব হইতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইত, পারিবারিক নিয়মে, শৃঙ্খলায় ও শাসনে কাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস হইত, এবং জীবন প্রণালীর গুণে চরিত্র গঠিত হইত। এখন সে সমস্তেরই অভাব হইতেছে। এখন সুশিক্ষা নাই, ধর্ম্মচর্য্যা নাই, সংযম সাধন নাই, চরিত্র গঠন নাই। শিক্ষার দোষে আজকাল স্বয়ং পিতা মাতাই সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতা মাতা আপনারাই যথেচ্ছাচারী, সন্তানকে সংযমী ও ধার্ম্মিক করিবেন কি করিয়া? শিক্ষা, ধর্ম্মচর্য্যা এবং পারিবারিক শাসনের অভাবে সন্তান আজ পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করে না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে যথেচ্ছাচারিতা বাড়িবে বই কমিবে না, বিবাহের ফল আরো মন্দ বই ভাল হইবে না। অতএব নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মচর্য্যা ও কঠোর পারিবারিক শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিবাহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। অতএব বিবাহের যে পার্থিব উদ্দেশ্য আছে তাহা নৈতিক ও অধ্যাত্মিক নিয়মে সাধিত হওয়া আবশ্যক। শারীর-বিজ্ঞান স্ত্রীগমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য। শারীর-বিজ্ঞান যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে তাহা মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও আধ্যাত্ম

বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শারীর-বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক হইবে। দেখা গিয়াছে যে, বিবাহের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তানাদির বিবাহ দিয়া সন্তানাদি যাহাতে নির্দ্দোষ প্রণালীতে বিবাহের শারীরিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করে, শিক্ষার সাহায্যে ও কঠোর সামাজিক ও পারিবারিক শাসন দ্বারা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের এবং সমাজের তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। পিতা মাতা এবং সমাজ যদি তাহা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আর রক্ষা নাই--বিবাহের বয়স বাড়াইয়াই কি, আর আকাশ পাতাল ভেদ করিয়াই কি, কোন রকমেই আর কোন বিষয়ে ভরসা নাই। সুশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্য্যা আমাদের আজ এত আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এই নুতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে যাঁহারা নব্য বঙ্গের অকালবার্দ্ধক্য বা বাঙ্গালা সাহিত্যে শীতের বাতাস বলিয়া বিদ্রূপ বা ক্ষোভ করেন, তাঁহারা বিষম ভুল বুঝিতেছেন।

এখন স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের বয়স এক রকম নিরূপণ করিলেই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারা যায়। বিবাহের কথা যেরূপ পর্য্যালোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কাহার কত বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হয়, এখন তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিবাহ করিবে। আজ কাল কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে অধ্যয়ন

শেষ হয়। অতএব কুড়ির পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। তদগ্রে হওয়া ভাল নয়। কারণ, নিজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পুরুষ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে না। স্ত্রীর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হওয়া উচিত। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ইহার মর্ম্ম ও আবশ্যকতা কত্তা-ক্রান্তিতে বুঝাইয়াছি। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানে বলে এবং আমরা নিজে নিজেও বুঝিতে পারি যে স্বাভাবিক নিয়মে বার বৎসরের পূর্ব্বে প্রায়ই রজোদর্শন হয় না। অতএব কন্যার শারীরিক গঠনাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য *। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ দিলে কন্যা

* কন্যার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ১২ বৎসরে বিবাহ হইতে পারিবার পক্ষে মনুর স্পষ্ট বিধান আছে।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ (৯ অ—৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুর দর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরও সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

ফলতঃ মনুসংহিতা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মনুর মতে কন্যার বিবাহের বয়সের ৮ কি ১০ কি ১২ একরূপ একটা কড়াকড় নির্দ্দেশ নাই। কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে পিতা কর্ত্তৃক তাহার সম্প্রদান হইলেই হইল, এ সম্বন্ধে মনুসংহিতার ইহাই পরিষ্কার তাৎপর্য্য। পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন কোন ঋষি দশ বৎসরের মধ্যে কন্যাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দশ বৎসরের কন্যা ঋতুমতী হয় বলিয়া দশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুর সহিত এ ব্যবস্থার

রীতিমত পতি গৃহে বাস করিয়া পতির এবং পতির পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিতেও পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার যে উদ্দেশ্য তাহাও ভাল সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বার তের বৎসরের পরেও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা; শিক্ষার সুবিধা বিবেচনা করিয়াই সে বিবাহের বয়স নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।

যে রকম বয়সের কথা বলা গেল সেই রকম বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নবদম্পতিকে কিছুদিন কঠিন শাসনাধীন রাখিতে হইবে এবং উপদেশ দৃষ্টান্ত ও কর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে গূঢ় ও গুহ্য কথা সকল শিখাইতে হইবে। গুরু জনের কাছে এরূপ শিক্ষা না পাইলে পদে পদে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। পুস্তকে এরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় না।

প্রকৃত বিরোধ নাই। মনুর এবং অন্যান্য সকলেরই মত এই যে কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ আবশ্যক। তবে পরবর্ত্তী ঋষিরা তৎপক্ষে ঋতু হওয়া সম্বন্ধে একটু বেশি আশঙ্কাযুক্ত হইয়া দশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা যদি তত আশঙ্কাযুক্ত না হই, আর হইবারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না, তাহা হইলে মনুর ব্যবস্থা মতে কন্যার রজোদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শারীরিক গঠনাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিলে বোধ হয় শাস্ত্র সম্মত কাজই হইবে—কোন ঋষিরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। পুরুষের বিবাহের বয়স ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা সাধারণ নিয়ম। আবশ্যক হইলে বা কোন রকমে অসঙ্গত না হইলে দুই এক বৎসর এদিক ওদিকও হইতে পারে। সকল নিয়ম সম্বন্ধে সেরূপ হইয়া থাকে। সে কথা বলা বাহুল্য।

আজকাল আমাদের এরূপ শিক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়াছে। আমাদের সন্তানেরা এরূপ শিক্ষা পায়, যেমন করিয়া হউক, আমাদের সকলেরই তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সুশিক্ষা ও সুশাসনের দ্বারা নবদম্পতিকে ধর্ম্মের পথে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে দিতে হইবে। তবেই তাহারা বিবাহের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আর সংযমী হইয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের রোগ শোক ও শারীরিক দুর্ব্বলতাও হইবে না। রোগ শোক ও দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—অনিয়ম অনাচার ও অত্যাচার—অল্প বয়স নয়। বয়স অল্প হইলেও ভোগে যদি সংযম শুদ্ধাচার ও সুনিয়ম থাকে, তাহা হইলে ভোগ হইতে রোগ শোক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় না।

যুবক মহলে কথা উঠিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয়। এটা ইংরাজী মত। কিন্তু ততটা পাকা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। পাকা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় বার আনা ভাগ লোকের বিবাহ নিষেধ করিতে হয়। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই অধিক, সমাজের প্রায় বার আনা। স্ত্রী এবং চারি পাঁচটি করিয়া সন্তানকে অন্ন বস্ত্র দিয়া সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে পারে, এমন সঙ্গাত তাহাদের কখনই হয় না। অতএব উল্লিখিত মতটি যদি পাকা হয় তবে পৃথিবীর বার আনা লোকের বিবাহ হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু বিবাহ অনুচিত বলিয়া রিপু ত লোপ হয় না। কাজেই

যথেচ্ছা বিহার ও সন্তান বধ ভিন্ন আর উপায় থাকে না। যে মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে সমাজ যথেচ্ছাচার ক্ষেত্র হইয়া পড়ে, সে মতের সত্যতা বা সারবত্তা বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে দেশের ঐ মত সে দেশেও ঐ মতানুসারে কার্য্য হয় না। হইলে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র এবং নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতএব তাহাদের মধ্যেও যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং যথেচ্ছাগমন নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ এই যে মানবের নীতি ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাই বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহদ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া সন্তানাদির ভরণপোষণ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তবে কেন বল যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রতিপালন করিবার মতন সঙ্গতি না হয় সে পর্য্যন্ত বিবাহ করিব না বা বিবাহ করা অন্যায়? তবে কি স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের কথাটা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? না, তা নয়। কিন্তু ভিন্ন রকমে উহার মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ বিবাহের নৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিবাহের যে বয়স প্রশস্ত হয় সেই বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি প্রতি-পালনের ভার যত লঘু করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। উপায়ও অনেক আছে। এক উপায় পারিবারিক সাহায্য। পারিবারিক প্রণালী যে প্রকার হইলে স্ত্রী পুত্রা-দির প্রতিপালনার্থ পিতা পিতৃব্য বা সহোদরাদির সাহায্য পাওয়া যায়, পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার হওয়া উচিত। আমাদের পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার, ইহা আমাদের বড়

সুবিধা ও সৌভাগ্যের কথা। আমরা নিতান্ত দৃষ্টিহীন হইয়াছি বলিয়া এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আমাদের পরিবারিক প্রণালী ভাঙ্গিয়া যাওয়া উচিত। আমাদের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে বুঝিতে পারিতাম যে আমাদের পরিবারিক প্রণালীর বিনাশ বাঞ্ছনীয় নয়, সংস্কারমাত্র আবশ্যক। ইংলণ্ডাদি দেশে আমাদের ন্যায় পারিবারিক প্রণালী নাই। ইহা তথাকার দুর্ভাগ্য। ইহার অর্থ এই যে ঐ সকল দেশ চিরকাল পার্থিবতা লইয়াই থাকিবে, সভ্যতা কখনই তথায় নীতি ও ধর্ম্মমূলক হইতে পারিবে না, চিরকাল অর্থের জন্য কেবল কল কারখানার উপাসনা চলিবে। আর এক উপায় রিপু সেবায় সংযম— যাহাতে বেশি সন্তান না হয় তাহার উপায় বিধান। সন্তানোৎ-পাদন অনেক পরিমাণে মানুষের স্বেচ্ছাধীন কাজ। সন্তানোৎ-পাদন সম্বন্ধে সন্তানকে পিতা মাতার সর্ব্বদা স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া উচিত। কুরুচির ধূয়া তুলিলে চলিবে না। ঐ ধূয়া ইউরোপের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমাদেরও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং সন্তান যাহাতে সেই সকল উপদেশ পালন করে পিতামাতাকে তেমনি করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর এক উপায় জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য। পানে ভোজনে, শয়নে, বিলাসে, বিহারে—সকল বিষয়ে কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্য। দুই টাকা যোড়া কাপড় পরিলে যদি চলে, তবে আট টাকা জোড়া কাপড় পরি কেন? দুই টাকার জুতায় যদি চলে তবে দশ টাকার জুতা পায়ে দি কেন? দাল ডালনায় যদি দেহের পুষ্টিসাধন হয়, তবে কালিয়া পোলাও খাই কেন? রুটি খাইলে যদি শরীরে বেশি বল হয় তবে কেবল খাইতে ভাল

বলিয়া, অথবা লোকে বাবু বলিবে বলিয়া লুচি খাই কেন? হাঁটিতে যদি পারি, তবে গাড়ি ঘোড়া চড়ি কেন? সাধ করিয়াই ত সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছি। ইউরোপ যাইতেছে বলিয়া আমরাও ইউরোপের দেখাদেখি যাইতেছি। কিন্তু ও পথ হইতে ফিরিতে হইবে। যদি মানুষ হইতে চাই, যদি জাতি হইতে চাই; যদি মোক্ষ পথের পথিক হইতে চাই তবে ঐ সর্ব্বনেশে পথ হইতে ফিরিতেই হইবে। ইউরোপে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ও পথে চলেন না। চলেন না বলিয়াই তাঁহারা মহাপুরুষ। ও পথের শেষ এই পৃথিবীতেই—পৃথিবীর বাহিরে যাইতে হইলে অন্য পথে—কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলিতে হইবে। পার্থিবতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—পৃথিবী নয়, পার্থিবতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী অসীম নয়, অতএব পার্থিবতার পথে চলিলে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব ফাঁপরে পড়িতেই হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকাও পড়িবেন—ঐ বিষম পার্থিবতার পথ না ছাড়িলে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব ইউরোপ এবং আমেরিকাকেও ফাঁপরে পড়িতেই হইবে। এখনি কোন্ না তাহার আভাস পাইতেছেন? ঐ যে সব socialism, communism, demonstrations of the unemployed—উহার অর্থ আর কি? তাই বলিতেছি—এই বেলা আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সেই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কালোচিত পরিবর্ত্তনের নাম করিয়া উহার বিনাশ নিবারণ করিব না, ইহাই বা কেমন কথা? কেন, আমরা ত পশুপক্ষী নহি যে ঝড় বৃষ্টি

আসিল বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিব বা গাছের ডাল হইতে পড়িয়া পড়িয়া মারা যাইব ? আমরা মানুষ—গৃহনির্ম্মাণ করিয়া আমরা ঝড় বৃষ্টি ব্যর্থ করিতে পারি। তাই বলিতেছি, যে কোন প্রকারে আমাদিগকে আবার সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। করিলে আমাদের আর এত অভাব থাকিবে না। আজ কাল যে অভাবের কথা উঠিয়াছে তাহার বার আনা ভাগ বাবুগিরি। ও বাবুগিরি ঘুচিলে জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি আমদানি করা বড় বড় কথাগুলাও বড় একটা শুনিতে হইবে না। আর যদিই কাহারো সহিত জীবনসংগ্রাম চলে, তথাপি ঐ বাবুগিরি না ছাড়িলে সে সংগ্রামে আমাদের জয় লাভ হইবে না। বাবুগিরি লইয়াই ত অপরের সহিত আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ। বাবুগিরি ছাড়িলে আর যুদ্ধ চলিবে কেমন করিয়া ? আত্মজয়েই দিগ্বিজয়। অতএব কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া আমাদের আত্মজয় করিতে হইতেছে। আত্মজয়ী ব্রহ্মচারী হইলে আমাদের এত অভাব থাকিবে না। অভাব কমিলে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালনের ভারও লঘু হইয়া পড়িবে। সেইরূপ করাই প্রকৃত পদ্ধতি। অভাব বেশি বলিয়া বিবাহ না করা বা বিবাহ করিতে অধিক বিলম্ব করা প্রকৃত পদ্ধতি নয়। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা স্বজাতীয় দরিদ্রদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন না, দরিদ্রেরা যাহাতে সুরাপানাদি দ্বারা অর্থ নষ্ট না করে সেই চেষ্টা করেন। আর এক উপায় উপার্জ্জন বৃদ্ধি করা। ব্রহ্মচারী হইলে উপার্জ্জন করিতে হইবে না এমন কোন কথা নাই। ব্রহ্মচারীর বিলাসিতা বাবুগিরিই নাই, কর্ত্তব্য

কর্ম্ম ত আছে—পরিবার পালন, সমাজ সেবা, ধর্ম্মচর্য্যা এবং তদন্তর্গত লোকহিতানুষ্ঠান প্রভৃতি বহুতর ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম ত আছে। বাবু অপেক্ষা ব্রহ্মচারীর অর্থে অধিকার বেশি, সদ্ব্যয়ের আবশ্যকতাও বেশি। ব্রহ্মচারী হইলে—বৃক্ষতল-বাসী, ভস্মমাখা ভিক্ষোপজীবী ন্যাংটা সন্ন্যাসী নয়, জিতেন্দ্রিয় বিলাসবিদ্বেষী ধর্ম্মানুরাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ সর্ব্বলোক-হিতৈষী ব্রহ্মচারী হইলে—আমাদেরই বেশি অর্থ আবশ্যক হইবে। অথচ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বেশি অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে ভগ্ন হৃদয়েও মরিতে হইবে না অথবা শেয়াল কুক্কুর বা ইউরোপবাসীদিগের ন্যায় আপনা-আপনি মারামারি গুঁতাগুঁতি কামড়াকামড়ি করিতেও হইবে না। আবার বাবুগিরি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে পারিলে আমাদের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধাও হইবে। যেখানে বাবুগিরি সেখানে বিষয় বুদ্ধি থাকে না। এখন আমরা অর্থোপার্জ্জনে যে এত অক্ষম হইয়াছি তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, বাবুগিরি করি বলিয়া আমরা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি না, বরং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। এই জন্য আমাদের মধ্যে মূলধনের সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। অতএব অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লোকহিতানুষ্ঠান, পরিবার পালন, শরীর রক্ষা, আত্মমর্য্যাদাবর্দ্ধন প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া—harsh ascetic নয়—উন্নতমনা বিশুদ্ধচিত্ত লোকহিতৈষী অনন্তপথানু-গামী ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য জীবন স্বপ্নও নয়, মরীচিকাও নয়। উহার আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া

যায় না। উহা একটি অতি কঠিন সমস্যা। অসাধারণ সাধনা ব্যতীত উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়। আর সে সাধনা শুধু এই পৃথিবীর জন্য হইলে চলিবে না—অনন্তকালের উপযোগী হওয়া চাই। অনন্তকালের উপযোগী হইলে এই পৃথিবীরও উপযোগী হইবে। পৃথিবী অনন্ত কালসমুদ্রের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দু বৈ নয়। সেই বিন্দুটিকে সেই অনন্ত কালসমুদ্রে মিশিতেই হইবে।

কিন্তু যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তি প্রশস্ত কালের মধ্যে বিবাহ করিতে না পারেন, অর্থাৎ যদি তাঁহাকে ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হয়, তবে তিনিও কি সেই বার তের বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিবেন? করিবেন বৈ কি, তদপেক্ষা বেশি বয়সের মেয়ে পাইবেন কোথায়? কিন্তু তাহা হইলে বয়সের কিছু বেশি প্রভেদ হইবে না? হইবে, কিন্তু নাচার। সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করিতে না পারিলেই কিছু না কিছু গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আর অমন প্রভেদ পছন্দের বিবাহেও অনেক স্থলে ঘটিয়া পড়ে। তাই সাহেবদের মধ্যে অনেক ত্রিশ বৎসরের বর ও ষাট বৎসরের কন্যা এবং কুড়ি বৎসরের কন্যা ও পঁয়ষট্টি বৎসরের বর দেখিতে পাওয়া যায়। এরকম দুইটা দশটা অসদৃশ বিবাহ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।